পরিচয়

বার্ষিক
৪৷০

প্রতি সংখ্যা
১৲

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪১

বিষয় সূচী

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪১

পরিচয়

আগামী ১লা শ্রাবণ ১৩৪১-এ পরিচয়ের চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। গত ... বৎসর ধরিয়া এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি সাহিত্য-রসিক ও বিদ্বজ্জন-সমাজে যে প্রতিষ্ঠা ...ন করিয়াছে তাহা ইহার পাঠক-সমাজ নিশ্চয়ই অবগত আছেন। যে উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত ... আমরা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম পরিচয়ের সে ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সাধ্যমত ...' আমরা পাইয়াছি। আগামী বৎসরের পরিচয়কে আরো সমৃদ্ধিশালী করিবার আয়োজন ...য়েছে। এই আয়োজন সার্থকতালাভ করিবে গ্রাহক ও পাঠক-গোষ্ঠীর সাহায্যে। সুতরাং ...য়া বর্ত্তমানে পরিচয়ের গ্রাহক আছেন তাঁহাদের প্রতি নিবেদন—তাঁহারা আগামী বৎসরের ...চয়ের বার্ষিক মূল্য ৪।০ আনা মনিঅর্ডার করিয়া ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪১-এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ...ইয়া দিবেন। পরিচয়কে যাঁহারা প্রীতির চক্ষে দেখেন, পরিচয় যাঁহাদের প্রিয় তাঁহারা ...দের বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রচার ও ...বৃদ্ধির সহায়তা করিবেন—এই অনুরোধও আমরা সকলকে জানাইতেছি। যদি একান্তই ...ন গ্রাহক আপাততঃ পরিচয়ের গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হন, তিনি একখানি পত্রে সে-কথা ...দের সময়মত জানাইয়া দিবেন। ৩১শে আষাঢ়ের মধ্যে যাঁহারা কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা টাকা ...ইবেন না—আগামী চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা আমরা যথারীতি তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ ...রিব।

আশা করি, ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদের কেহ ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

পরিচয়-কার্য্যালয়
১২-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী
পরিচালক

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার লেখা মাংসাশী মনের পথ্য—নখদন্তের জোর চাই, ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলে গলাধঃকরণের উপায় নেই। তাই বোধ হয় চর্ব্যপদার্থকে লেহ্যরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছি। তাতে স্বাদ পাওয়া যায় না,—তা বল্‌তে পারিনে কিন্তু বাদ পড়ে অনেকখানি।

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪১

পরিচয়

রিয়ালিস্‌ট্‌

কল্যাণীয়েষু,

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, তার একখানি অর্থাৎ "রিয়ালিস্‌ট"—কাল সায়াহ্নে বৈদ্যুতদীপালোকে পড়া শেষ করলুম ঃ—প্রথমেই পত্রের ভূমিকায় একটা কথা জানিয়ে রাখি। আজকাল কিছুদিন থেকে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছি—সেটা বয়সের ধর্ম্ম। কিছুকাল পূর্ব্বেই আমার যে মন ছিল সমুদ্রচর অষ্টপাদ জীবের মত, যে জীব তার কর্ষণীগুলো দিয়ে আলোচ্য বিষয়গুলোকে আঁকড়ে ধরে তার থেকে খাদ্য শোষণ করে নিত, তার মানসিক মাংসপেশী আজ ঢিলে হয়ে পড়েছে, সেইজন্যে সে আজ এলোমেলো চরে বেড়ায়, কিছুই ধরে বেড়ায় না। তাই হতাশ হয়ে আজকাল ছবি এঁকে কথঞ্চিৎ আত্মসম্মান রক্ষা করতে চেষ্টা করে। আমি যে জাতের ছবি আঁকি তাতে মনোনিবেশ বলে কোনো বালাই নেই, মাংসাশী মন লক্ষ্য সন্ধান ক'রে শীকার করে, উদ্ভিজ্জাশী মন এদিকে ওদিকে যা পায় যেমন তেমন করে খাবলে বেড়ায়। আমার ছবির লক্ষ্য নেই, যেমন তেমন করে আঙুল চালাই, যাহোক একটা কিছু হয়ে ওঠে। বুদ্ধির চতুরাশ্রমের মধ্যে এইটেকেই বানপ্রস্থ্য বলা চলে—এতে সঞ্চয়ের লোভ নেই, কর্ম্মের প্রয়াস নেই, যদৃচ্ছাক্রমে নিষ্কৃতির পথে চলা।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার লেখা মাংসাশী মনের পথ্য—নখদন্তের জোর চাই, ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলে গলাধঃকরণের উপায় নেই। তাই বোধ হয় চর্ব্ব্যপদার্থকে লেহ্যরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছি। তাতে স্বাদ পাওয়া যায় না তা বল্‌তে পারিনে কিন্তু বাদ পড়ে অনেকখানি।

তোমার বইখানি সম্বন্ধে প্রথম নালিশ এই, পাতা কেটে
হয়েছিল, সংসারে আকাটা পাতার বই হচ্ছে নববধূ, নানা দাগ পড়া
পাতা পুরাতনীর, অথচ তোমার গ্রন্থের বিষয়গুলিতে খোলাখুলি
অট্টহাস্য, বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্তের সঙ্গে তার বোঝাপড়া। কিন্তু অত্যন্ত
উঠেছে যে বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্ত সে কি গল্প শুন্‌তে চায়? তার সমস্ত ঝোঁক
করবার দিকে—প্রকৃতি যা সাবধানে লুকিয়ে বেড়ায় তাকে টেনে
করতে পারলে সে ভারি খুসি; সহজ-বিশ্বাসী নাবালিকদের পরে
দয়ামায়া নেই। নাবালকেরা ধূলোবালি প্রভৃতি যা তা নিয়ে সৃষ্টি
অর্থাৎ তারা বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তার নবীন শিক্ষানবীশ। তাতে এমন কিছু
থাকে যাতে কল্পনার দৃষ্টিতে কোনো একটা রূপের ব্যঞ্জনা নিয়ে আ
কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিতে পারে রূপমাত্রই ছলনা, আমাদের তত্ত্ব
বলে সৃষ্টিমাত্রই মায়া। গল্পও সৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টির মতোই সেও ছলনা।
ভালোবেসেছি এই চিরকালের ছলাকলা,—তাই রাজার মতো আরামে
আমরা জাদুকরকে ডাক দিয়ে পাঠাই, ফরমাস করি ইন্দ্রজালের, বলি এ
কিছু ক'রে তোলো ঠিক মনে হবে যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি; রূপ দেখে
চাই। কেননা সংসারে চারদিকে এমন সব ব্যাপারের মধ্যে আছি ব্যবহারে
ঘর্ষণে যার স্থূলবস্তু বেরিয়ে পড়েছে, যার মায়া-আবরণের লাবণ্য মুছে গে
কালী পড়ে দাগী হয়েছে, যা মনকে ভোলায় না। কেননা বস্তু মনকে
দেয় উঁচট্ খাওয়ায়, রূপ মনকে ভোলায়। অতএব জাদুকর, ভোলা
আহত মনকে, ক্লান্তকে আরাম দাও।

সাবালক বলেন নিজেকে অমন করে ভোলানো ভালো নয়,
দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। রূপলুব্ধ বলে সংসারক্ষেত্রে বাস্ত
সঙ্গে ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি নিয়তই হয়ে থাকে, সেখানে পালোয়ানির
বিশ্রাম নেই। তাতে করে মানুষকে ভুলিয়ে দেয় এই বাঁওকষাকষি,
ঘাড় ভাঙাভাঙি। ধূলোয় কাদায় উলট্ পালট্ খাওয়াই বিশ্বব্যাপারের
সত্য নয়। এটাই বস্তুত ঠকানো। অর্থাৎ চরম নয় উপকরণগুলো,
হচ্ছে অমৃত, রূপের সৌন্দর্য্য। মৈত্রেয়ী বলেছিলেন "উপকরণবতাং জীবি
তিনি চান না, তিনি চান "অমৃতম্"।

কত হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ আপন সভ্যতার মধ্যে আপন রূপসৃষ্টির উদ্ভাবন করতে চেয়েছে। কেবলি বাইরের এবং অন্তরের সাজ বানিয়েছে। সে চায় আপনাকে শোভন দেখতে, নইলে তার লজ্জা হয়, নইলে তার চারিদিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। ভদ্র তাকে হতেই হবে, ভদ্র হওয়ার মানে এমন নয়, তার স্বভাবের উপাদানগুলোকে বাইরে মেলে দিতে হবে। হয় সেগুলোকে ভিতর থেকেই কোনো একটি উৎকর্ষের আদর্শে পরিণত করে তুল্‌তে হবে, নয় বাইরের আবরণে তার রূঢ়তাকে ঢেকে রাখতে হবে। সেই ঢাকা দেওয়া পরস্পরকে সম্মান করা, নগ্নতা অসম্মান। এমনি করে কতক সাধনার দ্বারা কতক আবরণের দ্বারা সভ্যতা আপন রূপকে পরিদৃশ্যমান করে তোলে। সভ্যতা সম্মিলিত মানবচিত্তের সৃষ্টি, এ সৃষ্টি বিজ্ঞানের দ্বারা নয়, জাদুর দ্বারা, যে জাদু রং ফলায়, রস জমায়, সুর লাগিয়ে দেয়। বিজ্ঞান-প্রবীণ একে ছেলেমানুষি বল্‌তে পারে কিন্তু এই ছেলেমানুষিই সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তা বৈজ্ঞানিক হলে বিশ্ব বীভৎস ভাবে অনাবৃত থাকত, তাহলে বৈজ্ঞানিককে ছুরি চালিয়ে নাড়িনক্ষত্র সন্ধান করতে হোতো না। বাস্তব সংসারে ঘাত সংঘাত চল্‌ছে, সেখানে রূপ সম্পূর্ণ জমে উঠ্‌তে পারছে না—এইজন্যেই মানুষ আদিকাল থেকে কেবলি বলে আস্‌ছে গল্প বলো। অবাস্তবের মহাকাশেই সত্যকে সে দেখ্‌তে চায়। বীণাযন্ত্রের তার যেমনতেমনভাবে আলগা হয়েই থাকে, সেই তার বেসুরো, মানুষ বলে না সেই তারে ঝঙ্কার লাগাও, যেহেতু আমি বাস্তবের আওয়াজ শুন্‌ব, সে বলে সাধাসুরের তারে আমি গান শুনতে চাই, সংসারে সেই সুর সর্ব্বত্র শুনতে পাইনে বলেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকি। মানুষ এতকাল বলে এসেছে সাধাসুরের বীণাযন্ত্রে গল্প জমাও। আজ বল্‌ছে সাধা সুর বানানো সুর—ওতে সাহিত্যের এরিস্‌টোক্রেসি। তাকে মান্‌ব না, আমি চাই যদৃচ্ছাকৃত তারের ঝঙ্কার ক্রেঙ্কার হুঙ্কার—অর্থাৎ গান চাইনে, শব্দ চাই—শব্দ ডিমক্রেসি। শব্দ নির্ম্মম বাস্তবতা, শব্দ চিৎকর্ষের আদর্শে ভোলায় না।

মানবসংসারে ভোলাবারই একটা বিভাগ আছে, যাচাই বাছাইয়ের বিভাগ, মানুষের প্রকৃতিকে অতিপ্রাকৃতে নিয়ে যাবার জন্যে যুগে যুগে তার নিরন্তর আকর্ষণ, কেবলি সে সুর বাঁধছে, রসসাহিত্য সেই বিভাগেই তো

পড়ে। যত কিছু রিট্রেঞ্চ্‌মেন্ট্ সে কি আজ সেই বিভাগের উপর দিয়ে যাবে? আজ রব উঠেছে আমি স্পষ্ট কথা কব—অনেক দিন থেকে মানুষ বলেছে স্পষ্ট কথা বোলো না ঠিক কথা বলো। ঠিক কথা কাকে বলে। কাঁসরে লাঠি লাগ্‌লে সে অত্যন্ত স্পষ্টকথা কয়, তাতে বধির দেবতা ছাড়া পাড়াসুদ্ধ অন্য সকলের কান ঝালাফালা হয়ে ওঠে। জাপানী দেবমন্দিরে ঘণ্টার ধ্বনি শুনেছি, তাকে বলি ঠিক সুরের ধ্বনি,—এই ঠিক সুর অনেক যত্নে তৈরি ঘণ্টায় তবে ঠিকটি বাজে। মানুষ আপন সৃষ্টির আদর্শকে অনেক যত্নে খাঁটি করে তুলবে এই ছিল কথা—সে চেয়েছিল নিজের মূল্য কমাবে না, নিজেকে অনাদর করবে না। আজ সাহিত্য কি তার কানে কানে এই কথা বলবারই ভার নিয়েছে যে, আসলে তুমি আদরণীয় নও, যথার্থই তুমি অশ্রদ্ধেয়, অতএব ভড়ং কোরোনা। তুমি কত নোঙরা তা দেখিয়ে দিচ্ছি— নোংরা তোমার নাড়িভুঁড়ি রসরক্ত, নোংরা তোমার মগজ, তোমার হৃৎপিণ্ড তোমার পাকযন্ত্র, তোমার চেহারাটা উপরের খোলসমাত্র, সেই চেহারার বড়াই কোরো না—যারা ছবি আঁকে তারা মিথ্যেবাদী, যারা মূর্ত্তি গড়ে তারা খোষামুদে। অতএব গল্প বলব না, জোগাব মনস্তত্ত্বের তথ্যতালিকা।

একথা বলা বাহুল্য মানুষ নিছক জন্তু নয় এই কারণেই মানুষের স্বভাবে প্রাকৃতের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত আপনাকে উদ্ভাবিত কর্‌ছে—মানব-স্বভাবের এই দ্বন্দ্ব সাহিত্যে প্রকাশ না পেলে সে সাহিত্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না এবং তাতে তার যথার্থ উপভোগ্যতা কমে। ছেলেভোলানো সাহিত্য তাকেই বলে যাতে সমস্ত কাঁটা ফেলে পাতে মাছ দেওয়া হয়— কিন্তু শুধুমাত্র কাঁটার চচ্চড়ি রাঁধাকেই যারা ওস্তাদি বলে ক্রূর হাস্য করে মাসিক পত্রদ্বারা তাদের কৃত নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জ্জনা করতে পারব না। সাহিত্য সাবালকের সাহিত্যই হোক্, কাঁটার ভয় করব না যদি তাতে পুরো মাছটাকেই পাওয়া যায়।

গল্পের ছল করে তুমি যেকথা বল্‌তে চেয়েছ ব্যাখ্যান করে আমি সেই কথাই বল্‌বার চেষ্টা করেছি। তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ রিয়ালিস্‌ট্ তার মধ্যে বিদ্রূপের অট্টহাস্য রয়েছে। নিছক রিয়ালিজ্‌ম্ যে কত অদ্ভুত ও অসঙ্গত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছ। মানুষ দুর্ব্বৃত্ত হতে

পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্‌ট্ হবার জন্যে কোমর বাঁধ্‌লে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় unreal, তুমি তোমার গল্পে বারবার দেখিয়েছ আদর্শবোধে রিয়ালিজ্‌মের যারা চর্চ্চা করে তারা একটা ভঙ্গীর সাধনা করে মাত্র। তারা নিজেও ভুল্‌তে পারে না তারা রিয়ালিস্‌ট্, অন্যকেও ভুল্‌তে দিতে চায়না;—তারা রিয়ালিজ্‌মের পুতুলবাজি করে। এই সঙ্গে এই কথা বলাও চলে, আদর্শবাদেরও পুতুলবাজি আছে— সেইটেই যাদের একমাত্র ব্যবসা তারা ভুলে যায় মানুষ চিরকেলে অপোগণ্ড নয়, বাস্তবের পাথরবাটিতেই সত্যের পরিবেষণ সঙ্গত—ফীডিং বট্‌ল্‌টা লজ্জাজনক।

কাল রাত সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তোমার বইখানি পড়েছি। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে "বাঁশরী" নামক আমার নূতন লিখিত নাটকের ভিতরে ভিতরেও অবাস্তব রিয়ালিজ্‌মের প্রতি এই রকমেরই একটা হাসির আমেজ আছে। তোমার লেখনীর প্রতি আমার একমাত্র অভিযোগ এই যে, দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় যারা আরামে অনায়াসে গল্প করতে চায় তাদের প্রতি ওর কোনো মমতা নেই। *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* পত্রখানি শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

"সমর ও শান্তি"

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনিতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রবৎ পরিব
সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু ইউরোপীরা বলতে পারেন জীবনের প্র
অবস্থায় ত দুঃখ সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য্য কোথায়। পর
যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দু
তা নয়, আর বিশ্রাম যে অবিমিশ্র সুখের তাও নয়। সুখদুঃখ-নিরপেক্ষভা
সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম। এবং দুই মিলি
জীবন। জীবন যদি হয় পদ্য তবে 'সংগ্রাম' ও 'বিশ্রাম' বোধ হয় 'দুঃখ'
'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল।

ইউরোপের ইতিহাস—ইউরোপনির্দ্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস—
দুটি শব্দের উলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে
কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো বা নেশনে নেশনে সমর যেন একটা
পর একটা ঢেউয়ের ভেঙ্গে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের
টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। ফিরে গিয়ে ফের ঝাঁপিয়ে পড়বে,
আর এক ছোবল। এ খেলা ফুরায় না, ফুরাবার নয়।

টলষ্টয় প্রণীত "সমর ও শান্তি" নেপোলিয়নীয় যুগের ইতিহা
ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাস-পর্য্যায়ভুক্ত। অথচ সাধা
উপন্যাসের মত এক জোড়া নায়কনায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক
নায়িকা বল সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণমনসম্মান। অ
দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্তা
বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের জা
এবং বিষয় এর দেশকালরঞ্জিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হ
মানবকরতলরেখা।

১৮০৫ সালে রুশ সৈন্যরা অষ্ট্রিয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দি
নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউস্টারলিৎসের রণক্ষেত্রে। হেরে যা

কিন্তু 'হেরে গেছি' এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎকার ঘটে, বন্ধুতা হয়। ১৮২২ সালে সেই মৈত্রী পর্য্যবসিত হল শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজো দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কো প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কো জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল সহরে আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট করে ফরাসীরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচায় ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগ মাংসে তারই মত দশা হল বাবাজিদের। যতটা পথ এসেছিলেন ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহু গুণ বোধ হল। কুটুজো ইচ্ছা করলে রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের কেটে ফেলতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁর কোনো কোনো সৈন্য কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আর্মে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হল পথি বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন মস্ত এক লম্ফ। বীর হনুমান।

এই হল কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড় বড় কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড় বড় কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্রপাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙ্গে সমস্তটা হত অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের বোড়ের মত চলা, অধিককৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠানের দোষ—নেপোলিয়নের সর্দ্দিকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজো মস্কো রক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন তাঁর পরামর্শ-পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক

যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে দেশে
ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলষ্টয় বলতেন এ কি আমরা না
ভেবেচিন্তে করেছি, আমরা অনেকদিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছি
যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আন
ও মস্কৌ খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলষ্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিযোগে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা
কেমন করে ঘটল, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে
তারা পরস্পরের কেরামৎ জানে। কিন্তু যুদ্ধে অপর পক্ষের সামর্থ্য
পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ঐক্যে
একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে
ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষ, তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘরসংসার, কেউ গণনা
করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের একোজনের এক
মত, তাদের সবাইকে এক মনে কাজ করান প্রধান সেনাপতির নিত্য
সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা যতটা জয় গৌরব নয় ততটা লুটতরাজ।
মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে।
যুদ্ধ জিনিষটা একজনের হুকুমে হয় এর মত ভ্রান্তি আর নেই। যুদ্ধ য
একবার কোনো মতে সুরু করে দিলে আপনাআপনি। থামে হয়
একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা হেরে গেছি"
অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কি যে হয়
অন্তিম ফল টলষ্টয় তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম করলেন
'যুদ্ধ হোক', আর অমনি যুদ্ধ হল এই স্থূলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান।
নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবা নয়
'প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কৌতে তিনি আগাগোড়া নির্ব্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন
সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব
রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কৌর ধনসম্পদ
তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূর দেশে এনেছিল, সেই লোভের
তাণ্ডব নাচ চল্ল। নেপোলিয়ন মোরগের মত নিশ্চিত জানতেন যে নাগরিকরা

তাঁর লম্বা চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকানপাট বসাবে।
গ্রামিকরা আসবে মাছ তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভাল করে
বুঝিয়ে দেবেন যে যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও তেমনি তিনি
প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলষ্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো
ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি।
তারা অন্তরে উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোস্টোপশিনের
অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে
তা কিন্তু বলা যায় না। হয়ত রাশিয়ানরা, হয়ত ফরাসীরা। যেই দিক
সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কিসের ফল কি দাঁড়াবে।

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কৌতে এই যে তাদের
সঙ্কল্প এও কারুর নির্দ্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এও তারা একজোট হয়ে
পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ।
এমন যদি না হত তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার
সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাধাত, প্রলয়ঙ্করের করতালি ত এক হাতে বাজে না।

শেষজীবনে টলষ্টয় যে জনগণের স্বভাব বিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন
তার পূর্ব্বাভাস তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়। নামহীন
পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা।
[illegible]পারেননি, এমনি উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল আভিজাত্য উন্মূল হল
না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর
পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে, মহাত্মার জীবনাদর্শে। টলষ্টয়কে
দ্বিখণ্ডিত করে কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ
নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা এই
তাঁর উভয় বয়সের, উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের সঙ্কেত।
শিল্পি-ঋষি ও সাধু-ঋষি মূলত ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য
ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্রপাত্রী
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নয়। নামপরিচয়হীন নির্ব্বিশেষ জনতা যা করে

তাই হয়। এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, যো নয়। তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমা অনুভূতির অতীত বলে আমরা একদা তাকে স্থাণু মনে করেছিলুম তে নিয়তির ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আ ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতি বিচিত্র সংসারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেশ নেশনে। কিন্তু অলক্ষিতে বালিকা হয়ে উঠছে বালা. বালা হয়েছে উ নবযুবতী। অন্তরালে শীতের সূর্য্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নী কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণী একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হ টলষ্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরল ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অ অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব। কারুর অতি বড় দুর্দ ঘটে না, জীবনদেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সদ্ব্যবস্থা করেন। কারো দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে। কাউকে রাখেন চিরকু করে, নিজের নিষ্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভা ভেবে। মরতে মরতে বেচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে এ পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রা ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায় নেই যে প্রত্যে কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের মত উৎরেছে। তার মানে আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছে যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতা ইতিহাসে থাকলে আমরা বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মত শান্তিকালেও টলষ্টয় পড়েছিলেন অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বি বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। দ্বন্দের স্থান রণাঙ্গনে, গৃহে বড় জোর একটুখানি

অভিমান, সজল কলহ। একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে, বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে, একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষপর্য্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তিও যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর বলে গণ্য হবে তা ত উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষত রাশিয়ায়। এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গণ্ডী কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি! তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে জিজ্ঞাসা ছিল।

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলষ্টয়কে ঢের বেশী আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে। এর এক একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক এক জনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে নাম করা যায় নাটাশার, মারিয়ার, সোনিয়ার, হেলেনের। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় য়্যাণ্ড্রুকে, পিটারকে, নিকোলাসকে, ভোলোগোকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এত রকম এত ব্যক্তি অন্য কোন গ্রন্থে আছে? ডষ্টইয়েভ্স্কিও টলষ্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ সে কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়নি। দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনো তার পুতুল খেলার অভ্যাস ভাঙ্গেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী! সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোন অপ্সরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অখলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল য়্যাণ্ড্রুকে। য়্যাণ্ড্রু উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা। বয়সেও বড়। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর মনে। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন

না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খরচ হয়েছিল, বাজে খরচ। দিকদার হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শ স্থানীয় বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ প্রশান্ত নীল আকাশের নীচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ঐ অসীম বিশ্ব এমন যে য়্যাণ্ড্রু তাঁরও নতুন করে বাচতে ইচ্ছা করল নাটাশার প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরণা। বছরের জন্য য়্যাণ্ড্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হয়ে এল তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। গেল। কিন্তু বদলে গেল। য়্যাণ্ড্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনো রূপ মহত্ব করলেন না, এত দুর্ব্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন, ঘটনাচক্রে নাটাশার আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হল দিব্য ভাবে। তিনি করলেন, তিনি ভালবাসলেন, প্রাণীমাত্রকে, সংসারকে। তাঁর ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালবাসত পিটার। লোকটা যে লাজুক, ভালমানুষ, কিম্ভূত কিমাকার মাথাপাগলা তাই নয়, সত্যকাম। তাই কাউকে কোনোদিন জানায়নি ভালবাসার কথা। হঠাৎ গেলেন কাউণ্ট বেসুকো, উত্তরাধিকারী হল পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির পদবীর। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগসম্পন্ন, মান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হল যার সঙ্গে সে অসামান্য সোসাইটির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, হেলেন। কোনো পক্ষে প্রেম বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হল।

খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রাণীমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হল ফ্রীমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণ-ব্রত-রত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মত বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেলে যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়, সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের ফল হল শেষকালে এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল। তার চোখের সুমুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও উপর গুলি চলবে এমন সময় তার প্রাণদণ্ড মকুপ হল, সে চল্ল বন্দী হয়ে ফিরন্ত ফরাসীদের সাথে। কসাকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দীদের সহিত তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসো ডোলোগো প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকেও কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্ত্তন ঘটেছিল। সৌখীন মানবহিত আর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে—ততদিনে হেলেন মরেছিল—সে দস্তুরমত সংসারী হল। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি যে তাকে সহজ আনন্দ জোগায়, উদ্ভিদকে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণবিকশিত পাদপের মত প্রসারিত, সমৃদ্ধ হল। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোকলতা। তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হত সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলষ্টয়ের মানসী নারী। সে ভাল। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়, শিক্ষার দ্বারা নয়। নীতির চুল চেরা তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তাই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে যায় না।

য়্যাণ্ড্রের বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপ হীনতার প্রতিক্রিয়ায়, কতক তার কঠোরস্বভাব জনকের তাড়নায় তপস্বিনী। তার সমবয়সিনীরা যখন খেলা করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতির পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে অধ্যাত্ম চর্চ্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারীমাত্রেই করে থাকে। আপনাকে সে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সহিত, বিবাহের ত প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে। কতবার নিরাশ হল। অবশেষে নাটাশার ভাই নিকোলাস তার পৈত্রিক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিনে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হল। মারিয়ার দীর্ঘাচরিত সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মত প্রাণময়, তবে সহাস্য নয়, সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগান চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তার মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এই সব তার বহির্ম্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালবাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাস তাকে ভালবাসে সে ভালবাসা তার অন্যান্য কাজের মত ছেলেমানুষী। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা যে জুয়ায় সব হারিয়ে বসে রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল। নিকোলাস বর্ত্তে গেল, সে ত কিছুতেই তার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মত বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগো নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একটা বড় দুঃখ ছিল যে সে গরীব। তাতে তাকে নির্দ্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ সে একটিও নারী দেখল

না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পূজা করতে পারে। তার ধারণা রাণী থেকে দাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে তা শুধু তার মানসীকে হয়ত একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে সয়তানী করবে। করবে গুণ্ডামী। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলষ্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলষ্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন, এসব যায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণা-সভায়, দরবারে, অভিজাত মহলে, ফ্রীমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়ীতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিসে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দীদের সাথে, গেরিলা দলে—সর্ব্বঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়ত শেষ বয়সে তাদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশত শেষের দিকে একেবারে ও জিনিষ বয়কট করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চল্লেন। টলষ্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্র্যাজেডি এই।

আলোচ্যগ্রন্থে তিনি যাকে জয়যুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েভ মরণের পূর্ব্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে বাজতে থাকে। জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্ব্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালবাসলেই ভগবানকেও ভালবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালবাসা।

লীলাময় রায়

শিল্পের সুন্দর

শিল্পী মানব যুগে যুগে অন্তরের সকল সম্পদ সংহত করে' চিরসুন্দরের অর্চ্চনা করে' এসেছে। প্রকৃতির সকল সুষমা সংগ্রহ করে' তাঁর মূর্ত্তি গড়েছে, অতরল স্বপ্ন দিয়ে তাঁর মন্দির তৈরী করেছে, হৃদয়ের ভাবাতীত সঙ্গীত দিয়ে তাঁর বন্দনা করেছে, লাবণ্যময় দেহকে নানাছন্দে আবর্ত্তিত করে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করেছে, চিত্রপটে তাঁর মূর্ত্তি নানা আকারে এঁকে চিত্তবিনোদন করেছে, কাব্যে তার লীলাকাহিনী ঝঙ্কৃত করে তুলেছে। এই সকল প্রচেষ্টা মানবসমাজের অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে আছে ও চিরকাল আনন্দ দান করে' আসছে। কিন্তু যে সকল উপাদান দিয়ে শিল্পী তাঁর বিচিত্র অর্ঘ্য সাজিয়েছেন—তার মধ্যে এই ধূলিমলিন জগতের নানা তুচ্ছ বস্তুও আছে। যে সকল ক্ষুদ্র রূপহীন গন্ধহীন কুসুম পথের ধারে ফুটে' মানুষের অজস্র অবহেলা ও অবজ্ঞাই কুড়িয়ে এসেছে শিল্পীর অপরূপ মালার মধ্যে গাঁথা হ'য়ে তাদের কি সুন্দরই দেখাচ্ছে, দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে থাকতে হয়। পথের ধারে নগ্নপদ ছিন্নবসন দরিদ্র বালককে মনের আনন্দে একখণ্ড তুচ্ছ আহার্য উপভোগ করতে ত প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কৈ সে দৃশ্য ত মুরিলোর (Murillo) তরমুজভক্ষণনিরত দুটি মানবকের মত আমাদের মনে আনন্দ সিঞ্চন করে না! সেক্ষপিয়রের ফলস্টাফ্ বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গদাই পাল জগতে বড় দুর্লভ নয়। কিন্তু কবির চিত্রগুলি দেখলে যে আনন্দ পাওয়া যায় এদের সংসর্গে ত তার এক বিন্দুও পাওয়া যায় না,—বরং বিরক্তি ও ভয়ই হয়। এই সকল নগণ্য তুচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করে' শিল্পী তাদের কোন মন্দাকিনীর ধারায় অভিষিক্ত করে' আনেন, কি আনন্দের মন্ত্র দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন যে তাদিকে আমরা এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিরূপে দেখি, তারা মানুষকে অনন্তকাল অকাতরে অফুরন্ত আনন্দ বিতরণ করে? জিজ্ঞাসু মানবের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, শিল্পীর স্পর্শে কি কুহক আছে, শিল্পী আমাদের চোখে কি আনন্দের অঞ্জন মাখিয়ে দেন যে তাঁর হাতে জগতের তুচ্ছতম বস্তুও অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়?

শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তুর যে আলেখ্য উপহার দেন তাকে সে বস্তুর আলোক চিত্র বলে ভাবলে ভুল করা হয়। শিল্পীর আলেখ্যে আলোকচিত্রের মত আদর্শের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিল নাই, বেশভূষার সে পারিপাট্য নাই; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী মিলিয়ে দেখলে অনেক ছোটখাট অমিল ধরা পড়বে। শিল্পী যেখানে মূলের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু সে সকল চেষ্টা মানুষকে কোথাও শ্রেষ্ঠ শিল্পের মত আনন্দ দান করতে পারে নাই,—অনেক স্থলে বরং বিরক্তিই উৎপন্ন করেছে। Naplesএর সাধারণ শিল্পসংগ্রহাগারে কতকগুলি পাষাণপ্রতিমা আছে যেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে জীবন্ত মানবের প্রতিমূর্ত্তি করে তোলা হয়েছে। তাদের মাথায় কুঞ্চিত কেশের তরঙ্গ তুলে' দেওয়া হয়েছে, নীলনয়নে উজ্জ্বল তারা ও ভ্রু সংযোগ করা হয়েছে, ওষ্ঠে গণ্ডে জীবনের লালিমা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে বরবপু আবৃত করে' দেওয়া হয়েছে। এগুলি দেখে কিন্তু কোনরূপ আনন্দ ত পাওয়া যায় না;—বরং দেখতে দেখতে অসীম বিরক্তি ও জুগুপ্সা জেগে উঠে, মনে হয় যেন জীবনের একটা হাস্যকর প্রহসন হয়েছে। এইভাবে বর্ণে বর্ণে রেখায় রেখায় মূলের অনুকরণ এতই সহজ যে সাধারণ শিল্পী এই প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এমন কি বিষয়বস্তুর একটি আলোকচিত্র নিয়ে তার উপর একটু বর্ণপ্রক্ষেপ করে' শিল্পসৃষ্টি বলে' চালানর প্রচেষ্টাও আমাদের দেশে দেখা যায়। সাহিত্যেও এইরূপ প্রকৃতির দাসসুলভ অনুকরণ প্রতিমাসে মাসিক পত্রিকার ছোট গল্পে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এই অনুকরণের সিদ্ধিও সুলভ। প্রাকৃত মানব আনন্দে বলে উঠে, "কি সুন্দর! ঠিক যেন মানুষটি বসে আছে," অথবা "বড়ই স্বাভাবিক হ'য়েছে" কিন্তু মূলে এগুলি পরিচ্ছদের দোকানের বিজ্ঞাপন বা মার্জ্জিতরুচি অভিজাত সমাজের আলোকচিত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়।

শ্রেষ্ঠশিল্পী প্রাকৃতিক সামগ্রীর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ করেন না বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বাভাবিক সংস্থানকে কোথাও অবহেলা করে' চলেন না। প্রাকৃতিক বস্তুজগতের গঠন, আয়তন ও সংস্থান যুগযুগান্ত ধরে' জড় জগতের সঙ্গে জীবজগতের সামঞ্জস্য বিধানের ফল। তা' অতিক্রম করে'

একটা নূতনতর ও উন্নততর সমাধান মানবশিল্পীর সাধ্যায়ত্ত বলে' বোধ হ না। সেজন্য প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে শিল্পীকে তাঁর শিল্প সাধনায় অগ্রসর হ হয়। মানুষের মূর্ত্তি গঠন করতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের পরস্পরে অনুপাত, অস্থি ও সন্ধির সংস্থান, দৈহিক নানা ক্রিয়ার সময় পেশীসমূহে বিকাশ প্রভৃতি নানা শারীরিক ব্যাপার লক্ষ্য করতে হয়। শিল্পানুরা মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন এ বিষয়ে অবহেলার ফলে আধুনিক শিল্প কি সৌষ্ঠবহীন লাবণ্যহীন হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যেও যে স্থানে যে ঋতু যে ফুলফল তরুলতার বিকাশ স্বাভাবিক, শিল্পীকে তা মেনে চলতে হ সাহিত্যেও এ বিষয়ে অসাবধানতার ফলে মজুরদের বস্তি থেকে Chopin Reverieর ধ্বনি ও যোগীর সাধনাশ্রমে পানাগারের দৃশ্যের অবতার পাওয়া যায়। যে আবেষ্টনের যে শিক্ষার মধ্যে যে বংশে যে চরিত্রের বিকা সম্ভব প্রকৃত সাহিত্যিক তাই দেখান। আর অন্য কিছু দেখাতে গে তার একটা হেতু বংশে, শিক্ষায় বা আবেষ্টনের মধ্যে তিনি দিয়ে থাকেন।

প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করে' শিল্পী বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অর্জ্জনবর্জ্জ করেন তাতে কেবল একটি লক্ষ্য তিনি স্থির করে রাখেন,—বস্তুটির ভা রূপটি সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা। শিল্পীর চোখে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় একটি বিশেষরূপে দেখা দেয়, একটি বিশেষভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, ম একটি বিশেষ রসানুভূতি জাগিয়ে তোলে ও তিনি সেই রূপটিই ফুটি তুলতে প্রয়াস পান। কবিরা বলেন প্রেম অন্ধ; কবির সৃষ্ট প্রেমিক য উত্তর দিতে পারত ত সেও বোধ হয় বলত, "তুমিই না অন্ধ হয়ে আমা ভালবেসেছ তাই আমায় কেবল প্রেমিক করেই এঁকেছ! বাস্তবিক আমি পিতার পুত্র, ভগ্নীর ভ্রাতা, সখার প্রীতিনিলয় ও দেশের সেবক নই? প্রকৃতই শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তুর একটি দিকই দেখেন, তার অন্যান্য দিক তাঁ চোখে অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন থাকে। তাঁর দৃষ্ট অংশটুকুকে উজ্জ্বল করে', প্রা করে' তোলবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন এই ছায়ানিবিড় অংশগুলি ঠিক ততটুকুই প্রকাশ করে। শকুন্তলার প্রেমে মুগ্ধ দুষ্মন্তকে আমরা দেখি মার্জ্জিতরুচি বিদগ্ধবাক যুবাপুরুষরূপে, কিন্তু এই নাটকের ঘটনাটি ত রাজা রাজকার্য্যের অবসরে একটা চিত্তবিনোদনব্যাপার মাত্র। শকুন্তলাকে নি

যখন তাপসবৃদ্ধা গোতমী রাজার সভায় উপস্থিত হলেন, তখন রাজাকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁর স্বরূপে দেখতে পাওয়া যায়,—রাজনীতিবিশারদ, রাজধর্ম্মে নিরত, গম্ভীরপ্রকৃতি; বহুপত্নীক বলে' নারীসম্ভোগে রসজ্ঞ ও নারীচরিত্রের প্রতি একটু অশ্রদ্ধ। যখন তেজস্বিনী শকুন্তলা তিরস্কার করে' চোখে আঁচল দিয়ে নিরাশায় ম্রিয়মাণা হয়ে চলে' গেলেন সেই দুঃখবিহ্বল রোরুদ্যমানা মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মুনিশাপে বিভ্রান্তচিত্ত রাজার বিস্মৃতি ভেদ করে' কোথায় একটা অনুশোচনার বেদনা জেগে উঠল ও অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে' এই রুক্ষ রূঢ় চিত্রটিকে স্নিগ্ধ করে' দিল। প্রেমিক দুষ্মন্তের দিকে চেয়ে যখন আমরা মুগ্ধ হচ্ছিলাম কবি যেন গোপনে এসে আমাদের কানে কানে একবার বলে গেলেন, ইনি কিন্তু সসাগরা ভারতের অধীশ্বর। দুষ্মন্তচিত্রের সে অংশটা কিন্তু প্রায় প্রচ্ছন্নই রয়ে গেছে। একটু অনবধানতায় এই প্রচ্ছন্ন অংশ একটু অধিক প্রকাশিত হলেই শিল্পপ্রতিভার যাদুতে আমাদের চোখের সামনে যে অপরূপ সৃষ্টি হচ্ছিল তা যেন কতকটা মলিন হয়ে উঠে। মৃচ্ছকটিকের চারুদত্ত অপূর্ব্ব প্রেমিক ও বদান্যরূপে যখন আমাদের মনোহরণ করে' নিয়েছে এমন সময় ছিন্নবসনের লজ্জায় বিপন্না তাঁর সহধর্ম্মিণীর ম্লানমূর্ত্তি ও একটি মৃৎশকটের জন্য রোদনাতুর ননীর পুতলী শিশুপুত্রের মুখখানি অতর্কিতে ঐ ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাদ্ভূমির ভিতর থেকে আমাদের সামনে মুহূর্ত্তে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, ও মনে হ'ল যেন কবির এতক্ষণের সযত্নরচিত দেবমূর্ত্তিকে শ্মশানের পূতিগন্ধময় শবাহারী গলিতদেহ কোন কুক্কুর বামপদাঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল। চারুদত্ত যে উপার্জ্জনাক্ষম অতিব্যয়ী অবিমৃশ্যকারী পুত্র, হৃদয়হীন পতি ও মমতাহীন পিতা, বংশগৌরব হারিয়ে নির্লজ্জভাবে সামান্য গণিকার প্রেমে উন্মত্ত, এই কথা নিমেষে প্রকট হয়ে উঠল ও তাঁর প্রেমিকমূর্ত্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। এরূপ অনবধানতা কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে বিরল। প্রতিভাশালী শিল্পী যে সকল ছোটখাট চরিত্র সৃষ্টি করেন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাঁর পাত্রপাত্রীদের স্থাপিত করেন সেগুলি এমনই মনোরম করে' তোলেন যে অনেক সময় সেগুলিকে আরও ভাল করে' দেখবার জন্য, আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে থাকি। কিন্তু শিল্পী আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন

না,—তা হ'লে যে তাঁর শিল্পের যাদু ভেঙে যায়! স্নিগ্ধচরিত্রা অনসূয়া ও বাকপটু প্রিয়ংবদা চিরকালই কণ্ব দুহিতার বিবাহ দিয়ে তপোবনের ছায় মধ্যে আত্মগোপন করবে ও বিরহিণী উর্ম্মিলা চিরকালই অযোধ্যার অন্তঃপু মৌনী হয়ে' থাকবে। কাব্যের উপেক্ষিতাদের জন্য আমাদের মন ব্য বেদনায় আতুর হয়ে উঠুক শিল্পসৃষ্টির অমোঘ প্রয়োজনে তাঁদের আর খুঁ করে' পাওয়া যাবে না।

একদিকে যেমন বিষয়বস্তুর যে রূপটি শিল্পীর চোখে লাগে তা প্রতিকূল অবস্থাগুলি তিনি বর্জ্জন করেন, তেমনই তার অনুকূল অবস্থা গুলিকে সযত্নে বিকশিত করে তোলেন। বর্ণনার কৌশলে মনে হয় যে নয়নের চাহনি থেকে বসনবিন্যাসের ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত একই ভাবের দ্যোতক শকুন্তলা যখন মদনসন্তপ্তা হয়ে পদ্মপত্রশয়নে অঙ্গগ্লানি দূর করছেন সেইটুকুই কবি আমাদের দেখিয়েছেন। শকুন্তলার প্রণয়বিহ্বলা মূর্তিটি আমাদের চোখে পড়ে, যেন এইখানেই তার জীবনের পরম চরিতার্থতা শৃঙ্গাররসের অভিনয় কবির প্রতিপাদ্য, কিন্তু কণ্বমুনির শান্তরসাস্প তপোবনে যে এই অভিনয় হচ্ছে সে কথা কবি একবারও ভুলতে দে না। দৃশ্যভূমি ও পশ্চাদ্ভূমির যথোচিত বিন্যাসকৌশলে কালিদাসের এ নাটকখানি একটি অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টি হয়ে আছে।

শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তুর বাহ্য আকৃতি লক্ষ্য করেন তার অন্তরে ভাবরূপটির প্রকাশক হিসাবে। বস্তুটি যে আকারে তাঁর চোখে প্রতিভা হয় সেইটি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তাঁকে সন্ধান করতে হয় সে বিষয়বস্তুর অন্তর্লীন ভাবটির, তার মূলপ্রকৃতির, যার প্রেরণায় সকল কা সকল চিন্তা, সকল আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁর বিষয় যে জীবন-দেবতার মণিবেদিকার তলে প্রতিদিন অর্ঘ সাজিয়ে নিয়ে এ আত্মনিবেদন করছে, যাঁকে ঘিরে মগ্নচৈতন্যের অন্তস্তল হতে নি বাসনারাশি আরতির সুগন্ধ ধূমের মত চিত্তটিকে সুরভিত করে' নি লীলায়িত হয়ে উঠছে, শিল্পী সেই দেবতার সন্ধান করে ফিরেন। কি আরাধনায় যে দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে দেখা দেবেন তা শিল্পী জানেন না, তা তাঁর সাধনার বিরাম নাই। কিন্তু তিনি জানেন যে একবার তাঁর বিষয়

জীবন-দেবতার সাক্ষাৎ পেলে সমস্ত কঠোর সাধনা সফল হয়ে উঠবে,—যা বাস্তব জগতে অসুন্দর কর্কশ ছিল তাই শিল্প-জগতে মনোরম কমনীয় হ'য়ে উঠবে, প্রতিভার জ্যোতির্ম্ময় রশ্মিপাতে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত ভাস্বর হয়ে উঠবে ও তাঁর সৃষ্টি জগতে অমর হ'য়ে থাকবে। শিল্পী এই ধ্যানগম্য তপস্যা-লভ্য ভাবরূপটির সন্ধান করেন। কোনো দেবতার মূর্ত্তি গঠন করতে হ'লে পবিত্রভাবে সেই দেবতার আরাধনা করতে হয়, যতক্ষণ না ধ্যাননেত্রে তাঁর রূপটি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে, শিল্পের এই অনুশাসনটি বৃথা নয়।

এই একটি রূপ ধ্যান করতে করতে শিল্পীর চোখে বিশ্বজগৎ লোপ পেয়ে যায়, নিখিল-বিশ্ব যেন সমস্ত রূপরস শব্দগন্ধ দিয়ে এই একটি বস্তুকে সৃষ্টি করে সার্থক হয়েছে। এই ধ্যানে শিল্পীর সমস্ত সত্তা যখন তাতেই মিশে যায়, তখন তাঁর চিত্তটি সেই ধ্যেয় বস্তুর আকার গ্রহণ করে। শিল্পী জীবনে যেখানে যা' কিছু মনোরম পেয়েছেন সে সমস্ত ছানিয়া এই মানসপ্রতিমা গঠন করেন। তাই যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ তিনি করতে পারেন প্রকৃতিতে কোথাও একত্রে সে সমাবেশ পাওয়া যায় না। সারা জীবন ধরে' যা তিনি কণায় কণায় আহরণ করে' এসেছেন ও তাঁর চৈতন্যের গুপ্ততম ভাণ্ডারে হয়ত তাঁর অজ্ঞাতেই সঞ্চিত করে' রেখেছেন এই কঠোর তপস্যার বলে তা' মুহূর্ত্তের মধ্যে এক মানসী প্রতিমার মূর্ত্তিতে সংহত হয়ে' যায়। জীবনে যা' বিচ্ছিন্ন ছিল তা' একত্রিত হয়, অস্তিত্বে যে প্রবাহ সহস্র ক্ষীণ ধারায় বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত ছিল তা' একই পবিত্র সঙ্গমে মিলিত হয়ে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতীরূপে অনন্তের উদ্দেশে কলনৃত্যে আনন্দময় অভিসারে বহির্গত হয়। শিল্পী যেমন আপনার মনের সকল শক্তি একত্রে সংযত করে' একটি মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন, তেমনই তাঁর বিষয়বস্তুরও অস্তিত্বের সকল ধারাও একই পথে প্রবাহিত করেন। সেজন্য তাঁর সৃষ্টি যে ভাবের দ্যোতক হয় তা' এতই শক্তিশালী বোধ হয়, আমাদের মনকে এত গভীর ভাবে আলোড়িত করতে পারে। সূর্য্যের যে তেজ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাকেই অতসী কাচের ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীভূত করলে তার দাহিকাশক্তি প্রতিভাত হয়। শিল্পীর প্রতিভা এই অতসী কাচের কাজ করে। শিল্পীর সৃষ্টি দেখলে তাই আমাদের মনে হয় যে" এ সকলই ত আমাদের পরিচিত সাধারণ বস্তু,

কিন্তু সেগুলি যেন কোথায় একটা সৌন্দর্য্যের সুষমা মেখে এসেছে। যাঁকে আমরা কর্ম্মরতা আভরণহীনা মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী বলে' জানতাম তিনি যেন আজ কোন দৈব নির্ঝরে গাত্রমার্জ্জন করে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী হ'য়ে উঠেছেন,—স্নিগ্ধ-নয়নার বিশাল লোচনে কজ্জলরেখা টেনে কে যেন বিদ্যুৎ কটাক্ষ সঞ্চার করে দিয়েছে, তমোনিবিড় কুঞ্চিত কেশ-কলাপে কে যেন হীরার ফুল পরিয়ে দিয়েছে ও নীলবসনের বেষ্টনে তনুটিকে ভূষিত করে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী-মূর্ত্তিতে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে এনে দিয়েছে। বিশ্বসংসারে সকল বস্তুই যে এত সুন্দর, এত আনন্দের প্রস্রবণ তা' যেন শিল্পীর চোখে দেখার পূর্ব্বে আমরা বুঝি নাই। বিশ্বের বিরাট জড় দেহটা নিয়ে যে আমরা এতদিন বিরক্ত হচ্ছিলাম, আজ শিল্পী তার জীবনদেবতার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচর করিয়ে দিলেন, সকলের ভিতর প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিলাম ও চিরসুন্দরের যে অশ্রান্ত বন্দনা-ধ্বনি সৃষ্টির প্রতি বস্তু থেকে নিয়ত উর্দ্ধে উঠছে তা' শুনতে পেয়ে আমাদের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হ'য়ে গেল।

শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অন্তরদেবতার সন্ধান করে ফিরেন ও তাঁর সাক্ষাত পেলেই সে সৃষ্টির মধ্যে অমরতার মন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু অন্তরদেবতা ত নানা মূর্ত্তিতে পূজার উপচার গ্রহণ করেন। রুদ্রের তাণ্ডবনৃত্যে দিগ্বিদিকে প্রলয়ের প্রভঞ্জন জেগে উঠে, বিশ্বসৃষ্টি টলমল করতে থাকে, আবার তুষার-শীতল কৈলাসের শুভ্রশিখরে সমাধিমগ্ন শিবের যোগাসন-তলে চপলা প্রকৃতি নতনেত্রে যুক্ত করে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শিল্পীর ধ্যাননেত্রে জীবন-দেবতা কোন মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন তা শিল্পীর মনের, শিল্পীর শক্তির ও তার সাধনার উপর নির্ভর করে। বিলাসিতায় শিথিলপেশী মধ্যযুগের ফ্লোরেন্সে অত্যাচর জর্জ্জরিত Michael Angeloর সরল ঋজু বিদ্রোহী মন দৃঢ়তা, দৃপ্ততেজ ও সুগভীর সংযমের সাধনা করত। তাই তাঁর সমাধিভাস্কর্য্যেও (যেমন Medici সমাধির উপর ক্ষোদিত নরনারী-মূর্ত্তিতে) কোথাও শোকের অবসাদ বা নিরাশার ক্লান্তি নাই। এমন কি হংসরূপী জুপিটারের আলিঙ্গনবদ্ধা প্রেমময়ী Ledaর চিত্রে প্রণয়বিহ্বলার গদ্গদ তন্ময়তা নাই,—যেন তেজস্বিনী দৃপ্তা রমণী প্রেমাস্পদকে

অনুগ্রহ বিতরণ করছেন। এই Leda চিত্রই অন্য শিল্পীর চোখে কিরূপ ভিন্ন ঠেকেছে তা' অন্য দুইজন প্রতিভাশালী শিল্পী Leonardo da Vinci ও Correggioকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়। ভিঞ্চির Lada ব্রীড়ারক্ত-কপোলা নতনয়না সুন্দরী তরুণী। সুকুমার দেহযষ্টির রেখায় রেখায় সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলে' লজ্জারুদ্ধগতি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হংসরূপী জুপিটার দুটি পক্ষ দিয়ে তাকে প্রায় মানব-প্রেমিকের মতই আলিঙ্গন করছেন, পাশে এই মিলনের প্রণয়গ্রন্থি যমজ সন্তানদুটির ঈষৎতীর্য্যক নয়নে একটু হংসের নয়নের আভাস দেখা যাচ্ছে, সকল মূর্ত্তিগুলির দেহের ভঙ্গীতে লীলায়িত রেখায় অপূর্ব্ব সুষমা ফুটে উঠেছে, সুকুমার মুখের ডৌলের ভিতর শিল্পী বুদ্ধিমত্তা ও ভাব-প্রবণতার অতি মনোরম সমাবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাচীন গ্রীকেরা মানব-মনের ও প্রাণীজগতের মধ্যে যে ভাবসাম্য বিশ্বাস করতেন তা' যেন প্রতিভাশালী শিল্পী আপন মনে অনুভব করেঁছিলেন। মিকেলাঞ্জেলোর জগতে মানুষ নিয়তই বিরুদ্ধ শক্তি সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, জয়ী হচ্ছে; তা এই জগৎ থেকে কতই ভিন্ন। আবার করেজ্জোর জগৎ এ থেকে কত ভিন্ন। সেখানে জীবন-সংগ্রামের দুর্ব্বার রুক্ষতা নাই, বুদ্ধিবৃত্তির উজ্জ্বলতা নাই, ভোগের ভিতর সলজ্জ সংযমও নাই,—কিন্তু অপূর্ব্ব শালীনতা আছে, আত্মদানের মধ্যে তন্ময়তা আছে। জলকেলিরতা Ledaর সঙ্গে হংসরূপী জুপিটারের মিলন এখানে কেবল প্রেমিক প্রেমিকার মিলন নয়, এ যেন মূক প্রকৃতির একটা আনন্দাভিষেক। কচি কচি তরঙ্গগুলি চঞ্চল আগ্রহে Ledaর গণ্ডে উরসে বাহুমূলে সোহাগে ভেঙে পড়ছে, তীরতরুর নবপল্লবের হরিৎ ছায়াটি চঞ্চল জলে Ledaর সুবর্ণ কুন্তল, সুগঠিত স্তনাগ্রচূড়া আদরে মৃদু মৃদু স্পর্শ করছে, প্রোদ্ভিন্নযৌবনের প্রচুর স্বাস্থ্যেপূর্ণ নিটোল দেহের লাবণ্যের ভিতর দিয়ে বালারুণ-স্পর্শে প্রফুল্লনলিনীর গর্ভপত্রের সুকোমল বর্ণবিভা দেখা যাচ্ছে, স্মিতবদনে ঈষদ্ভিন্ন অধরের অবকাশে কুন্দদন্তের আভা প্রকাশ পাচ্ছে, Ledaর বিশাল লোচনে একটা প্রেমাবেশের মোহ গাঢ় হ'য়ে এসেছে ও তার সমস্ত দেহটি যেন আত্মদানের আগ্রহে অধীর হ'য়ে উঠেছে। এই চিত্রটিতে যেন আকাশ বাতাস বৃক্ষপল্লব তরঙ্গ মানুষ হংস সমস্তই একটা মত্ততায় মদন-যজ্ঞে আহুতি হ'য়ে উঠেছে। যে প্রতিভা নিয়ে

এই তিনজন শিল্পী জন্মেছিলেন, যে শিক্ষা তাঁরা জীবনে লাভ করেছিলেন ও যে আবেষ্টনের মধ্যে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তা' স্বতন্ত্র বলে একই বস্তু তিনজনের নয়নে এতই ভিন্ন বলে মনে হয়েছে। বাইবেল বর্ণিত উপাখ্যান অবলম্বন করে' ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে কত না চিত্র আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির মূল উপাখ্যান সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে তাদের সংখ্যা বিশ পঁচিশটির বেশী নয়। এইগুলিকে মূর্ত্তি দেবার সময় শিল্পী তাঁর আপন অন্তর হতে সম্পদ সংগ্রহ করে তাদের ভূষিত করেছেন ও তাঁদের অন্তরের সম্পদ যুগিয়েছে তাঁদের প্রতিভা, তাঁদের শিক্ষা ও তাঁদের আবেষ্টনের প্রভাব।

শিল্পী যখন তাঁর অন্তরের ভাণ্ডারে সম্পদ আহরণের জন্য যান তখন সেখানে যা সংগ্রহ করা আছে তাই আনতে পারেন। সেগুলিকে তিনি পরিবর্ত্তন করে' মার্জ্জিত করে, নানাভাবে সাজিয়ে সুন্দরের পূজার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেন, কিন্তু কোথাও নূতন উপাদান প্রস্তুত করতে পারেন না। যা নাই তার নূতন সৃষ্টি বোধহয় কেবল ভগবানই পারেন। শিল্পীর মনের ভাণ্ডারে নানা অবস্থায় আহৃত উপাদান থেকে যে সৃষ্টি তিনি করেন তার উপর তাঁর প্রতিভার ছাপ দিয়ে যান। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। শিল্পীর প্রতিভার আলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম বস্তুও মনোরম বোধ হয়। মনে হয় যেন তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে, আমাদের জীবনের তন্ত্রী যেন এতদিন বেসুরা বাজছিল, তিনি তাকে স্পর্শ করতেই তা' থেকে অপূর্ব্ব রাগিণী জেগে উঠেছে। আমাদের আপনার অন্তর থেকেই যে এই আনন্দময় রাগিণী উঠছে এতেই সুখানুভূতি আরও তীব্র বোধ হয়। যেখানে বিভিন্ন কণ্ঠের বেসুরা কোলাহলসমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছিলাম, সেই সমুদ্রের উপরই শিল্পী তাঁর কুহকদণ্ড সঞ্চালন করলেন, আর সমস্ত বিক্ষুব্ধ শব্দতরঙ্গ মুহূর্ত্তে শান্ত হ'য়ে গেল ও শুধু শোনা যেতে লাগল সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর বীণার স্বর্ণতন্ত্রীর মোহময় মূর্চ্ছনা। শুনলে মনে হয় এ সঙ্গীত ত আমরা এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু এত মিষ্টি ত লাগেনি। নানা বিসংবাদী স্বরের মধ্যে তা' যে হারিয়ে যাচ্ছিল, এমন করে

হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে এই দূরশ্রুত সঙ্গীতের ক্ষীণ তীব্র আহ্বানে আমরা যুগযুগান্ত ধরে' জন্মমৃত্যুর সাগর সাঁতার দিয়ে আজ এই জীবনের কূলে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ এই সুরের আবেশে আনন্দে অস্তিত্বের প্রতিরন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সম্বিৎ যেন মূর্চ্ছার সৈকতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ছে। হে শিল্পী, হে সুন্দরের পূজারি, এই বিরাটবিশ্বের প্রতি রোমকূপে প্রতি মুহূর্ত্তে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যশতদল বিকশিত হ'য়ে উঠছে তুমি তার মর্ম্মস্থলের মধুকোষ থেকে অমরমন্ত্রেপূত যে সুধাবিন্দু মানুষকে চিরকালের জন্য উপহার দিয়ে গেলে তার জন্য তোমায় নমস্কার।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পারিসে যত দিন থাকবার ইচ্ছা ছিল, তা হল না। কয়েক হপ্তা বাদ এক নিমন্ত্রণ পেলাম পশ্চিম ইংলণ্ড হতে। শ্বশুর-স্থানীয় গুরুজনের আমন্ত্রণ, না বলবার উপায় ছিল না। ছুটীর তখনও অনেক দিন বাকী, পারিসেও দেখবার অনেক কিছু বাকী। তবু, করি কি, তল্পী-তল্পা বেঁধে রওয়ানা হলাম। ইংরেজের রাজধানী এবার আরও একেবারে নিরানন্দ লাগল। একে ত লণ্ডনের চেহারা চিরদিনই ঐ রকম, তায় আবার এই মৌসুমে, শরৎকালে, শহর একেবারে খালী। সবাই গেছে বেড়াতে বেরিয়ে। যার নিতান্ত সঙ্গতি নেই, সেই শুধু পড়ে আছে।

দু দিন দুটো নাটক দেখে নিয়ে, তিন দিনের দিন বেরিয়ে পড়লাম পেডিংটন থেকে পশ্চিম মুখে। অনেক পথ অতিক্রম করে নামলাম গিয়ে সমারসেট জেলায় Minehead বলে এক ষ্টেশনে। এই মাইনহেড অঞ্চলের চাষারা একদিন ধর্ম্মের নামে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন টলিয়ে দিয়েছিল। পারে নেই কিছু করতে শেষ পর্য্যন্ত। দলে দলে বেচারারা প্রাণ দিয়েছিল কসাই-জজ জেফ্রিসের হাতে। কিন্তু জগৎকে তারা দেখিয়ে দিয়ে গেল যে ইংলণ্ড আর কোন দিন রোমের হুকুম-বরদারী করবে না। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের তখনকার মত জয় হয়েছিল, কিন্তু কদিনের জন্য!

আর সত্যিই কেথলিক ধর্ম্ম ইংরেজচরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। আমার এক ঘর কেথলিক বন্ধু ছিলেন। তাঁদের যতই দেখতাম, ততই এটা বুঝতাম। তাঁদিকে কেমন মনে হত আধা-ইংরেজ! সাধারণ ইংরেজের চেয়ে তাদের ভাব ঢের বেশী cosmopolitan, উদার ছিল।

হপ্তাখানেক রইলাম আমরা Minehead-এর কাছে পোরলক বলে গ্রামে, এক মুচীর দোকানের উপর তলায়। ছোট্ট গ্রাম, চারিদিকে নীচু পাহাড় ও বন। এ দেশের একটা মস্ত সুবিধা যে বনগুলোতে কোথাও জঙ্গল মোটে নেই, অবাধে ঘুরে বেড়ান যায়। কোথায় ঘাসের ভেতর

থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে বেরিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াবে, কোথায় ঝোপের মধ্য হতে 'বন-বরা' দাঁত উঁচিয়ে তাড়া করবে, এ সবের ভয় নেই। বনের ভেতর সাধ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাব্যচর্চ্চা করা যায়। এক চিত্রকর দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা গ্রাম থেকে বহু দূরে বনের মাঝখানে বাড়ী নিয়েছেন। চাকর-বাকর রাখেন নেই, রান্না-বাড়া নিজেরাই করেন। গ্রাম হতে এক বুড়ী দিনান্তে এক বার এসে হাঁড়ী-কুঁড়ি মেজে ঝাড়-পোঁছ করে দিয়ে যায়। আমাদিকে একদিন এঁরা চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। খুব আনন্দে সারা বিকেলটা কাটিয়ে আসা গেল। বসবার ঘরে প্রকাণ্ড সেকেলে খোলা আতশ-খানা। তাইতে গাছের মোটা মোটা ডাল জ্বলছে। সবাই তার চারিদিকে বস্‌লাম। মেম-সাহেব বড় বড় রুটীর চাকতী, মোটা-মোটা নোনা মাংসের ফালি, ডেভনের মালাই ও ভাপা দই, এন্তার খাওয়ালেন। এঁরা নব-পরিণীত, কিন্তু বয়স নিতান্ত কচি নয়। রোজ এগারটার মধ্যে রেঁধে খেয়ে বেরিয়ে পড়েন ছবি আঁকতে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা ছবি এঁকে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফেরেন। একটু বিশ্রাম করে, চা, টোষ্ট, ডিম খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়েন। এবার এঁদের উদ্দেশ্য নিছক প্রেম-চর্চ্চা। বোধ হয়, দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘোরেন। হয়ত, বেড়াতে বেড়াতে কানে কানে কত কি বলেন! কে জানে! সে সব ত আর অভিনয় ক'রে আমাদিকে দেখালেন না। তবে বনে সব নিভৃত মনোরম স্থান আমাদিকে দেখাতে দেখাতে তাঁদের চোখে-চোখে যে বিজলী খেলছিল, তা কর্ত্তারা না দেখলেও আমার চোখ এড়ায় নেই। বাবুটির বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, গিন্নীর বছর পঁচিশ, অতএব আমার চোখে বুড়ো-বুড়ী। তাদের রকম-সকম দেখে একটু মনে-মনে হেসেছিলাম বই কি! বনের নানা সুন্দর স্থানের ছবি দুজনে এঁকেছেন। কত আনন্দে, কত উৎসাহে সে সব আমাদের দেখালেন। ছবি মন্দ নয় তবে তাঁদের কাছে অমূল্য। কেন না তাঁদের জীবনের মধুমাসের কতস্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ ছবির সঙ্গে।

পোরলকে সাত দিন মন্দ কাটল না। তবে তখনও পারিসের শোক ভুলতে পারি নেই। নূতন জায়গা লিণ্টনে পৌঁছে কিন্তু সব ভুলে গেলাম। চারিদিকে কি চমৎকার দৃশ্য! গ্রীষ্মকালে টেমস্‌-তীরে যে সৌন্দর্য্য

দেখেছিলাম, তার সঙ্গে এর ঢের তফাৎ। এ সম্পূর্ণ আর এক রকমের জিনিস। ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা গ্রামখানি। অদূরে সমুদ্র। সমতল ভূমি প্রায় নেই। রাস্তা সব উঁচু-নীচু, ঢেউ খেলানো। কাছে বন নেই। রাস্তার দুধারে সবুজ ঘাস। সমুদ্রের ধারের পাহাড়টা একেবারে খাড়া তার গা কেটে তাকের মতন এক সরু বেড়াবার পথ তৈরী করেছে। এখানকার লোকে তার নাম দিয়েছে কার্ণিশ। সেই কার্ণিশের উপর বড় জোর তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে। মাথার উপর নীল আসমান, পায়ের তলায় নীল দরিয়া, একা চলতে চলতে একটু যেন স্বপ্নের আমেজ আসে। কিন্তু ঠিক স্বপ্ন দেখার মত জায়গা নয়। খুব সাবধানে চলতে হয়। সারাক্ষণ একটা ঝড়ের মতন হাওয়া পাহাড়ের গায়ে ঝাপটা মারছে। একবার পা ফসকালেই আর হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কার্ণিশের এক দিকটা থেকে হাজার খানেক হাত নামলেই লিনমাউথ বলে আরএক গ্রাম, জেলেদের বসতি। সামনে পোস্তা-বাঁধা। তার নীচে কাতার দিয়ে মেছো ডিঙ্গী সব নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঢেউয়ের উপর নাচছে। দুচারখানা ডিঙ্গী আবার বালির উপর টেনে তোলা রয়েছে। তাদের মেরামতি চলছে। জেলেগুলোর রঙ্গ রোদে পুড়ে, নোনা জলে ভিজে, মেহগিনির মতন হয়ে গেছে। আমি ত ক্রমাগত চারিদিকে, উপর নীচে, ঘুরে বেড়াতাম। এ অঞ্চলের জেলে চাষাভূষো, সকলের সঙ্গেই যেচে আলাপ করেছিলাম। তবে আলাপ বেশীদূর এগোতে পারে নেই, ভাষা বিভ্রাটের জন্য। এদের বাঙ্গাল ইংরেজী, আর আমার বাবু-ইংলিশ, এ দুয়ের সঙ্গৎ কিছুতেই জমত না। হাত পা নাড়াই দুপক্ষের প্রধান সম্বল ছিল। হপ্তাখানেক পরে তাইতেই কাজ চলে যেত। লিনমাউথ থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই এক সুন্দর বন। কতকটা গোরলকের বনের মতই তবে তার চেয়ে আরও মনোরম। সেই বনের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে লিন্ নদী। নামেই নদী, কিন্তু সত্যি একটি পাগলী নির্ঝরিণী। কোথাও পাথর থেকে পাথরে লাফ মেরে মেরে ছুটেছে, কোথাও বা বাধা পেয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, আবার কোথাও বা পাথরগুলোকে পাশ কাটিয়ে কুলু-কুলু করে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে।

ভারী চমৎকার দেখতে! এ বিলেত দেশটার মজাই এই। বন, পাহাড়, নদী, মায় সমুদ্র পর্য্যন্ত, সব যেন খেলা-ঘরের দৃশ্যপট! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটুও ভয় করে না। ভয় হয় বরং এখানকার বিশালকায় রক্তবদন মানুষগুলোকে দেখলে। কিন্তু তাদের কেবল বাহিরেটা ঐ রকম। অন্তর ছেলেমানুষের। আমাদের মতন এঁচড়ে-পাকা পদার্থ এ দেশে দুর্লভ।

ইংরেজদের খাওয়া-দাওয়া কতকটা আমাদের হিন্দুস্থানীদের মতন। মোটামেঠো স্বাস্থ্যকর খাবার খানিকটা পেটে পুরলেই হল। যাতে তাকৎ হয়। সে ভোজনের ভেতর সভ্যতা বা মার্জ্জিত রুচির চিহ্নমাত্রও আমার নজরে পড়ে নেই। পাঠককে ত বলেছি যে লিণ্টনে আমি শ্বশুর বাড়ীতে বাস করছিলাম। সুতরাং ভোজনাদি জামাই আদরেই চলছিল। গ্রাউস্ নামে এক পক্ষী ঐ মৌসুমে সকল বড় লোকেই খায়। কর্ত্তা একদিন সেই উপাদেয় পদার্থ আমার জন্য ফরমায়েশ করলেন। খবর শুনে আমি খুব খানিকটা jog trot দৌড়ে খিদে বাড়িয়ে এলাম। খানায় বসে প্রথমে মামুলী সুরুয়া, ও ময়দার কাইসংযুক্ত সিদ্ধ মাছ খাওয়া হল। আমি তখন অজানার প্রতীক্ষায় একটু উত্তেজিত। বাড়ীওয়ালী যখন ধূমায়মান এক বড় বারকোশ হাতে প্রবেশ করলে, তখন আমি মনের আবেগে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা উৎকট গন্ধ এসে আমার নাকে ঢুকল। আমি বসে পড়লাম। কর্ত্তা একটু হেসে বললেন, "Hallo, dont you like the flavour? কি, হে গন্ধ কেমন লাগছে? ঐ ত তোমার গ্রাউস্। খেয়ে দেখ কি চমৎকার!" আমি তখন মর্ম্মাহত। এত আশায় ছাই পড়ল! আস্তে আস্তে নিবেদন করলাম, "আমাকে ক্ষমা করতে হবে। ও জিনিস মুখে দিলে ভারী মুস্কিল হবে।" পেটের তখনও খিদে মেটে নেই বটে, কিন্তু ঐ flavour যাই কি ক'রে! কর্ত্তা রাগ করলেন। নিজেও মুখে দিলেন না। বাড়ীওয়ালীকে বললেন, "নিয়ে যাও। তোমরা খাও গিয়ে।" গোটা বারো টাকা নষ্ট হল। পরে শুনলাম যে পক্ষীটি পনের দিন আগে নিহত হয়েছিল, আর ঐ রকম এক পক্ষের বাসি না হলে ও মাংসের স্বাদ ঠিক হয় না। মগেরা ঙাপ্পি খায় বলে তাদের এত নিন্দা!

লিণ্টন অঞ্চলে তখনকার দিনে রেল ছিল না। পোরলক থেকে কতকটা হেঁটে আর কতকটা ফেটিন গাড়ী চেপে এসেছিলাম। ফেরবার সময় বার্ণস্টেপলে ট্রেন ধরলাম। ষ্টেশন পর্য্যন্ত চৌদ্দ মাইল পথ প্রকাণ্ড মান্ধাতার আমলের ষ্টেজকোচে গেলাম। চার ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়ার পিঠে postillion সহিস, লোক সরাবার জন্য থেকে থেকে বেশ লম্বা শিঙ্গা ফুঁকছে, বেশ মজার লাগল। তবে পথে Robin Hood বা Dick Turpinএর সাক্ষাৎ না মিললে ষ্টেজ-কোচের পুরো মজাটা পাওয়া যায় কি!

এবার লণ্ডনে ফিরে আমার হষ্টেলজীবনের শৃঙ্খল খসল। ব্যাপারটা সহজে সংঘটিত হয় নেই। বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, বিশেষতঃ আমার মাষ্টার মহাশয় রেন্‌কে নিয়ে। তবে কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত মানলেন যে আমি সাবালক হয়েছি, আমাকে আলাদা বাসা করে থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

শৃঙ্খল খসল বলেই পাঠক যেন মনে করবেন না যে আমার জীবন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল। তা হয় নেই। তবে কতকটা বিশৃঙ্খল যে হল, তা নিশ্চিত। ক'মাস লণ্ডনে সাহেব-সংসর্গেই দিন কাটছিল। খাওয়া-দাওয়া, ঘোরা-ফেরা, গল্প-গুজব, সবেতেই তাঁরা প্রধান সাথী ছিলেন। মাঝে মাঝে আমার স্বদেশী গুরুজন-স্থানীয়াদের বাড়ীতে উৎপাত ক'রে আসতাম, এই পর্য্যন্ত। কিছুদিনের জন্য, পরীক্ষা পাশ করব বলে একটা উৎসাহও মনে এসেছিল। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সব উলটে গেল। সমবয়স্ক স্বদেশী বন্ধুবান্ধব অনেক মিলল। তাঁদের কেউ কেউ আমার মতন সিভিল সার্ব্বিসের উমেদার ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশেরই লেখাপড়ার বিশেষ বালাই ছিল না। তখনকার দিনে বার পরীক্ষার জন্য ত পড়াশুনা আবশ্যক ছিল না। আমার এই বন্ধুমণ্ডলীর কেউ কেউ গত হয়েছেন, কেউ কেউ বা আছেন। তাঁরা সবাই আমাকে এত স্নেহ করতেন, যে একবার তাঁদের নাম করে স্নেহাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা হবার নয়। আমি নানান্‌কথা লিখতে বসেছি। বৃদ্ধ বয়সে কারও নাম করে কাজ নেই।

আমাদের নানাস্থানে নানা রকমের আড্ডা জমত। কোথাও বা তাস-পাশা চলত, কোথাও বা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা, কোথাও বা ভারত-উদ্ধার। বিলেতে ছাত্রজীবনে সুন্দরী-সন্ধান যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনই ব্যয়-সাপেক্ষ। আমার অর্থাভাব ছিল না, বিপদকেও ডরাতাম বলে মনে নেই। তবু একটা সেকেলে ব্রাহ্ম কুসংস্কার সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা সম্বন্ধে আমাকে কেমন অন্ধ করে রেখেছিল। যাক্, তাতে কিছু লোকসান হয় নেই।

তরুণ বয়সে মানুষ যেটা যথার্থ চায়, সেটা excitement, উত্তেজনা। তাস খেলাতে দু পাঁচ টাকা হেরে-জিতে সেটা না পাওয়া গেলেও ভারত-উদ্ধারের কাজে তার অপ্রতুল ছিল না। তবে পাঠক হয়ত হেসে জিজ্ঞাসা করবেন, বিলেতে সাহেব সেজে আড্ডা দিয়ে দুঃখিনী জননীর কোন্ দুঃখটা মোচন করছিলে? এ কথার আমি উত্তর দেব না। আমাদের সেই বয়সের পাগলামির কথা মনে করে নিজেই যে কম হাসি, তা নয়। তবে কি জানেন, পাগলের কাণ্ড দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়, কিন্তু রাগ ত হয় না! যারা সে সময় লণ্ডন-ময় প্রকাশ্য সভা ও গুপ্ত মন্ত্রণা করে বেড়াতেন, তাঁদের অনেকেই পরের জীবনে যথেষ্ট কীর্ত্তি সঞ্চয় করেছেন। তাঁদিকে নগণ্য জ্যাটাছেলে ব'লে আবর্জ্জনাস্তূপে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া যায় না। এই ছিল আমার বন্ধুমণ্ডলী। আজ আমি সরকারী মানুষ। রাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা আমার পক্ষে অশোভন। তবে দু চারটে গল্প না করলে আমার পুরানো কথা লেখকের কর্ত্তব্য-পালন হবে না।

পরীক্ষা পাশ করার কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা জনাকয়েক ভারত-সচিব মহাশয়ের দপ্তর থেকে এক পত্র পেয়েছিলাম, এই মর্ম্মে—যদিচ আপনি এখনও সিবিল-সার্ব্বিসের কর্ম্মচারী নহেন, তথাপি সরকারী চাকরের রাষ্ট্রনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করা সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী আছে, তাহা আপনি পালন করিতে বাধ্য।

একখণ্ড নিয়মাবলীও এসেছিল চিঠির সঙ্গে! তাগীদ-সত্ত্বেও যে নিয়ম মেনে চলি নেই, এ খবর আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় ভারতবর্ষে এসে পৌঁচেছিল। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। ধূম দেখেছিলাম বই কি! এ সব অনেক পরের কথা, এখন মুলতুবী থাক্।

আমি হস্টেল ছেড়ে প্রথম উঠলাম এক বোর্ডিং হাউসে। সেখা বেশী দিন টিঁকতে পারলাম না। যে সব লোকের সঙ্গে সেখানে রোজ খে খেতে হত, তারা ঠিক আমাদের gentry জাতের ছিল না। পাঠক জানেন উনিশ শতকে জাতিভেদ কি রকম প্রবল ছিল। কার্ল মার্ক দুন্দুভি তখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় নেই।

একটা বাজে গল্প বলি এই বোর্ডিং হাউসের। বাড়ীওয়ালীর এক বছর ষোলর মেয়ে ছিল, ভারী দুষ্টু। সে আমাদের সকলের বড় প্রিয়পা ছিল। ষোল বছরের মেয়েকে সেকালে বিলেতে ত আর কেউ স্ত্রীলোক ব করত না! আমরা Q-কে পোষা বাঁদরটির মতনই দেখতাম। ইতিমধ্যে এক মজা হল। দেশ থেকে Xনামে আমার এক বন্ধু এসে সে বাড়ীতে উঠলেন। সে ভদ্রলোক এই মেয়েটার দিকে সোজা চাইতে পারতে না। কখনও গায়ে গা ঠেকলে বিব্রত হয়ে উঠতেন। মুখ কান লাল হয় যেত। মাঝে মাঝে আড় চোখে তার দিকে চাইতেও ছাড়তেন না। অথ আমরা মেয়েটাকে ঠেলা ঠেলি ধাক্কাধাক্কি করলে বিরক্তিও প্রকাশ করতেন একদিন গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "মশায়, দেশে যখন চিঠি লিখবেন Q-এর কথা কিছু লিখবেন না যেন। আমার দাদার কানে যদি কোন রকমে যায় তাহলেই হয়েছে! ষোল বছরের তরুণীর সঙ্গে এক বাড়ীতে আ জানলে কেলেঙ্কারের শেষ থাকবে না।"

Q তরুণী শুনে আমার খুব হাসি পেলে। কিন্তু সেই বাড়ীর আ আর এক বাসিন্দা Z, সেখানে বসেছিলেন, তিনি চটে আগুন হয়ে গেলেন চেঁচিয়ে উঠলেন, "হতভাগা! এ সব লোক বিলেতে কেন যে আসে জানি না! থাম, দেখে নিচ্ছি ওকে।"

সন্ধ্যাবেলায় এক বাক্স চকোলেট কিনে নিয়ে এসে Z আমাকে বললেন, "ওহে মেয়েটাকে একবার ডাকত!" Q এলে পর তাকে বললেন, "বাঁদ এক কাজ করিস্ ত তোকে এই চকোলেট দেব।" "সবটা?" "হাঁ, সবটা" "আচ্ছা কি করতে হবে, বল।" "আজ খানার পর সকলে আমরা যখ বিলিয়ার্ড ঘরে বসব, তুই আচম্‌কা গিয়ে X-এর গলা জড়িয়ে ধরে আদ করবি, আর বলবি—আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি। পারবি?" মেয়ে

আস্ত বাঁদরী। দর-দস্তুর আরম্ভ করে দিলে। আমাকে বললে, "তুমিও যদি এক বাক্স মেঠাই দাও, ত করব। নইলে পারব না। মার কাছে কানমলা খেতে হবে। আর—মাগো, যে চেহারা!" কি করি, আমি কবুল করলাম। ফলে খানার পর সকলে যখন বিলিয়ার্ড ঘরে জমায়েত হয়েছি, তখন Q বন্ধুবরকে আক্রমণ করে বেশ থিয়েটারী ঢঙ্গে প্রেম নিবেদন করলে। বন্ধুর মুখে কথা সরল না। কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিলেন। Q মার কাছে দু'চারটে কানমলা ঠিক খেলে। রাত্রে Z আর আমি X-এর দরজায় দাঁড়িয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করলাম। তিনি খিল খুললেন না। সকালবেলা নাগাদ কিন্তু ভদ্রলোক নিজকে বেশ সামলে নিলেন। চায়ের টেবিলে সবাইকে খুব হেসে "গুড্‌মর্ণিং" বললেন যেন কিছুই হয় নেই। তার পর বিকেলে Q-কে এক বড় বাক্স টফী কিনে এনে দিলেন।

X ঠিক normal হিন্দুর ছেলে ছিলেন, তা আমি বলছি না। তবে গল্পটা থেকে ইংরেজ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের যে সব অদ্ভুত নীচ ধারণা ছিল (?) তার আঁচ পাওয়া যায় বই কি! সে যাইহোক X মহাশয়ের পুরো সাহেব হতে বেশী সময় লাগল না।

এই বোর্ডিংহাউস থেকে উঠে আমি নিজের বাসা করলাম। অর্থাৎ একেবারে স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়ালাম। আর অন্য লোকের সঙ্গে খেতেও হত না, বসতেও হত না। আড্ডা আরও বেশী জমতে লাগল। পাঠকের মনে থাকতে পারে যে ১৮৯৭ সালে দেশে নানা রকম বিভ্রাট ঘটেছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, প্লেগ, খুনোখুনি, কিছুই বাকী ছিলনা। এই সব ব্যাপারে প্রবাসে আমাদের মন বড় বিচলিত হয়ে উঠেছিল। দিবা রাত্র এই জটলা চলত যে আমাদেরই পাপে এই সব হচ্ছে। সেই বছর আবার রাণী ভিক্টোরীয়ার জুবিলী উৎসব। কথা হল যে লণ্ডন ভারতসভা দেশের তরফ হতে মহারাণীকে একটা মানপত্র দেবেন, আর আঞ্জুমান মুসলিমের তরফ হতে আর একটা দেবেন। সীমান্তে পাঠানদের উপর অত্যাচার হয়েছে, এই অজুহতে মুসলমান মানপত্র সহজেই নাকচ করা গেল। কিন্তু ভারত সভায় দেশপূজ্য দাদাভাই আমাদের আমলই দিলেন না। আমরা সভায় রীতিমত একটা খুব শোরগোল করে বেরিয়ে এলাম। আমাদের উদ্দেশ্য

এতেই সফল হল, কেননা পরের দিন টাইম্‌স্ থেকে আরম্ভ করে সব খবরের কাগজেই লিখলে যে ভারতের তরুণ দল আর ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। এর পর আমরা নানা প্রকাশ্য সভায় নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসনীতি-সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানিয়ে করতে লাগলাম। আমাদের কার্য্যক্রম কতকটা বে-আইনী ছিল বই কি। হঠাৎ সুযোগ বুঝে আমাদের দলের কোন নেতা দাঁড়িয়ে উঠে দুচার কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করলেই আমরা হাল্লা করে দল বেঁধে বেরিয়ে আসতাম। এই সব ব্যাপারে মহাত্মা দাদাভাই যে আমাদের উপর খুব অসন্তুষ্ট হতেন তা আমরা মনে করতাম না। তবে তিনি কংগ্রেস দলের কর্ত্তা, আর কংগ্রেসের ধর্ম্ম ত ছিল ভিক্ষাবৃত্তি, তাই প্রকাশ্যে তিনি আমাদের কোন আস্কারা দিতেন না। একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম। আমাদের সমস্ত বক্তব্য তিনি শুনলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের মতন দুটি অর্ব্বাচীন বালককে নিয়ে তিনি কাটালেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও হাসলেন না, ঠাট্টা করলেন না। আমরা মোহিত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। এটা স্থির বুঝে এলাম যে তিনি যথার্থ সারা ভারতের নেতা, একা কংগ্রেসের নয়।

দাদাভাই এই সময়টা অত্যন্ত গরীবানা ভাবে কাটাচ্ছিলেন। দূর শহরতলীতে একখানা ছোট্ট ঘর নিয়ে থাকতেন। ঘরে আসবাবপত্রও নিতান্ত সাদা-সিধে। একটি সরু লোহার খাট, ছোট একটি লেখার টেবিল, খান অতি সাধারণ কেদারা। চারিদিকে গাদা গাদা বই, কতক তাকের উপর, কতক ভুঁইয়ে পড়ে। খাটের পাশে দেওয়ালে ঝুলছে পিজ-বোর্ড কাগজে আঁটা একখানা ব্যঙ্গ-চিত্র। নাম, "কালা আদমী কে?" বিলেতের প্রধান মন্ত্রী সল্‌স্‌বেরী গায়ের জ্বালায় দাদাভাইকে black man বলেছিলেন। সেই উপলক্ষে এই চিত্র একখানা বিলেতী কাগজে বেরিয়েছিল। চিত্র দেখে কারও সন্দেহ থাকে না যে দাদাভাই মন্ত্রী মহাশয়ের চেয়ে অনেক ফর্সা।

আমরা নবভারত সভা বলে এক সমিতি করেছিলাম। ফি শনিবার কারও না কারও বাসায় বৈঠক জমত। সমিতির কাজ-সম্বন্ধে কোন ঢাক ঢাক গুড়-গুড় ছিল না। বিজ্ঞাপনাদি খোলা পোষ্টকার্ডেই যেত।

ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতসচীবের একজন এল্‌চী এসে সমিতিতে ভর্ত্তি হলেন। তিনি কি আর বলেছিলেন যে তিনি সরকারী আদমী! তবে ভারতজননীর জন্য আমাদের চেয়েও বেশী ফুঁফিয়ে কাঁদতেন। তবে অবশেষে বোঝা গেল যে তিনি আমাদের মতন বোকা নন, সমিতি করে দু পয়সা রোজগার করছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বয়সের যোগ্যই ছিল, অর্থাৎ বেজায় গরম। আমাদের দুই একজন মুরুব্বীর নাম করলেই পাঠক আন্দাজ করতে পারবেন যে কত গরম। হাতকাটা ফিনিয়ান মাইকেল ডেভিট্, যিনি সেই সবে দশটি বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছিলেন, সোশিয়ালিষ্টদের বড় কর্ত্তা হাইণ্ডম্যান, মজুরদলের দুর্দ্দান্ত নেতা টম্ ম্যান্ এঁরাই আমাদের সলা-পরামর্শ দিতেন। নবভারতের দল ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। গরম ভাবনা ও গরম বাক্য (কার্য্য ছিলই না, গরম কি ঠাণ্ডা!) আমাদের বয়সের লোকের বেশ ভালই লাগত। ক্রমশঃ দেখা গেল যে অনেকে শনিবার সন্ধ্যায় অন্য ভালমন্দ আমোদ উত্তেজনা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বৈঠকে আসতে আরম্ভ করলে।

একদিন ডেভিট্ আমাদের দুই একজন দলপতির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। সেই প্রস্তাব মত কাজ হলে ভারতের রাজনীতির একটু লাভ হত বই কি! ডেভিট্ বললেন, "আমাদের আইরিশ দলের অর্থাভাব। তোমরা যদি বছরে আট লক্ষ টাকা নগদ দাও, ত তোমাদিকে আয়র্লণ্ডের আটটা seat, মেম্বরের জায়গা দিতে পারি। বিলেতসংক্রান্ত সব বিষয়ে তোমাদের আট জনকে আইরিশ নেতার হুকুম মাফিক ভোট দিতে হবে, আর ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে আইরিশ দল তোমাদের তরফে ভোট দেবে। রেডমণ্ডের সঙ্গে কথা কয়েছি। আমি তাঁকে রাজী করতে পারব। তোমরা কংগ্রেসের কর্ত্তাদের বলে টাকাটার ব্যবস্থা কর।" এ কথায় কিন্তু দাদাভাই কানই দিলেন না। বললেন, "ও রকম কূটনীতিতে ভারতের উপকার হবে না।" বোধ হয় অভদ্রও বলেছিলেন। তখন বিক্টোরীয় যুগের ভব্যতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকেছে কি না!

একবার আমরা নওরোজী সাহেবকে খুব জোর জবরদস্তি করাতে তিনি প্রকাশ্য সভায় সরকারকে কড়া কড়া দু কথা শোনাতে রাজী হলেন। বেশ

জোর রকম একটা মন্তব্যের খসড়া হল। আমরা মহা উৎসাহে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। ইংরেজ সাধারণের মনে বেশ একটু উত্তেজনা দেখা গেল। কিন্তু হঠাৎ আগের দিন আমাদের কানে এল যে একজন পা- সিনিয়ার ছাত্র মিঃ নওরোজীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে সভায় বক্তৃতা করবে। তখন আর কিছু করবার সময় নেই। লোকটাকে দরকার হলে তুলে রাস্তায় ফেলে দিতে হবে, এই স্থির করে পরদিন আমরা চোখ পাকাতে পাকাতে সভায় গিয়ে বসলাম। আমরা ভব্যতার ধার ধারতাম না। এই আমাদের একটা গর্ব্বের বিষয় ছিল। দাদাভাই যখন রায়কে ডেকে পাঠালেন, আমরা ভাবলাম একটা কিছু রফার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা আরও গরম হয়ে উঠতে লাগলাম। একটু পরে রায় একখানা কাগজ এনে আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, "এইটে M-এর Amendment, দাদাভাই বলছেন যে এতে তোমাদের অন্ততঃ কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।" পড়ে দেখি Amendment-টা আসল মন্তব্যের চেয়েও বেশী কড়া। আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম। একজন ছাত্র বিশ্বাসঘাত করবে, এ চিন্তা আমাদের অসহ্য হয়েছিল। M খুব জোর বক্তৃতা করলেন। বোম্বাই বন্দর ও বর্ত- বন্দরের নাম করে সরকারের উদ্দেশে যে সব কথা বললেন,তা আজকের দিনে বলা চলে না। খুব হৈ হৈ করে মিটিং ভঙ্গ হল।

যথাকালে এই সভার খবর দেশে পৌঁছল। বোম্বাই ও কলকাতার প্রবীণ মহারথীরা বড় বিচলিত হলেন। বৃদ্ধ দাদাভাই কতকগুলো বাপে- তাড়ান মায়ে-খেদান ছোঁড়ার পাল্লায় পড়ে কংগ্রেসের চিরন্তন নীতির মাথায় মুগুর মারবেন! এ তাঁরা কেমন করে সহ্য করবেন? দু পাঁচখানা কাগজে বের হল, যে বৃদ্ধ দাদাভাইয়ের ভীমরতি ধরেছে, তাঁর আর কাণ্ড- কাণ্ড জ্ঞান নেই। আমরা শুনে আগুন হয়ে উঠলাম। এত বড় আস্পর্দ্ধা! একমাত্র স্বার্থত্যাগী দেশনেতা নওরোজী, তাঁকে কি না এই সব কথা বলে! আর বলে কে, যত স্বার্থসর্ব্বস্ব পেট-মোটা উকীল বাবুরা। আমাদের দু- একজন তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরে গিয়ে practical steps নেওয়ার কথা উত্থাপন করলেন। কিন্তু হঠাৎ কর্ম্মবীর হওয়ার মত উত্তম আমাদের কারো বোধ হয় ছিল না। শেষ, অনেক পরামর্শের পর স্থির হল যে আমরা দাদা-

ভাইয়ের এক শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি করিয়ে দেশে পাঠাব। খবর নিয়ে জানা গেল যে প্রায় তিনশো পাউণ্ড লাগবে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব! আমাদের একশো পাউণ্ড জমল। তাই নিয়ে ওয়েডারবার্ণ সাহেবের কাছে দুই একজন গেলেন। এই সাহেব একজন যথার্থ ভারতবন্ধু ছিলেন, আর দাদাভাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাদের সবরকমে সাহায্য করবেন বললেন, কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন দাদাভাই নিজে। তিনি বললেন, "আমার মূর্ত্তির সাধ হয়, ত মুখের একটা কথা খসালেই ত আমার বন্ধু তাতা কাল একটা মূর্ত্তি খাড়া করে দেবেন। তোমরা গরীব ছাত্র, আমার বন্ধু, তোমাদের পয়সা আমি কেন নেব!" আমরা প্রস্তাব করলাম যে আমরা সারা ভারতময় চার চার আনা চাঁদা সংগ্রহ করে টাকা তুলব। তাতে ত কোন আপত্তি থাকতে পারে না! ওয়েডারবর্ণ এই প্রস্তাবে দাদাভাইকে রাজী করালেন। তখন আমরা ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেস আপিসে চিঠি পাঠালাম যে আমাদের একশো পাউণ্ড তৈয়ের আছে তাঁরা সকলে চেষ্টা করে আর দুশো পাউণ্ড তুলে দিন; সকলে দেখুক যে, দাদাভাই আমাদের বিশ্বস্ত নেতা। সুরেন-বাবু ও গোখলে আমাদের পত্রের একটা করে উড়ো রকমের জবাব দিলেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখলেন, "এ প্রকার কার্য্যের সহিত আমার এখন কোনও সম্পর্ক নাই।" তিনি তখন হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। বাকী ছোট বড় নেতারা কেউ রা কাড়লেন না। আমাদের রাগও হল, দুঃখও হল। একজন বন্ধু বললেন, "দেশ এখনও জানে না, আমরা কে! একদিন চিনবে।" কথাটা বেশ শোনাল। কিন্তু আমাদের চেনা অতিসহজ। আমারা সেই চিরদিনের সোনার পাথরবাটি!

এই সব ঝড় তুফানের মাঝে আমার I. C. S. তরীখানা প্রায় তলিয়ে গেছল, আর কি! কিন্তু হাল ছিল শক্ত হাতে, তাই শেষ পর্য্যন্ত কূল-কিনারা মিলল। তবে আমারা তরী কূলে লেগে মঙ্গল হল কি না, কে জানে!

পরীক্ষার বছর খানেক আগে কলেজ ঝেড়ে ফেলে দিলাম। রেন্ আমার মতন ভবঘুরের মাঝে কি দেখেছিলেন, জানি না। আমাকে এক বছর অর্দ্ধেক মাইনেতে রাখতে চাইলেন। বললেন, "আমার টাকা মারা

যাবে না। সে ভয় আমার নেই। পাশ হয়ে দেশে ফিরে বাকী টাকা দিও।"

আমি বোঝালাম, "মহাশয় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়ত হয়ে উঠবে না। আপনি কেন মিছেমিছি টাকা নষ্ট করবেন। আমি পলিটিক্স চর্চা মনে করছি।"

সাহেব বললেন, "পলিটিক্স্ ত বেশ ভাল career (পেশা)। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধিও একটু-আধটু আছে। কিন্তু তোমাদের দেশে পার্লামেণ্ট নেই, সেখানে কি পলিটিক্স করবে?"

আমি চেপে গেলাম। কি হবে পাগলের খেয়াল সব বুড়োকে বলে। শেষ বৃদ্ধের সঙ্গে এক রফা করলাম! আমি অন্য কোন কলেজে যাব না আর যদি পাশ হই ত তিনি আমাকে তাঁর ছাত্র বলে দাবী করতে পারবেন। আমি এত গোলমালেও পড়াশুনো বন্ধ করি নেই। তবে পড়াটা দাঁড়িয়ে গেছল একটা গৌণ কাজ। আর নানা রকমের ধান্দাবাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখ্য কাজ। সাতানব্বই সালটা এই ভাবেই কাটল।

এই সালে পূজার সময় আমি সুইস্ দেশে বেড়াতে গেছলাম। কয়েক সপ্তাহ জেনিভায় কেটেছিল। যে ক্ষুদ্র হোটেলে থাকতাম, সেখানে ইংরেজ সমাগম বড় একটা ছিল না। আমি তাই মনের সাধে দিবারাত্র নবভারত পলিটিক্স্ আওড়াতাম। কতকগুলি নানা দেশের ভবঘুরে শ্রোতা জুটেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা খুব বক্তৃতা করছি, ইংলণ্ড সম্বন্ধে দুই একটা অভদ্র কথাও বলেছি, এমন সময় এক প্রকাণ্ড ষণ্ডামার্ক লালমুখো ইংরেজ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল। আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাত রেখে সে বললে, "মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে। বাহিরে বাগানে আসবেন কি?" বলে বেরিয়ে গেল।

আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল, আমার জীবনে একটা মস্ত শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে। এক বছর থেকে আমি কিরীচ খেলা শিখছিলাম। পিস্তলও চলন-সই রকম মারতে পারতাম। বড় সাধ ছিল যে continent-এ দুই একটা duel লড়ব। এত দিন মোকা মেলে নেই। আজ বিধি মুখ তুলে চেয়েছেন! কাছে বসেছিল এক ফরাসী বন্ধু। তার পিঠ জোরে

চাপড়ে বললাম, "ভাই, আমার সেকেণ্ড হবি ত?" সে হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, "mais oui, mon ami, নিশ্চয় হব। কিন্তু ইংরেজ লড়বে না।"

আমি বাহিরে যেতেই ইংরেজ ভদ্রলোকটি একটু হেসে বললেন, "বলুন, মশায়। আচ্ছা, আপনি এই হতভাগা বিদেশীগুলোর নিন্দা করেন কেন, বলুন দেখি!"

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। খুব নাটুকে ঢঙ্গে বললাম, আমি ইংরেজ নই, ইংলণ্ডের নিন্দা কেন করব না! আমি সত্য কথাই বলে থাকি, মিথ্যা নয়। তার প্রমাণ চান ত দিতে পারি।"

ইংরেজ তখন হাসছে। বললে, "হলেই বা সত্য! নিজেদের ঘরের কথা কি অপরকে বলতে আছে? পার্লামেণ্টে জানালে নিশ্চয় প্রতীকার হবে।"

আমি দু পা এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, "যে আসামী, তাকেই বিচারক করতে আমি প্রস্তুত নই। কিন্তু তর্ক বিতর্ক বৃথা। আপনি পিস্তল ছুড়তে পারেন?"

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল, "ওহো! তোমার ফন্দী এতক্ষণে বুঝেছি। তুমি আমাকে duel লড়াতে চাও! আমি লড়ব না! সাফ বলে দিচ্ছি মশায়, লড়ব না।" তার পর সে আমাকে টেনে পাশে বসালে। বসিয়ে বললে, "দেখ, তুমিও তর্ক করবে না। আমিও লড়ব না। ব'স, দুজনে গল্প গুজব করা যাক্।"

ধীরে ধীরে আমার বীররস উবে গেল। সাহেব বাস্তবিক চমৎকার লোক! এক ঘণ্টা দুজনে গল্প করলাম। উঠবার সময় সে বললে, "বন্ধু, সে দিন এখনও আসে নেই। এখন থেকে রাগারাগি করে কি হবে! তবে বিনা যুদ্ধে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়ব না, এটা নিশ্চিত।"

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

কামিনী রায়

আট বছর বয়সে কবিতারচনা সুরু এক কামিনীরায় ছাড়া বোধ হ আর কেউ করেন নাই—পশ্চিমের Hemans, Elizabeth Barre Cowley'ও না, আমাদের রবীন্দ্রনাথও না। নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র শিশু-কবি তাঁর মাষ্টার মশায়ের কবিতার পাদপূরণ ক'রে দিতেন এবং মাষ্টারমশায়ের দ্বিপদ ছাত্রের হাতে চতুষ্পদতা লাভ ক'রে সুন্দরতরই হ'য়ে উঠ্‌তো। কি তাঁর রীতিমতন কবিতারচনা আরম্ভ হয় দশের পরে, তবে পনরোর আগে এবং ছাপার অক্ষরে প্রথম কবিতার বই (কবিকাহিনী) বেরোয়, মনে হয় আঠারো শ আশী সালের কাছাকাছি। কামিনীরায়ের 'আলো ও ছায়া' বেরিয়েছিল উননব্বইএ অর্থাৎ বিশ্বকবির 'মানসী'র বছরখানেক আগে। 'আলো ও ছায়া' সঙ্কলন, 'কবিকাহিনী'র মতন একটা বড়ো কবিতা নয়।

কামিনীরায়ের সৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ না হ'লেও সীমাবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের মতন বিপুল নয়। তবু দুটি কবি পাশাপাশিই চল্‌ছিলেন।

রবীন্দ্রকাব্য দেশকালের সীমা অতিক্রম ক'রে বিশ্বের বস্তু হ'য়ে উঠ্‌লো; ইউরোপ তার কণ্ঠে জয়মালা পরিয়ে দিলে। দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে বাঙলায় রবির গ্রহ-উপগ্রহ জে'গে উঠ্‌লো (আজও তা'র বিরাম নেই)। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রযুগ ব'লে একটা বিরাট যুগের নামকরণ হ'লো—যে নামকরণের আমি চিরবিরোধী; কারণ, ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে Age ব'ল্‌তে যা' বোঝায়, রবীন্দ্রযুগের 'যুগে' তা'র কোনো সার্থকতা আছে ব'লে মনে করি না। ব্যক্তিবিশেষকে যুগ আখ্যা দেওয়া যদি সম্ভব হয়, রবীন্দ্রযুগের হয়তো অর্থ হ'তে পারে।—এতো সত্ত্বেও কামিনীরায় তাঁর পথে চল্‌তে লাগ্‌লেন একা,—নিঃসম্পর্ক একটি জ্যোতিষ্কের মতন। 'আলো ও ছায়া'র ভিতর দিয়ে তাঁর প্রথম যাত্রা যে ভাবে সুরু হ'লো, অনেক পরে 'দীপ ও ধূপ'-এর আলো-ছায়ায় তা'র রূপান্তর দে'খ্‌লাম না। রবির আলোক-পরিধির বাইরেই রইলো কামিনীর অয়নচক্র।

সত্যকার কবিরা কবি হ'য়েই জন্মগ্রহণ করেন; ওঁদের মানুষ-কারখানায় তৈরী করা যায় না, যদিচ তার চেষ্টা হয় না এমন কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ

...] —ইংলণ্ডে ফ্যাক্‌টরি রয়েছে Poetry Society। কামিনীরায় জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন কবিপ্রতিভা। তিনি ছিলেন আবার সাহিত্যিকের কন্যা। তখনকার দিনে চণ্ডীচরণ সেনের নাম সাহিত্য-রসিকদের সুপরিচিত। কামিনীকাব্যের যখন অঙ্কুররূপ, এদেশে মধু হেম নবীন তখন কাব্যলোকের অধিদেবতা। এই তিনজনের, বিশেষ ক'রে হেম নবীনের কাছে কবি কামিনীর যে দীক্ষা হয়েছিল একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যে'তে পারে। কাব্যের ভাবরূপ তথা দেহরূপ দুদিকেই তাঁর হেম নবীনের কাছে বিপুল ঋণ। এক-দিকে তাঁর পিতা, আর একদিকে বাঙলার আধুনিক কাব্যসাহিত্যের যুগস্রষ্টা এই কবিরা তাঁর প্রতিভার যাত্রাপথের পাথেয় জুগিয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ, নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক'—'কুরুক্ষেত্র'—'প্রভাস'—এর ভিতর দিয়ে গীতার অভিনব ব্যাখ্যা—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভক্তিনিষ্ঠ, প্রেমনিষ্ঠ, সেবাব্রত কামিনীকাব্যে মিলিত রূপ পেয়েছে। সকলের মূলে চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের নির্ভীক চিন্তা—ক্ষীণসংস্কার মনের উদার চিন্তা শৈশব হ'তেই কন্যাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পিতৃপ্রভাবের সঙ্গে মণিকাঞ্চনযোগের মতন যুক্ত হয়েছিল কামিনীর উচ্চাঙ্গের পাশ্চাত্য শিক্ষা—তিনি গ্র্যাজুয়েট্ ছিলেন। এই বি-এ পাশ করার মধ্যেও একটু বৈচিত্র্য ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি অনার্স পেয়েছিলেন।

সর্ব্বোপরি সেই যুগ—কবি যখন জ'ন্মেছিলেন, জন্মিয়েই যা'র বায়ু-প্রবাহ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ ক'র্‌তে সুরু করেছিলেন, সেই যুগ—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথম অংশ। 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ ক'রেছে, খরস্রোত স্তিমিত হ'য়ে এ'সেছে, অথচ আজকের এই অতি আধুনিক বা উৎ-আধুনিক উৎকটতার দূর পায়ের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না। ফ্যাশনের নামে দুর্নীতির চটুল লীলা অনেকটা মন্থর হ'য়ে এ'সেছে এবং বাঙালীজীবনের এক অংশে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মনীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্ম হাঁচিটিকটিকির বহিরাবরণ অপসারিত ক'রে গড্-আল্লা-কৃষ্ণ-খৃষ্টকে আপন গণ্ডীর ভিতর মিলিয়ে দিয়ে নিজের সর্ব্বব্যাপকতা এবং সনাতনত্ব প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। এমনতর একটা যুগ, যখন কামিনী-রায় জন্মগ্রহণ কর্‌লেন। যুগধর্ম্মের প্রভাব তাঁর প্রাণপ্রবাহে স্পন্দিত হ'য়ে

অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেল। যুগধর্ম্ম, পিতৃচরিত্র, আপনার শিক্ষা, যুগধর্ম্মে প্রতীক কবিদের কাব্য, সব তাঁর প্রতিভার আধারে সুসমঞ্জ পরিপাক পেয়ে তাঁর কাব্যসৃষ্টির ভিতর রূপায়িত হ'তে লা'গলো।

এই সকলের সঙ্গে একথাটা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে তিনি নারী ছিলেন—যাঁদের হৃদয়টা মস্তিষ্কের চেয়ে অনুপাতে বেশী তাঁদেরই একজন। তাঁর এই নারীহৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পন্দন তাঁর সৃষ্টির সর্ব্বত্রই অনুভব ক'রেছি।

কামিনীরায়ের কাব্যের এ একটা পরম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর সত্যকার অনুভবের সঙ্গে প্রকাশের লুকোচুরি খেলা নেই। ছুনিয়ায় এমন কবির অভাব নেই যাঁরা মনে যা' ভাবেন, কাব্যে তার প্রকাশ থাকে না এবং কাব্যে যা'র প্রকাশ হয়, তাঁদের জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আন্তরিকতার এই অভাব ভাবীকালে,—যখন কবিপরিচিতি হবে গৌণ এবং কাব্যই হবে মুখ্য সেই সুদূর ভাবীকালে পাঠককে পীড়া না দিতে পারে; কিন্তু এই জাতীয় কবিদের সমকালিক বা প্রায়সমকালিক যা'রা, ব'ল্‌তেই হবে তা'রা অভিশপ্ত।

কামিনীরায়ের কাব্য ছন্দে বিচিত্র না হ'তে পারে, ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় সূক্ষ্ম সুন্দর না হ'তে পারে, রসের দিক দিয়ে ততো গভীর না হ'তে পারে—পারে কেন, বটেও—তবু কবির পরিপূর্ণ আন্তরিকতা তা'কে মধুর ক'রে তুলেছে, উপভোগ্য ক'রে তুলেছে।

তাঁর কাব্যের ভিতর প্রায় আদ্যন্তই একটা সুর লক্ষ্য ক'রেছি—Pessimism ঠিক নয়, কেমন যেন অস্বস্তির ভাব। আনন্দের গান যেখানে তিনি গাইতে চে'য়েছেন, সেখানেও কেমন যেন একটা ক্লান্তির, একটা অবসাদের মূর্চ্ছনা বে'জে উঠেছে। জানি জীবনে তিনি অনেক আঘাত স'য়েছিলেন, বসুন্ধরা তাঁর কাছে ঠিক শান্তিনিকেতন ছিল না। ব্যক্তিগত স্পর্শই তাঁর সৃষ্টির ওঁপর এক মায়াময়ী ছায়ার আস্তরণ ফে'লেছিল। 'মায়াময়ী' বল্‌লাম এই জন্য যে ও'তে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য তথা মাধুর্য্য বে'ড়েই গিয়েছে। এখানেও কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্মান ক'র্‌তেই হবে। আত্মগত স্পর্শ যেখানে কবির কাব্যকে অনুরঞ্জিত ক'রে আত্মগতত্বের সীমা লঙ্ঘন করে অর্থাৎ দরদীমাত্রেরই হৃদয়ের ধন হ'য়ে ওঠে, সেখানে সে দোষ

না হ'য়ে গুণই হ'য়ে দাঁড়ায়। এক কথায়, শিল্প যেখানে আপনরূপে আপনি সম্পূর্ণ এবং শিল্পী তা'র অন্তস্তলে সুপ্রচ্ছন্ন, শিল্প এবং শিল্পী ছুইই সেখানে সার্থক। কামিনীকাব্যে এ-লক্ষণ পেয়েছি। এর বিপরীত লক্ষণ হেমচন্দ্রের অনেক কবিতাকে কাব্যলোকে প্রবেশাধিকার দেয় নাই। সত্য মিথ্যা জানি না—শুনেছি রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'য় এমনি নাকি একটা স্পর্শ আছে। থাকে ভালোই। আমাদের কাছে 'খেয়া' আত্মসম্পূর্ণ পরম কাব্য।

আজকের সাহিত্যবিচারের অতি সূক্ষ্ম মানদণ্ডে কামিনীকাব্যের ওজন যা-ই হো'ক্, তখনকার দিনে তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। নামকরা কবি তখন কেউ ছিলেন না ব'লেই কামিনীরায় যে 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে' হ'য়ে উঠেছিলেন এবং সে যুগের বাঙালীর সাহিত্যবিচারবোধের অতি স্থূলতার সুযোগ নিয়েই যে তিনি অনাসৃষ্টি সৃষ্টি ক'রে চ'লেছিলেন,—এমনতর নিষ্কুণ্ঠ রায়প্রকাশই বা কেমন ক'রে করি? তাঁর সৃষ্টির খ্যাতিসত্ত্বেও তা'র অনুসরণ-করণ, বা-রণন বড়ো কেউ ক'রেছে ব'লে মনে করি না। আপনাকে বহুর ভিতর বহুরূপে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নাই। তবু, তিনি যে কবি একথা মান্‌তেই হবে। প্রতিভার পরিমাণ সকলের মধ্যে এক নয়—না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু, সূর্য্যের চেয়ে কম হ'লেও তারারও যে দীপ্তি আছে একথা তো স্বীকার না ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ব'ল্‌তে হবে যে চন্দ্রের ধারকরা দীপ্তির চেয়ে তারার দীপ্তির মর্য্যাদা বেশী।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'

গতবারের 'পরিচয়ে' চার্ব্বাকমতের বিবৃতি করিতে গিয়া আ দেখিয়াছিলাম, নাস্তিকেরা প্রায়ই জড়বাদী। জড়বাদের মতে এই বি বিশাল বিশ্ব জড়-শক্তিতাড়িত অন্ধ পরমাণুপুঞ্জের যদৃচ্ছাজাত মাত্র—যাহাকে 'fortuitous concourse of atoms' জড়-বাদী বলেন ভূত ও ভৌতিক শক্তি—Matter ও Blind Force জগদ্-রচনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত—এমন কি, জড়বাদী জড়ের মধ্যেই জীবনে সামর্থ্য ও সম্ভাবনা দর্শন করেন—sees in Matter the promise and potency of Life (Tyndall)। তিনি আরও বলেন—'Life and Mind are merely by-products of the world process'— 'প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্ব-ব্যাপারের অবান্তর ঘটনা মাত্র।

জড়বাদী দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে চৈত 'মদশক্তিবৎ'—জড় অণু-পরমাণুর chemical reaction বা রাসায়নি পরিস্পন্দ মাত্র। সেই জন্য শরীরের নাশের সহিত চৈতন্যের উচ্ছে অবশ্যম্ভাবী। অতএব 'Survival of Man' কপোলকল্পনা। আ চিন্তা (Thought)? চিন্তা ত' মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—Thought is a function of the brain। যেমন যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, তেম মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়—'As the liver secretes bile so the brain secretes thought'। অতএব ভাবনা কামনা চেষ্ট (Thinking, Feeling, Willing)—এ সমস্তই মস্তিষ্কের স্পন্দন মা (vibrations of the brain-cells)।

বুদ্ধ-মতের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি জড়বাদের ঐ নাস্তিক্য-বিজ্‌ম্ভণার আদৌ অনুমোদন করেন না। যেহেতু, তিনি জড়বা নন, অধ্যাত্মবাদী—Materialist নন, Idealist। তাঁহার শিক্ষা এই— ছ-ধাতুরো অয়ং ভিক্‌খু! পুরিসো তি খো পণিতং বুত্তং—এই পুরুষ ধাতু গঠিত (I have said a man is six-elemented)।

কিঞ্চ এতং পটিচ্চ বুত্তং? পঠবী-ধাতু, আপো-ধাতু, তেজো-ধাতু বায়ো-ধা আকাস-ধাতু, বিঞ্ঞান-ধাতু—মজ্‌ঝিমনিকায় (ধাতুবিভঙ্গসুত্ত)

'কি কি ধাতু-গঠিত? পৃথিবীধাতু, অপ্‌ধাতু, তেজঃধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু, এবং বিজ্ঞান-ধাতু'। প্রত্যেক ধাতুর দ্বি-বিধ প্রকাশ—বাহ্য ও আন্তর, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ Universal and Individual—পঠবী-ধাতু সিয়া (স্যাৎ) অজ্ঝত্তিকা (আধ্যাত্মিক), সিয়া বাহিরা। এইরূপ প্রত্যেক ধাতু সম্বন্ধেই। 'বাহির' (external) যে ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম—ঐ পঞ্চভূতের ভগ্নাংশ (fragments) পিণ্ডীভূত (পটিচ্চ বুত্তং) হইয়া—appropriated ও individualised হইয়া আমাদের শরীর রচনা করে। বুদ্ধদেবের ভাষায় ঐ 'আধ্যাত্মিক' (individualised) পঞ্চভূতের সংঘাতজনিত দেহের নাম 'সক্কায়' (সৎকায়) বা নামরূপ। কিন্তু 'পুরুষ' ঐ সক্কায় মাত্র নহে—পুরুষ = সক্কায় + বিজ্ঞান ধাতুর 'আধ্যাত্মিক' খণ্ড (individualised fragment), অর্থাৎ সমষ্টি-বিজ্ঞানের ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ব্যষ্টি-বিজ্ঞান। অতএব মস্তিষ্ক সম্বিতের জনক হইতে পারে না—'Thought can not be a function of the brain'। ঐ বিজ্ঞানধাতু সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, বিঞ্ঞানং অনিদ্দসনং অনন্তং সর্ব্বতোপহং—It is invisible, boundless, all penetrating. (Digha-Nikya XI) অর্থাৎ 'অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ (গীতা)। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান—যাহা দেহের সহিত যুক্ত হইয়া 'পুরুষ' বা জীব রচনা করে—is the individualised aspect of the universal বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই জীবের Essence এবং ঐ Essence লোকোত্তর (ultra mundane)। (George Grimm's The Doctrine of the Buddha p. 134 দ্রষ্টব্য).

এ প্রসঙ্গে Charlotte Woods তাঁহার 'Self and its Problems গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

Individual consciousness is the adaptation to specific purposes by the body as an organ of action, of the flow of the Universal Consciousness.

অর্থাৎ দেহ যন্ত্র, যন্ত্রী নয়—যন্ত্রী ঐ 'আধ্যাত্মিক' লোকোত্তর বিজ্ঞান। ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া 'What is Buddhism' গ্রন্থের গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

The pure white radiance of the universally diffused eternal world-soul (অর্থাৎ সেই 'বাহির' বিজ্ঞান ধাতু, which is invisible, boundless, all-penetrating) is broken by the prism of the human body into the differentiated entities we call men (পুরুষ), page 61.

এ মত কি জড়বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত নহে ? যে বুদ্ধদেব শুধু Matter নয়, invisible, boundless, all-penetrating Spirit—শুধু পঞ্চভূত নয়, বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত ব্যাপক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রচার করিলেন—সে বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই জড়বাদী নাস্তিক নন, তিনি বিজ্ঞানবাদী আস্তিক।

এমন কি পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা তাঁহার মত বিকৃত করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক বারক্লির (Berkley) মতের পূর্ব্বরূপ নিপাট বিজ্ঞানবাদ (Pure Idealism) প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে মাধ্যমিক বৌদ্ধমত বলে। এ মতে ম্যাটার এবং তৎসঙ্গে বাহ্যজগৎ (external world) একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয়।

কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমা পুনঃ
—বিবেকবিলাস

'মাধ্যমিকেরা আত্মস্থ বিজ্ঞান (সম্বিৎ) ভিন্ন অন্য কোন সত্তা স্বীকার করে না।'

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ঐ মত নিরাস প্রসঙ্গে এইরূপে উহার বিবৃতি করিয়াছেন ঃ—

ন হি বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থঃ অস্তি * * স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যথাহি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদি প্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি ; জাগরিত-গোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হন্তি ইত্যবগম্যতে। * * কথং পুনরসতি ব্যাহার্থে প্রত্যয়-বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে বাসনা-বৈচিত্র্যাৎ ইত্যাহ। অনাদৌ হি সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চ অন্যোন্য নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিষিধ্যতে—২।২।২৮ সূত্রের ভাষ্য।

"বিজ্ঞান (idea)-ব্যতিরিক্ত বাহ্যার্থ (external world) কোন কিছু নাই। স্বপ্নানুভূতির ন্যায় ইহা বুঝিতে হইবে। স্বপ্ন, মায়া (illusion), মরীচিকা (mirage) প্রভৃতিতে যেমন বাহ্য বস্তু ব্যতিরেকেও জল, জন্তু, গন্ধর্ব্বপুরী প্রভৃতির প্রতীতি হয়, জাগরিত অবস্থাতেও সেইরূপ বাহ্য বস্তু না থাকা সত্ত্বেও স্তম্ভাদির প্রত্যয় হইয়া থাকে। আপত্তি হইতে পারে, বাহ্যবস্তুর অভাবে প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য কিরূপে সিদ্ধ হয়? উত্তর—বাসনা (সংস্কার)-বৈচিত্র্য হইতে। সংসার যখন অনাদি, তখন বিজ্ঞান হইতে বাসনা এবং ঐ বাসনা হইতে বিজ্ঞান—এই অন্যোন্যসাপেক্ষ কারণ-কার্য্য-ভাব সিদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। বীজাঙ্কুর ইহার দৃষ্টান্ত—বীজ হইতে বৃক্ষ—পুনরায় বৃক্ষ হইতে বীজ ইত্যাদি।"

বুদ্ধদেব এইরূপ 'আত্যন্তিক' (extremist) ছিলেন না। তাঁহার দর্শনে বিজ্ঞান-ধাতুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী-ধাতু প্রভৃতির অর্থাৎ বাহ্যার্থেরও যথাযথ স্থান আছে।

বুদ্ধদেবের বিপক্ষে এ আপত্তিও শুনা যায় যে, তাঁহার সম্মত যে বিজ্ঞান তাহা ক্ষণিক বিজ্ঞান—তিনি কোনরূপ শাশ্বত সত্তা মানিতেন না অর্থাৎ বুদ্ধদেব উচ্ছেদবাদী বৈনাশিক (Nihilist) ছিলেন—তাঁহার মতে, অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠন্তু জগদাহুরনীশ্বরম্ (গীতা)। এ আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন। বুদ্ধদেব নিজমুখে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্খবে! ভিক্খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণং তি। তং কিস্স হেতু? দিট্ঠে বাহং ভিক্খবে! ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি। এবং বাদিনং খো মং ভিক্খবে! এবং অভ্যাখ্যিং একে সমণব্রাহ্মণা—অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্ভাচিক্খন্তি (impeach)—'বেনসিকো সমণো গোতমো সতো সত্তন উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং (nullification) পঞ্ঞাপেতি তি।

যথা বাহং ভিক্খবে ন, যথা চাহং ন বদামি, তথা মং তে ভান্তো সমণব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্ভাচিক্খন্তি।—মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত।

'হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত—ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি বা অন্য দেবতা কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনিই (here and now) অননুবেদ্য (untraceable)। ভিক্ষুগণ! এইরূপ বলার জন্য, এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসত্যভাবে, তুচ্ছভাবে, মিথ্যাভাবে, অভূতভাবে (wrongly, erroneously, falsely, untruly) আমার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করেন যে 'এই শ্রমণ গৌতম বৈনাশিক, ইনি সৎ বস্তুর উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রচার করেন।' আমি যাহা নই, আমি যাহা বলি না—হে ভিক্ষুগণ! এই সকল ভান্ত (good) শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অসত্যভাবে তুচ্ছভাবে মিথ্যাভাবে অভূতভাবে আমাকে সেইরূপ অভিযোগ করেন।'

ইহার পরও কি বুদ্ধদেবকে বৈনাশিক (নাস্তিত্ববাদী) বলিব? কিন্তু এ সম্পর্কে কেবল বুদ্ধদেবের অস্বীকৃতির (Disclaimer-এর) উপর নির্ভর করা অনাবশ্যক। তিনি স্বমুখে শিষ্যগণকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, বুদ্ধদেব এক অজাত অভূত অকৃত অসংখত (unborn, uncreate, unbecome, unevolved) অর্থাৎ শাশ্বত নিত্য সত্তার বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করিতেন—সে সত্তার অস্তিত্বের উপর এই জাত, ভূত, কৃত, সংখত বিশ্বের অস্তিত্ব

(the springing-out of what is born, has become, is created and evolved) নির্ভর করিতেছে। ঐ সত্তা অজ্ঞেয় অবাচ্য অনির্দ্দেশ্য। ঐ সত্তা ক্ষিতি নয়, অপ্ নয়, তেজ নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয়, বিজ্ঞান নয়—কিঞ্চন নয়, অকিঞ্চন নয়, সৎ নয়, অসৎ নয়—ইহলোক নয়, পরলোক নয়—চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নয়। উহার গতি নাই, আগতি নাই, স্থিতি নাই, চ্যুতি নাই, উৎপত্তি নাই, বিলয় নাই। ঐ সত্তা অপ্রবৃত্ত, অনাধার, অনারম্ভ—উহাই দুঃখস্য অন্তঃ।

অথি ভিক্খবে! অজাতং অব্ভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্খবে অভবিস্সং অজাতং অব্ভূতং অকতং অসংখতং, ন ইদ্ জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্খবে! অথি অজাতং অব্ভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েতি তি।

অথি ভিক্খবে! তদ্ আয়তনং যতা ন য়েব পঠবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানং চায়তনং ন বিঞ্ঞানানং চায়তনং ন অকিঞ্চন্নায়তনং ন নেব সঞ্ঞা নাসন্নায়তনং, নায়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমা সুরিয়ো। তদ্ অহং ভিক্খবে! ন এব আগতিং বেদামি 'ন গতিং ন থিতিং ন চুতিং ন উপ্পত্তিং। অপ্পতিবৈং অপ্পবত্তং অনারম্ভনং এব তং। এস এব অন্তো দুক্খস্সেতি

—উদান, ৮।১, ৩০

* ইহার অনুবাদ এই :—

There is, O Bhikkus, that which is unborn, which has not become, which is uncreate and unevolved. Unless, O Bhikkus, there were that which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved—there could not be cognised here the springing-out of what is born, has become, is created and evolved. And surely because, O Bhikkhus ! there is that, which is unborn, has not become, is uncreate and unevolved—therefore is cognisable the out-springing of what is born, has bocome, is created and evolved. (Translation in Light from East p. 57).

There is yonder realm, where neither earth is, nor water, neither fire nor air, neither the boundless realm of space nor the boundless realm of consciousness, neither this world nor another, neither moon nor sun. This I call neither coming nor going nor standing, neither origination nor annihilation. Without support, without beginning, without foundation is this. The same is the end of suffering, (Translation in Grimm's The Doctrine of the Buddha, p. 518.)

ঐ অদ্ভুত আজব সত্তাকে বুদ্ধদেব 'শূন্য' বলিয়াছেন—সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্য গোচরো (ধম্মপদ)। সেই জন্য 'শূন্যবাদী' বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিক অপবাদ। কিন্তু তাঁহার প্রতিপাদ্য শূন্য কি ?

যথাস্থানে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করিব যে, বেদান্তের যাহা ব্রহ্ম, বুদ্ধদেবের পরিভাষায় তাঁহার নাম শূন্য—কারণ, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে যিনি পূর্ণ (plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং—নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (vacuum)—নেতি নেতি—অথাত আদেশো নেতি নেতি। সেই জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত 'সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ—

'যিনি শূন্যবাদীর শূন্য, তিনিই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।'

উপনিষদেও এই শূন্যভাব সাধনের উপদেশ আছে—

শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ—অমৃত, ১১। শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

অতএব শূন্যবাদী বলিয়া বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলা সঙ্গত নয়।

জড়বাদীরা প্রায়শঃ দৃষ্টবাদী (Positivists)—যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, তাঁহারা এমন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের নিকট ঐ Sense-perceptionই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর বুদ্ধির (Intellect-এর) সাহায্যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া অনুমান দ্বারা জ্ঞানসৌধ রচনা করিতে প্রয়াসী। অর্থাৎ তাঁহারা Rationalists—এ দেশে যাহাদের হেতুবাদী বলে। বুদ্ধির উপর যে বোধি আছে—Intellect-এর উপর যে Intuition আছে—বোধের উপর যে প্রতিবোধ আছে, এ কথা তাঁহারা জানেন না; এবং চর্ম্মচক্ষুর পশ্চাতে যে দৈবচক্ষুঃ আছে, আধিভৌতিক ইন্দ্রিয়ের পরে যে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় আছে, 'সন্নিকর্ষ'-জনিত জ্ঞানের উর্দ্ধে যে 'প্রাতিভ' জ্ঞান সম্ভবপর—এ কথা তাঁহারা মানেন না। বুদ্ধদেবের নিকট কিন্তু 'The unseen things are more'—দৃষ্টের অপেক্ষা অ-দৃষ্ট বৃহত্তর ছিল। তিনি চর্ম্মচক্ষুর পশ্চাতে দৈব চক্ষুঃ মানিতেন (যাহাকে তিনি the pure,

the superhuman celestial seeing বলিয়াছেন)। মজ্ঝিম নিকায়ের একস্থলে তিনি সারিপুত্রকে বলিতেছেন—

And, Sariputta, penetrating the heart and mind of a certain person I perceive: 'this person so acts, so conducts himself, follows such a course, he will come to the hell world', and after a time, with the pure, the superhuman celestial seeing, I behold that person descend upon that sorry journey towards loss, I see him in the hell world in utter anguish.—Majjhima Nikaya, I, p. 37.

শুধু তাই নহে—তাঁহার শিক্ষা এই যে, ঐ দিব্য চক্ষুঃ সাধন দ্বারা উন্মীলিত হইলে, আমরা জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিতে পারি—

By developing the 'pure, super-human, celestial eye' we may gain an immediate perception of our existences before our birth and of the vanishing and reappearing of the other creatures. (Grimm's Doctrine of the Buddha, p 99.)

With heart thus stedfast, thus clarified and purified, clean and cleansed of things impure, the Bikkhu can call to mind his divers existences in the past—a single birth, then two, then three * * * a hundred thousand births in their details and features. Just as a man who has passed from his own village to a second and then to a third and finally back to his own village, might think how in his absence from home, he had visited these other villages and how in each he had stood, sat, spoken, been silent—in just the same way does the Bikkhu call to mind his former existences * * * his divers existences of the past in all their details and features—মজ্ঝিম নিকায়, 39th discourse.

অবশ্য ঐ জ্ঞাননেত্রের ('eye of knowledge')-উন্মেষ বহু সাধন সাপেক্ষ—তজ্জন্য নিয়ম সংযম করিতে হয়, কামনা বাসনার সংকোচ করিতে হয়, অহংকার-মমকার বর্জ্জন করিতে হয়—এক কথায় বুদ্ধদেব যাহাকে 'সমথ' (complete tranquility of the mind) বলেন, সেই 'সমথ' অভ্যাস করিতে হয়।

According to the Buddha, by eliminating all and every motion of will, such a complete tranquility of the mind—Samatha—must be produced, that 'thoughts about me and mine' no more arise, and on the other hand the utmost energy in perception must be produced—if the 'eye of knowledge' is to open.—Grimm. p. 29

বুদ্ধদেব ঐরূপ 'সমথ' সাধন করিয়াছিলেন, ঐরূপ আত্মজয়ী হইয়াছিলেন—তাঁহার উন্মীলিত জ্ঞাননেত্রের নিকট কেবল পূর্ব্ব জন্ম ও পরলোক নয়, সমস্ত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগৎ ও ঐ ঐ জগতের 'অরূপ' প্রাণী, করকলিত কুবলয়বৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছিল। জাতিস্মর হইয়া তিনি যেমন জন্মান্তরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেন (বৌদ্ধেরা যাহাকে জাতক বলেন, ঐ সকল জাতক তাঁহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ মাত্র), সেইরূপ দৈবচক্ষুর দ্বারা, কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক—এমন কি আরও উর্দ্ধতন, সূক্ষ্মতম 'the highest worlds of light' * (যাহাকে উপনিষদে মহর্লোক, ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে)—সে সমস্ত লোকও 'দর্শন' করিতেন। কারণ, তিনি দ্রষ্টা (seer), ঋষি (ঋষ্-দর্শনে) ছিলেন—সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে—সত্য তাঁহার নিকট পরোক্ষ বিশ্রুতিমাত্র (hearsay) ছিল না—ইতি শুশ্রুমঃ ধীরাণাম্ নহে—কিন্তু অপরোক্ষ সংদৃষ্টি (Insight)-ভুক্ত ব্যাপার ছিল—বেদাহম্ এতম্—অগম্য জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্—He could react to the vision of Reality। তিনি যে প্রেত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কামদেব, রূপদেব, অরূপদেব, আভাস্বর দেব, মার, ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মা প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন, ঐ সকল তাঁহার প্রত্যক্ষলব্ধ দৃষ্টবিষয় ছিল—শ্রুত মাত্র নহে——'Things seen are mightier than things heard'.

ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি
—ধর্ম্মপদ, লোকবগ্‌গো
গচ্ছে দেবান সন্তিকে—কোধ বগ্‌গো
পীতিভক্‌খা ভবিস্‌সাম দেবা আভাস্বরা যথা—সুখবগ্‌গো

* To the heaven worlds I came now and again, to the form-worlds (রূপলোক), to the formless worlds (অরূপলোক), to the realm of neither perception nor non-perception.—Theragatha V, 258-9,

Up to the highest worlds of the gods, every existence becomes annihilated * * The 33 gods and the yama-gods, the satisfied gods, the gods who delight in fashioning, the gods who control pleasures fashioned by others, they all, bound by the fetters of desire, return into the power of Mara.—সংযুক্ত নিকায় I. p. 133.

যস্‌স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধব্ব-মানুসাঃ
—ব্রাহ্মণ বগ্‌গো
অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেঠ্‌ঠতং গতো
—ধম্মপদ, অপ্পমাদ বগ্‌গো
দেবা পি তং পসংসন্তি ব্রহ্মুণাপি পসংসিতো
—কোধ বগ্‌গো
নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহ ব্রহ্মুণা
—সহস্‌স বগ্‌গো

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্‌খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-পজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি
—মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত

তেবিজ্জ সূত্তে দেখিতে পাই বুদ্ধদেব বেদবিদ্যাভিমানী বাসিষ্ঠকে বলিতেছেন :—

"হে বাসিষ্ঠ! আমি তথাগত; আমাকে কেহ যদি ব্রহ্মলোকের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি ঐ লোকের কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি—কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়, তাহাও বলিতে পারি। আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোকও জানি"

যাঁহার এই দৃষ্টি, এই অনুভূতি, তিনি Positivist (দৃষ্টবাদী) হইবেন কিরূপে? আর যিনি 'বোধি-সত্ত্ব' 'সংবুদ্ধ'—বোধি-সম্বোধির (Intuitionএর) উচ্চ ভূমিকায় অধিরূঢ়—আর্য্য-সত্য সমুদয় (যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে, বোধিলভ্য)* যাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতির আয়ত্ত—তিনি বুদ্ধিমাত্র-সার হেতুবাদী (Rationalist) বা হইবেন কিরূপে?

অপরোক্ষ অনুভূতি ও পরোক্ষ বিশ্রুতির ভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে এই আখ্যায়িকাটি বলিতেন :—দুই বন্ধু ভ্রমণে বহির্গত হইয়া একবার এক প্রান্তরে উপনীত হইল—সম্মুখে দেখিল এক গিরিচূড়া। একবন্ধু চূড়ায় উঠিয়া দেখিল ওপারে এক মনোরম উদ্যান, এক সুরম্য কানন,

* Ultimate Realities from which the Intellect with its feeble rushlight recoils baffled—অচিন্ত্যাঃখলু যে ভাবা ন তান্ তর্কেন যোজয়েৎ—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—but are accessible to the potent illumination of the Intuition.

এক স্বচ্ছ সরোবর। অপরকে এ সংবাদ দিলে, সে অবিশ্বাস করিয়া বলিল—'অসম্ভব! এ কখনও হয়'। সেই দ্রষ্টা বন্ধু তখন শ্রোতা বন্ধুকে চূড়ার উপর লইয়া গেল এবং সেই মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া বলিল 'বন্ধু! কি দেখিলে?' সে বলিল—'ওপারে এক মনোরম উদ্যান, এক সুরম্য কানন, এক স্বচ্ছ সরোবর।' তখন প্রথম বন্ধু বলিল—'কেন বন্ধু? এই যে বলিলে 'অসম্ভব! এ কখনও হয়? এখন সুর বদল কর কেন?' সে বলিল—'বন্ধু! তখন ত' দেখি নাই—শুনিয়াছিলাম মাত্র'—So long, dearest one, I couldnot see what was to be seen.†

এইরূপে 'দৃষ্ট' ধর্ম্ম বলিয়া বুদ্ধদেব নিজের ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম অনিতিহ' বলিতেন—অর্থাৎ the cognised in itself, the doctrine of actuality, to be seen with one's own eyes (Grimm)—স্বপ্রকাশ, স্বতঃপ্রামাণ্য, স্বানুভব-বেদ্য—free from hearsay and theorising, because he has seen (Grimm, p 19)—অতএব 'Inevitable like the paw of the lion'—সিংহের থাবার ন্যায়

† It is as if near a village or a town there were a high rock, and two friends were approaching it. Having reached it, one of them remains standing at the base of the rock. And the friend below, at the foot of the rock, cries up to the friend who has climbed up to the top of the rock: 'What now friend! are you seeing from the rock?' But that other replies: 'I see, dearest one, from the rock a serene garden, a magnificent forest, a landscape all in bloom, a bright pool of water.' But the other says: 'This is impossible, dearest one, this cannot be, that from the top of that rock you can see a serene garden, a magnificent wood, a landscape all in bloom, a bright pool of water.' Then the friend comes down from the summit, and takes his friend by the arm and leads him up the rock, and having given him a little time to rest, asks him: 'What now, friend, are you seeing from the top of the rock?' And the other one says: 'Now, friend, I see from the rock a serene garden, a magnificent wood, a landscape all in bloom, a bright pool of water.' But the other one says: 'Just now, dearest one, we heard you speaking thus: "It is impossible, it can not be, that from the top of that rock you can see a serene garden, a magnificent wood, a landscape all in bloom, a bright pool of water." And now again, we have heard you speaking thus: "I see there from the top of the rock a serene garden, a magnificent forest, a landscape all in bloom, a bright pool of water." And thereupon the first one replies: 'So long, dearest one, as this high rock was obstructing me, of course I could not see what was to be seen.

অমোঘ। কারণ সে ধর্ম্ম—তর্কযুক্তি যাহার সম্বল, সেই ভ্রমপ্রমাদ-সঙ্কুল বুদ্ধি-লব্ধ ছিল না কিন্তু গভীর চিত্ত-একাগ্রতা-জনিত লোকোত্তর-সমাধি-প্রসূত 'holy Wisdom, able Wisdom, powerful Wisdom' (Majjhima Nikaya III p. 72)-রূপ সম্বোধি-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ ছিল। তাঁহার সমাধি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তিনি নিজ মুখে একবার মল্লপতি পুক্কুসের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। *

এক সময় বুদ্ধদেব আতুমা গ্রামের এক থামারে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তুফান উঠিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎ চমক ঝলসিয়া উঠিল। বজ্রাঘাতে দুইজন কৃষাণ তাহাদের বলিবর্দ্দের সহিত আহত হইয়া ভূপতিত হইল। সুতরাং গ্রাম হইতে বহু জনতা সমাগত হইয়া থামারের সম্মুখে সমবেত হইল। বুদ্ধদেব থামার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; এবং জনতার মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করিলেন—ভাই এখানে এত জনতা কেন? সে বলিল,—"ভাব! প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাতে দুইজন কৃষাণ ও তাহাদের চারিটি বলদ হত হইয়াছে। তাই জনতা। আপনি কি ইহা লক্ষ্য করেন নাই? কোথায় ছিলেন?" বুদ্ধদেব বলিলেন এখানেই ছিলাম। "তবে আপনি নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। শব্দও নিশ্চয় শুনিয়াছেন।" "কিছু না।" "তবে কি আপনি নিদ্রিত ছিলেন।" "না না, জাগরিত ছিলাম।" "তথাপি এই বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত ও বিদ্যুৎ-সম্পাত কিছুই দেখেন নাই

* Now at one time, I was staying near Atuma, in a barn. Just then in a thunderstorm, in a whirling hurricane, when the lightnings were flashing forth and the thunderbolts were crashing, not far from the barn, two peasants, brothers, were struck by the lightnings, and four draughtoxen. Then, Pukkusa, a great crowd of people came from Atuma, and stood round the two peasants, brothers, aud four oxen killed by the lightning. Now, Pukkusa, I had came out of the barn and was pacing up and down in front of the threshing-floor under the open sky. And a man out of this crowd of people came towards me, bowed and stood aside. And to the man who stood there, Pukkusa, I spoke thus: 'Why, brother, has the great crowd gathered there?'—'Just now, Sir, in the hurricane, amidst the rain pouring down with flashes of lightning and crashes of thunder, two peasants have been killed brothers, and four draughtoxen. Therefore this great crowd has assembled. But you, sir, where have you been?'—'Just here, brother, I have been.'—Then surely, sir, you have seen it?'—'Nothing, brother, have I seen.'—'But, sir, you have surely heard the noise?'—'Nothing, brother, have I heard of the noise.'—'Then, sir, were you sleeping?'—'No, brother, I was not asleep.'—'How now, sir, were you conscious?'—'Certainly, brother.'—'Then, sir, conscious and with senses awake, in the hurricane amidst the rain pouring out with flashes of lightning and crashes of thunder, you neither saw, nor yet heard the noise?'—'Certainly, brother'.

শোনেন নাই?" "না।" "কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত!" বুঝিয়া দেখিলে কিছুই অদ্ভুত নয়—কারণ, বুদ্ধদেব তখন থামারের মধ্যে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। ব্যুত্থিত হইবার পর জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের নামে আর এক অভিযোগ এই যে তিনি অহংপর (Egoist) ছিলেন। তিনি বলিতেন "আত্মাই আত্মার নাথ। আত্মাই আত্মার বন্ধু"।

অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো সিয়া

অর্থাৎ

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥—গীতা

ইহার দ্বারা কি Egoism বুঝায়? সত্য বটে তিনি মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তে আনন্দকে বলিয়াছিলেন—

তস্মাৎ ইহ আনন্দ! অত্তদীপা বিহরথ, অত্ত সরণা, অনঞ্ঞসরণা—ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা। * * আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্যে লোকে অভিজ্ঝা-দোমনস্সং—২।২৬

Therefore Oh Ananda! Be ye lamps unto yourselves. Be ye a refuge to yourselves. Betake yourselves to no external refuge. Hold fast as a refuge to the truth. Look not for refuge to any one besides yourselves. Work out your own salvation with diligence."

ইহার সহিত তিব্বতীয় মহাযান-গ্রন্থ Voice of the Silence-এর নিম্নোক্তি তুলনীয়—Prepare thyself, for thou will have to travel on alone. The teacher can but point the way.

ইহার দ্বারা কি অহংপরতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা বুঝায়? বুদ্ধদেব যে মহানিষ্ক্রামণ করিয়াছিলেন সেই অতুল্য ত্যাগের অর্থ কি?

This will I do, who have a realm to lose,
Because I love my realm, because my heart
Beats with each throb of all the hearts that ache,
Known and unknown—these that are mine and those
Which shall be mine—a thousand million more
Save by this sacrifice I offer now.
—Light of Asia.

বুদ্ধদেব তাঁহার অনুচর শ্রমণগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

Therefore stand ye together—assist one another and strengthen one another's efforts. Be like unto brothers; one in love, one in holiness, one in your zeal for the truth.

অর্থাৎ সেই ঋগ্বেদের প্রাচীন কথা 'সমানা বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।' এই কি অহংপরের কথা ? মহাবগ্গে (বিনয়পিটক) দেখিতে পাই, তিনি ভিক্ষুকদিগকে উপদেশ দিতেছেন—

চরথ ভিক্খবে চারিকং, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায়, অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং, আদিকল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিয়োসান কল্যাণং, সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।

Go ye Oh Bhikkhus and wander forth for the gain of the many, for the welfare of the many, in compassion for the world, for the good, for the gain, for the welfare of Gods and men. Proclaim Oh Bhikkhus, the doctrine glorious. Preach ye a life of holiness, perfect and pure.

যাঁহার জগতের প্রতি এতই অনুকম্পা, যিনি বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য এতই উৎসুক—তিনি যদি আত্মপর স্বার্থপর, তবে পরার্থপর কে ?

'নাস্তিকা বেদনিন্দকাঃ।' যিনি বেদের নিন্দা করেন তিনি নাস্তিক। কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতম্।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্॥

জীবঘাতি-যজ্ঞবিধায়ক বেদের বুদ্ধদেব যদি নিন্দাই করিয়া থাকেন, তবেই কি তিনি নাস্তিক ? উপনিষদ্ও ত' যজ্ঞকে সংসারার্ণব-তারণে ভঙ্গুর ভেলা মাত্র বলিয়াছেন—প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা (মুণ্ডক, ২।৭) এবং যে মূঢ় ঐ ভেলায় আরোহণ করে, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহার যে অশেষ দুর্দ্দশা হয় তাহাও উপদেশ করিয়াছেন।

জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥—মুণ্ডক, ২।৮

গীতাতেও ত' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকাণ্ড বেদকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন—গীতা, ২।৪৫

এবং যাহারা বেদের পুষ্পিত বাক্যদ্বারা 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন' হয়, তাহাদিগকে অবিপশ্চিৎ (মোহান্ধ) বলিয়াছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ—২।৪২

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইলে কূপ তড়াগে যে প্রয়োজন যিনি 'বিজানন্', 'বিদুর' (illuminated), সমস্ত বেদে তাঁহারও সেই মাত্র প্রয়োজন।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥—গীতা ২।৪৬

উপনিষদ্ও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—

তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ হৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতদ্ জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ৫

'গ্রন্থবিস্তর' অর্থাৎ mere verbiage। বুদ্ধদেবও অঙ্গুত্তর-নিকায়ে ভদ্দীয়কে বলিয়াছিলেন—

এথ তুম্হে ভদ্দীয়! মা অনুস্সবেন, মা পরম্পরায়, মা ইতিকিরায়, মা পিটকসম্পদানেন, মা তক্কহেতু, মা নয়হেতু, মা আকারপরিবিতক্কেন, মা দিট্ঠি-নিজ্ঝানক্খন্তিযা মা ভব্যরূপতায় মা সমণো নো গরূতি।

যদা তুম্হে ভদ্দীয়! অত্তনা ব জানেয্যাথ ইমে ধম্মা অকুসলা ইমে ধম্মা সাবজ্জা ইমে ধম্মা বিঞ্ঞুগরহিতা ইমে ধম্মা সমত্তা সমাদিন্না অহিতায় দুক্খায় সম্বত্তন্তীতি অথ তুম্হে ভদ্দীয়! প্রজহেয্যাথ।—অঙ্গুত্তর নিকায়, ১৯৩।২

ইহার ইংরাজি অনুবাদ এই—

Do not believe Oh Bhaddiya in hearsay, nor in traditions, nor in rumours, nor in the word handed down, nor in purely logical conclusions, nor in external semblance, nor because of agreement of anything with the views you cherish and approve of, nor because of your own thinking of anything that it is true. Neither shall you think: 'The ascetic, the Buddha himself, is my teacher'; but if you, Bhaddiya, yourself gain the insight: Such things are evil, such things lead to misfortune and suffering: Then you may reject them.

ঐ সারকথা—'gain the insight'। তাঁহার লক্ষ্য অপরোক্ষ অনুভূতি—গতানুগতিকতা নহে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া নহে।

The sole criterion of truth for him is one's own immediate, intuitive apprehension of truth, and he even admonishes his disciples to accept nothing even from himself, simply in good faith but to accept only as fact what they themselves have beheld.

সেইজন্য দেখিতে পাই তিনি মজ্ঝিমনিকায়ে ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন—

"* * * Then monks, what you say, is only what you yourselves have recognised, what you yourselves have comprehended, what you yourselves have understood. Is it not so?" "It is even so, lord." "Well said, monks."—Majjhima Nikaya I, P. 265.

এযুগে মহামনস্বী গেটের মুখেও আমরা এইরূপ কথাই শুনিয়াছি। গেটেকে যদি কেহ কোন কিছুকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেন, গেটে বলিতেন, 'It may be true but is it true *for me*'—'হয়ত সত্য কিন্তু ইহা কি আমার পক্ষে সত্য ?' অর্থাৎ কোন কিছু যতক্ষণ না আমরা স্বানুভবের দ্বারা অপরোক্ষ ভাবে অনুভূতি করি, যতক্ষণ না realise করি—ততক্ষণ তাহা আমাদের পক্ষে real হয় না। এইজন্য বুদ্ধদেব বলিতেন—শ্রদ্ধা ভাল কিন্তু শ্রদ্ধাকে দৃষ্টির দ্বারা সুদৃঢ় করিতে হইবে।

Faith is useful but it must be grounded in *sight*. Because one has to *realise* the supreme truth in his own person.—Majjhima Nikaya 1, P 319 & P 134.

সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, বুদ্ধদেব আত্মপ্রত্যয়ের উপর অতটা নির্ভরশীল হইলেও নিজেকে 'তথাগত' বলিয়াছেন। তথাগত অর্থে Transmitter—যিনি সম্প্রদায়-সিদ্ধ সত্য-পরম্পরার প্রচার করেন। কিসের Transmitter ? Transmitter of the Ancient Wisdom—সেই পুরাণী প্রজ্ঞার প্রচারক্। এই মর্ম্মে চৈনিক ধর্ম্মগুরু কনফুচি (Confucius) বলিতেন—I only hand on: I cannot create new things. I believe in the Ancients and therefore love them.

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা। বুদ্ধদেব বলিতেন যে, আমার উপদিষ্ট ধর্ম is that doctrine that is peculiar to the Awakened Ones! অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ ও মন্বন্তরের বুদ্ধগণ যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, আমিও সেই তত্ত্ব প্রচার করি। কারণ, বুদ্ধদেব নিজেকে চতুর্থ বুদ্ধ বলিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন বুদ্ধের নামোল্লেখ করিয়াছেন। 'অনাগতবংশে' (এ গ্রন্থ প্রায় ২১০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত) বুদ্ধদেবের এই উক্তি রক্ষিত

হইয়াছে—"হে সারিপুত্র! আমার পূর্ব্বে তিনজন বুদ্ধ হইয়াছেন—কাকুসন্ধ, কোনাগামনো এবং কাশ্যপ। আমি চতুর্থ বুদ্ধ। সম্যক্-সম্বুদ্ধ মৈত্রেয়দেব পঞ্চম বুদ্ধ হইবেন।"*

ধর্ম্মপদেও দেখিতে পাই তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেছেন 'ঋষিগণ-প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিবে'।

আরাধয়ে মগ্‌গমিসিপ্পবেদিতং—মগ্‌গবগ্‌গো

—এবং একাধিকবার 'বহুশ্রুতের' প্রশংসা করিয়াছেন এবং অল্পশ্রুতের নিন্দা করিয়াছেন।

তস্‌সাহি, ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ বহুস্‌সুতঞ্চ
ধোরয্হসীলং বতবন্তং অরিয়ং ॥—সুখবগ্‌গো
(ধৈর্য্যশীলং ব্রতবন্তং আর্য্যং)
অপ্পস্‌সুতায়ং পুরিসো বলিবদ্দোব জীরতি—জরাবগ্গো

এমন কি যিনি 'ব্রাহ্মণ সম্বোধিসিদ্ধ প্রজ্ঞাসিক্ত স্নাতক' তাঁহার বিশেষণ দিয়াছেন মহর্ষি—

উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং।
অনেজং নহাতকং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥ —ব্রাহ্মণ বগ্‌গো

অতএব বেদনিন্দার অপবাদ দিয়া বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলা খুবই অসঙ্গত।

কিন্তু সেই ভবভূতির আক্ষেপ—সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ—অপবাদের অন্ত নাই! বুদ্ধদেবের নামে চরম অপবাদ তিনি অনাত্মবাদী, তিনি নিরীশ্বরবাদী এবং 'নির্ব্বাণ' প্রচার দ্বারা তিনি নাস্তিত্ববাদী। বারান্তরে আমরা এই সকল অভিযোগের বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

* Thus the Blessed Lord replied: I will tell thee Sariputta! There have been leaders three, Kakusandho, Konagamano and Kassopo, the Guide. I am the fourth Buddha supreme. Matteyya yet shall be in this auspicious period while yet the end we bide, Matteyya, all enlightened One. supreme on earth is He. —Anagata Vansa published in the Journal of the Pali Text Society, 1886.

দীর্ঘনিকায়ের মহাপদান সুত্তান্তে (১।৪) বুদ্ধদেব পূর্ব্ববর্ত্তীকল্পে বিপস্সী, সিখী ও বেস্সভ নামক তিনজন সম্যক্ সম্বুদ্ধের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমানকল্পীয় চারিজন বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, কাকুসন্ধ, কোনাগমন, কস্সপ ও গৌতম বুদ্ধ।

ভগবতা এতদ্ অবোচঃ—ইতো সো ভিক্‌খবে! একনবুতো কপ্পো যং বিপস্সী ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইতো সো ভিক্‌খবে! একতিংসো কপ্পো যং সিখী ভগবা অরহং সম্মা সম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। তস্মিংযেব খো ভিক্‌খবে! একতিংসে কপ্পে বেস্সভূ ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইমস্মিংয়েব খো ভিক্‌খবে! ভদ্দকপ্পে, কাকুসন্ধো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইমস্মিং খো ভিক্‌খবে ভদ্দকপ্পে কস্সপো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উদপাদি। ইমস্মিং খো ভিক্‌খবে ভদ্দকপ্পে অহং এতরহি অরহং সম্মা সম্বুদ্ধো লোকে উপ্পন্নো।

অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা

সমবেত সাহিত্য-সেবীদের আমি অভিবাদন করি। ফরিদপুর সাহিত্য পরিষদের সক্রিয় দীর্ঘজীবন কামনা করি। অভ্যর্থনা-সমিতি এবং অন্যান্য কর্ম্মিবৃন্দের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয় যে আপনারা ইচ্ছা করেই কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে সভাপতিত্বে বরণ করেন নি। আপনাদের ইচ্ছা বিচার করা আমার কর্ত্তব্য নয়। তবে যে উদ্দেশ্যে ও মনোভাবে আপনারা আমাকে মনোনীত করেছেন সেটা বোধ হয় আমার অপরিচিত নয়। সাহিত্য-স্থষ্টি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়ে সাহিত্য আলোচনা ও উপভোগ সাধারণের করায়ত্ত। অন্তত, হওয়া উচিত, নচেৎ বিশ্ববিছালয়ের শিক্ষা নিরর্থক ও অ-সামাজিক অপব্যয়। শিক্ষিত সমাজের কাছে জনসাধারণ বুদ্ধি ও তার প্রয়োগ প্রত্যাশা করে। প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং বিকৃত মস্তিষ্কের কথা বাদ দিলে সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য কেবল শিক্ষার স্থবিধার তারতম্যেই ঘটে। প্রাণশক্তির মাত্রাও সর্ব্বক্ষেত্রে সমান হয় না দেখতে পাই, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মধ্য দিয়েই প্রাণ-শক্তি প্রবাহিত। অতএব যে সব অন্তত সামাজিক বাধার দরুণ শিক্ষার স্থবিধায় অসমতা, এবং প্রাণশক্তির বিভাগ ও প্রকাশে বৈষম্য ঘটে সেই সব বাধা অতিক্রমে সকলকে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। এই আমার বিশ্বাস, আপনাদের মনোভাবও বোধ হয় খানিকটা ঐ ধরণের। বুদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের বুদ্ধি ও প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ, মার্জ্জিত, বর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত করা যায়। কতটা করা সম্ভব পরে দেখা যাবে, কেননা শুনেছি অ-সম বণ্টনই নাকি প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য ও লীলা। তাই যদি হয় তা হলে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাই দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে, বর্ত্তমানের সমাজ-ঘটিত বৈষম্যের সঙ্গে সেই গূঢ় ও প্রাকৃতিক বৈষম্যের কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাচ্ছি না। আপাতত আমাদের কাজের কাজ হল এই—আমাদের মানসিক দুর্ভিক্ষের সামাজিক কারণগুলি জানা এবং জেনে সরিয়ে দেওয়া। এ কাজ একার নয়,

সকলের। আমি এই সমবেত চেষ্টায় যোগ দেবো। আমাদের সকলের স্থির বিশ্বাস যে শিক্ষালব্ধ মার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে উপভোগের বর্ত্তমান মাত্রার অর্থাৎ সমালোচনার বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

অধিকতর লোকের বুদ্ধির চাষ ও প্রাণের বহতা বাড়লে সাহিত্যের মঙ্গল। তাগিদ ও চাহিদা বেশী হলে যোগান আপনা হতে বাড়ে। আমাদের সমাজে প্রকৃত সাহিত্যের চাহিদা কম, অন্য দেশের তুলনায় নেই বল্লেই হয়। কিন্তু কারণগুলি মোটামুটি একই ধরণের, কম বেশী কেবল ভাগ্যবিপর্য্যয়। কারণগুলি আমি যতদূর বুঝেছি আপনাদের বলছি। সব সমাজেই শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে, প্রধানত অর্থের জন্য একদল প্রতিপত্তি লাভ করেছেন এবং আনন্দ পাবার স্থবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের প্রতিপত্তি ও স্থবিধা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিযুক্ত হচ্ছে অন্য শ্রেণীকে—যাঁদের আনন্দ ও শিক্ষা পাবার স্থবিধা নেই—তাঁদেরকে, এই বন্দোবস্তেই সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষাদানে, অর্থাৎ কুশিক্ষা ও অশিক্ষায়। আমার অভিজ্ঞতা এই যে সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিপক্ষে কূটতম আপত্তি ওঠে সবচেয়ে বেশী এই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর কাছ থেকেই। সোজাস্থজি বাধাবিপত্তি তোলার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁদের মনোবাঞ্ছা আমরা মুখরিত করি পণ্ডিতী ভাষায়, প্রকৃতিদেবীর গূঢ় অভিসন্ধি—মানুষের মধ্যে শক্তির অ-সম বিভাগ, এই তথ্যটি উদ্‌ঘাটিত করে। আমাদের যুক্তির অভাব নেই। দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এখন মজা হল এই যে এক হিসাবে স্থবিধা হতে বঞ্চিতের সংখ্যা মধ্যসন্তোপভোগী প্রতিপত্তিশালীর সংখ্যার অপেক্ষা বাংলা দেশে পঁচিশগুণ বেশী। আমার বক্তব্য হল এই যে, সংখ্যার তারতম্যে সাহিত্যের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। সংখ্যা বস্তুটি কেবল গণনকার্য্যের যন্ত্র নয়, সংখ্যার অনুপাত পরিবর্ত্তন-গুণ-বাচক। পরিমাণ যে গুণে পরিণত হয় তার প্রমাণ রসায়ন-বিছার প্রতি পাতায় আছে। তাই বলি, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রাণশক্তির প্রসার সৎসাহিত্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই সোজা কথাটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের চেয়ে সাধারণ পাঠকই বেশী বোঝে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের স্রষ্ট সাহিত্যিক হয়ত মনে ভাবেন যে সাধারণ লোকে কখনই ভাল জিনিষ উপভোগ করতে

পারবে না। তাঁরা যে 'সাধারণ রুচি' কল্পনা করে থাকেন সে রুচি তাঁদেরই সমশ্রেণী ও সমধর্ম্মী খবরের কাগজওয়ালা, তাঁদেরই আশ্রিত পণ্ডিতবর্গের রচিত সাধারণের রুচি। এই সাধারণের অস্তিত্ব নেই। আমি যে সাধারণ জনসমাজের উল্লেখ করছি তারও অস্তিত্ব নেই, তাকে সাহায্য করতে হবে রচিত হতে। প্রথমটি হল অলীক, এবং অলীক বলেই একটি শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপায়, দ্বিতীয়টি মাত্র অপ্রসূত সম্ভাবনা, এবং সম্ভাবনা বলেই আপনাদের ও আমার অতি যত্নের সামগ্রী, আদরের বস্তু। মিথ্যাকে সত্যে অন্তত সম্ভাব্য সত্যে পরিণত করতে হবে। যে শক্তির সাহায্যে এই পরিবর্ত্তন সম্ভব সেই শক্তি একার নয়. সমাজের, যদিও সমাজের মধ্যে সেটি এখনও গুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তিকে আমরা জানতে চাই। তারই পরিণতির প্রতীক্ষায় আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। সাহিত্য-বিচার ও উপভোগ অ-সামাজিক প্রক্রিয়া নয়, সামাজিক ব্যবহারের প্রতিবেশেই সাহিত্য বুঝতে হয়, এই আমার ধারণা।

পূর্ব্বোক্ত সামাজিক শক্তির পরিণতি কখন ও কি ভাবে হবে তার সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না। তবে আমাদের বড়ই সজাগ থাকতে হবে নিশ্চয়। আর একটি কথা জোর করেই বলা চলে ঃ যে শক্তির প্রকাশে অন্য দেশের সমাজের পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙ্গে যাচ্ছে, এবং ভেঙ্গে যাবার জন্যই সেই সব দেশের সাহিত্যের রূপ পরিবর্ত্তন ঘটছে, সে শক্তির আধার তরুণ সম্প্রদায়। চিরকালেই সমাজে তরুণ ছিল—কিন্তু তরুণের আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনের অর্থ কোন মধ্যস্থিত ব্যাস থেকে সরে যাওয়া। মধ্যস্থিত ব্যাস হল সামাজিক শৃঙ্খলা—উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থের শৃঙ্খলা আর সামাজিক সত্তার মধ্যে যে প্রভেদ থাকতে পারে তরুণরা পূর্ব্বে বোঝেননি, তাই তাঁদের আন্দোলন আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বলেই পরিগণিত হয়ে এসেছে। আজ তাঁরা বুঝেছেন যে শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের প্রকৃত শৃঙ্খলাও নয়, মেরুদণ্ডও নয়। শৃঙ্খলাটি কি, ব্যাসটি কোথায়, তাঁরা বোঝেন না, আন্দাজী তার একটা নাম দিয়েছেন সমাজ-সত্তা। হয়ত নামকরণও সবদেশে এখনও হয় নি। আজ যে সমগ্র বিশ্বে তরুণ আন্দোলন চলছে তার মূল কথা এই সমাজসত্তাকে অনুসন্ধান করা, আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা। তাঁদের কর্ম্মে

ও বক্তব্যে হয়ত মূলতথ্যটি ঠিক পরিস্ফুট হয় নি, একে তাঁরা তরুণ, তায় দেশের অবস্থা ভিন্ন। কিন্তু এ কথা ঠিক যে যুদ্ধের পর যুবক-যুবতীরা নানা বিষয়ে নানা মতামত প্রকাশ করছেন। শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁদের কমছে। তাঁরা বলছেন যে তাঁদের দেশের বৃদ্ধেরা এত দিন ধরে বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে দেশকে, অর্থাৎ দেশের অন্য শ্রেণীকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের সম্পত্তি ও ক্ষমতাবৃদ্ধি করে এসেছেন ; আজ তাই যুবকদের কাছে আদর্শবাদ বড়ই কটু ঠেকছে। আজ তাঁরা নিজেরাই নতুন আদর্শ গড়ে তুলতে ব্যগ্র, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁদের সমগ্র, ও প্রকৃত সামাজিক সত্তার ওপর। সে আদর্শ শ্রেণীগত স্বার্থের শৃঙ্খলার দ্বারা গ্রথিত নয়। যন্ত্রপ্রধান সভ্যতায় সামাজিক সত্তার বর্ত্তমান রূপ হল শ্রেণী-বিভাগ। দুঃখ এই যে, সমাজ-সত্তার প্রকৃত রূপের পরিচয় পেতে হলে এই শ্রেণী-বিভাগের বিপক্ষে বিরোধ বেধে যায়। একেই শ্রেণী-বিভাগের সম্বন্ধ বিরোধের, তার উপর সেই বিভাগের আবরণ ভেদ করতেও বিরোধ, তাই আজ বিরোধই সর্ব্বত্র প্রকট হয়েছে। তরুণরা এই বিরোধের শক্তিকে স্বীকার করে তাকেই কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়েছে। একটি প্রধান সামাজিক কাজ সাহিত্য-সৃষ্টি, সাহিত্যে সেই জন্য এত ঝাঁজ, এত উগ্রতা। তরুণের অনুচ্চারিত বক্তব্য হল এই—সমাজসত্তাকে স্বীকার কর, নচেৎ কোন কাজই করা যাবে না। আমি তরুণ না হলেও একই কথা বলি, আমাদের দেশের অবস্থায় ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে কিছু পার্থক্য থাকলেও অন্তরের বিরোধে আমরা বোধ হয় এক। আমাদের তরুণ সাহিত্য যদি বাস্তবিকই নবযুগের সাহিত্য হতে চায়, সত্যকারের রিয়ালিষ্টিক্ হতে চায়, তা হলে তরুণ সাহিত্যিককে আমাদের প্রকৃত সমাজ-সত্তা কি বুঝতে হবে, তার রূপ পরিবর্ত্তনের শক্তিকে স্বীকার, গ্রহণ ও নিয়োগ করতে শিখতে হবে। নচেৎ তরুণ সাহিত্য তরুণ ত হবেই না, সাহিত্যও হবে না, কর্ত্তাদের-ভাব-বিলাসের উপকরণ ও অযোগ্য অনুকরণ হবে।

আমাদের সমাজের সত্তা কি বোঝাতে পারব না। জোর করে বলতেও পারি না আমাদের সমাজে অন্য দেশের মত শ্রেণী তৈরী হচ্ছে কিনা। এইবারকার আদমসুমারিতে লেখা আছে, নতুন গণনা-পদ্ধতির

জন্য তুলনায় ভুলচুক বাদ দিয়েও চাষী-অধিকারী এবং প্রজা-চাষীর সংখ্যা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৩৫ কমেছে; আর কেবল চাষী-মজুরের সংখ্যা বেড়েছে শত করা ৫০ জন, ৩৯০৫৬২ থেকে ৬৩৩৪৩৪ পর্য্যন্ত। বাংলা দেশে সবসুদ্ধ শতকরা একশ জন জমিদার ও অনুচরবর্গের তুলনায় ১২৯৭ চাষী মজুর আছে, যদিও গড়পড়তা গোমস্তার দল কিছু হ্রাস পেয়েছে। ফরিদপুরে চাষী মজুরদের সংখ্যা কিছু কম, শতকরা ৯৬৬ জন। ব্যবসাবৃত্তিধারীর সংখ্যা কিছু কমলেও মধ্যবিত্ত চাকুরে ও উকিল ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সব চেয়ে বেড়েছে জমিসত্বোপভোগী ভিন্ন নিজের ব্যক্তিগত আয়ভোগীর এবং চাকরবাকরের দল, প্রথমটি ১৩৬৪৬ থেকে ২৫২৬১ এবং দ্বিতীয়টি ৪৫৫২৪৬ থেকে ৮০৯৭১৫। আদমসুমারির সংজ্ঞা ও হিসেবেই যাঁরা জমি থেকে ধন উৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত নন্ তাঁদের তুলনায় নিতান্ত ভূমিনির্ভরশীলের সংখ্যা গড়পড়তায় ষোল গুণ বেশী। সমগ্র বৃত্তি ধরলে লোকসংখ্যার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ সামাজিক ধন বৃদ্ধি করছেন। এই অনুপাত ১৯০১ সাল থেকে ক্রমেই বেড়ে আসছে। আমি কল-কারখানার শ্রমজীবীর কথা তুলছি না, এখানে এবং এই দেশে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ বাংলা সমাজের, সে সমাজের মেরুদণ্ড জমিসত্ব। জমির অধিকার পরিবর্ত্তনেই সমাজের সত্যকার শ্রেণী তৈরী হতে পারে। চাকুরে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও যে শ্রেণী তৈরী হতে পারে না তা বলছি না। কিন্তু চাষবৃত্তিধারীর সংখ্যা এঁদের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী। অতএব সন্দেহ হয় যে গোপনে শ্রেণী তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে। তবে বিরোধ এখনও প্রকট হয়নি নিশ্চয়। হওয়া ভাল কি মন্দ জানি না, তবে মনে হয় বিরোধও বাদ যাবে না। তবে তার ভীষণতা চেষ্টা করলে কমান যায়, বিশেষত কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে অধিকার চাওয়ার অপেক্ষা দাবীপূরণই সামাজিক অবস্থান নিরূপিত ক'রে মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অন্য দেশের ইতিহাসের সব ধাপই পরপর অতিক্রম করতে হবে তাও নয়। এমন কি ভীষণ বিরোধ বাদ দিয়েও শ্রেণীর অবসান ও সমাজ-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও আয়ের

বিভাগে অন্য উন্নত দেশের তুলনায় আপেক্ষিক কম বৈষম্য, অশিক্ষিতের সংখ্যা, আমাদের রোমাণ্টিক্ গণ-আন্দোলন, মহাপুরুষে ভক্তি, এবং আমাদের কংগ্রেসনীতি বিচার করলে সন্দেহ হয় যে জনমত জাগ্রত হয়ে ফ্যাসিজমের কোন না কোন রূপ বরণ করবে। যে সামাজিক বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা সাধিত হয় তাও এদেশে সম্ভব কিনা জানি না—যদি হয়, তখনও বিরোধ উগ্র থাকবে। এ সব বিষয়ে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কেবল বলা চলে, বিরোধকে স্বীকার করেই হোক আর অন্য কোন শক্তিকে গ্রহণ করেই হোক সাহিত্যে সমাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি বিরোধের ফলে সত্তার প্রতি আমাদের স্থিরদৃষ্টি ভ্রষ্ট হয় তা হলে আমাদের সাবধান হতে হবে। যদি অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেই উপায় গ্রহণ করতে হবে। তবে যাঁদের জন্য সমাজের অতএব সাহিত্যের এই দুর্দ্দশা তাঁরা কি ছেড়ে কথা কইবেন? কইবেন না; তখন ন্যায়ত ধর্ম্মত বিরোধ আনার গুরু দায়িত্ব তাঁদের ওপরই পড়া উচিত। কর্ত্তার দল এভার গ্রহণ করতে রাজি হবেন না, তাঁরা বলবেন, নিম্ন শ্রেণীরাই বিরোধ বাধিয়েছে। আমার বিশ্বাস শ্রেণীবিরোধ তাঁদেরই সৃষ্টি, এমন কি কথাটির দুষ্ট ব্যবহারটি পর্য্যন্ত। নচেৎ 'বিরোধ' সংজ্ঞাটির মধ্যে দোষ গুণ কিছুই নেই। যে আগে ব্যবহার করিতে পারে তারই জিৎ। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই যে সমাজের নতুন গঠন না বুঝে, লেখার জন্যই সাহিত্য সর্ব্বত্রই অ-বাস্তব হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে রিয়ালিষ্টিক সাহিত্য।

পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করেছি যে পুরাতন আদর্শবাদের মোহ আজ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আদর্শবাদকে ত্যাগ করা চলে না, তরুণে ত্যাগ করতে পারে না। আমরা অনেকেই বুঝেছি যে অন্যায় দূর করা উচিত এবং সমাজকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হবে। পুরাতন সমাজের মূলে ছিল সম্পত্তিবিভাগে বৈষম্য। সে বৈষম্য রক্ষা করার দরুণই বড় বড় মিহি গালভরা কথার প্রয়োজন ছিল; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, আর্টের জন্য আর্ট, অভিজাত সম্প্রদায় ও বিদগ্ধ জনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি, ইত্যাদি। সে মূলে আজ ঘা পড়েছে, তাই বড় কথা ভূয়ো ঠেকছে। আজ মনে হচ্ছে ভগবান, ধর্ম্ম,

ব্যক্তিত্ব, আর্ট, স্বরাজ, স্বদেশপ্রেম—এ সব বাইরের এনামেল, ভেতরের লোহা হল সমাজ, দুর্ভাগ্যবশত সমাজের পতিত ও বঞ্চিত শ্রেণী, তাদের দেহ ও মনের ক্ষুধা মেটাবার অসুবিধা, অবকাশ-হীনতা। সর্ব্ব প্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় তরুণরা আজ অনুপ্রাণিত। এদেশে সে আকাঙ্ক্ষার তেজ কম নানা কারণে, তবে যতটুকু আছে তাকে চেষ্টা করলে বাড়ান যায়। আমার ক্ষুধা আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, আপনাদেরই মতন। তবে আমি জানি, আপনারাও বোধ হয় জানেন যে যতদিন আকাঙ্ক্ষা না জোরাল হয়, না মেটে, ততদিন আমার বাঁচা হবে কৃমির মতন বাঁচা। কৃমির জীবন আমার আদর্শ নয়, আমি আরো ভাল করে বাঁচতে চাই, সে জন্য ভাল সাহিত্য আমাকে পেতেই হবে—কেননা সাহিত্যিক হলেন সমাজকর্ত্তা, তাঁর কাছে আমি অনেক প্রত্যাশা করি। আমরা সকলেই বাঁচতে চাই, ভাল করে, আরও ভাল করে, নতুন নতুন উপায়ে। সাহিত্য ভাল করে বাঁচবার সহায়তা করে। (রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন উন্নত হয়েছে।) সাহিত্য আমাদের আদর্শ নিরূপিত করে কিনা জানিনা, তবে যে শক্তির দ্বারা আদর্শ সৃষ্টি হয়, সেই শক্তির দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিভাত হয় নিশ্চয়। সে শক্তি সমাজের, সামাজিক পরিবর্ত্তনের গতিতে তার উৎপত্তি। কেননা এই আদর্শ স্থির নয়, চিরন্তন নয়, একটি বিশেষ শ্রেণীর নয় এ আদর্শ গতিশীল, চলিষ্ণু, পরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বসাধারণের। সমাজও তাই; যে সমাজে অত্যাচার নেই, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ভাল করে বাঁচতে পারে, সেই সমাজের দিকে অগ্রগতিই আমার ও আপনাদের আদর্শ ঠিক করে দিচ্ছে। সেই সমাজেই যে সাহিত্য হবে তাতে কাঁটা থাকবে না। সকলেই নিজের নিজের প্রকৃত ক্ষমতা অনুসারে সে সাহিত্য উপভোগ করতে পারবে। এখন সকলে আনন্দ পায় না; কেননা এ আর্থিক বৈষম্যের জন্য তারা আনন্দ উপভোগ করতে শেখেনি। আর সৎসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা কম, অর্দ্ধশিক্ষিত, এবং সমাজ-সম্ব সম্বন্ধে অচেতন বলে সৎসাহিত্যের চাহিদা কম, নতুন সমাজে চাহিদা

বাড়বে, চাহিদা বাড়লে যোগান অন্তত খানিকটা বাড়বে আমি বিশ্বাস করি। এটুকু আপনারাও নিশ্চয় স্বীকার করেন।

'স্বীকার' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা সমাজকেই সবচেয়ে কঠিন সত্য মনে করি, মুখে অন্তত আমরা সকলেই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তার বেশী কিছু জানি না। তাকে বদলাতে হবে আমরা বুঝি কিন্তু কি করে করব আমরা জানি না। আমরা কেউই ভবিষ্যৎ-বক্তা নই, নেতা নই, এবং সন্দেহ করি সমাজে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যবহারকে। মনে হয়, যে-সব ঘটনার দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎরূপ প্রবর্ত্তিত হয়, তাদের অঙ্কাধীন করা ত দূরের কথা করায়ত্ত করাও শক্ত। তবে আমরা সকলেই এই সব বিষয়ে জানতে চাই, সচেতন হতে চাই, ভবিষ্যৎকে মুঠার মধ্যে আনতে চাই। আমাদের জানবার প্রবৃত্তি আছে এবং কাজ করবার প্রবৃত্তিও আছে। এক কথায় আমরা ইতিহাসের মর্ম্মকথা বুঝতে চাই। বোঝাটা কাজ করা থেকে পৃথক ব্যবহার নয়। বুঝে কাজ করলে, কিম্বা কাজ করে বুঝলে ব্যাপারটা সহজ হবে নিশ্চয়। ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা তখনই শক্ত যখন ইতিহাস মানে নিয়তি। এতদিন ইতিহাসকে অতিপ্রাকৃতের অত্যাচার গণ্য করে এসেছি, তাকে অন্ধ শক্তি কিম্বা নিয়তি নাম দিয়েছি, ইতিহাস বলতে পুরাতন পাঁজি-পুঁথিঘাঁটা এবং প্রমাণ তর্কের ব্যবহার-ক্ষেত্রই ভেবে এসেছি, তাই আমাদের ইতিহাসকে কেবল মানতেই হয়েছে, মুখস্থই করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক দার্শনিকের মতনই, সমাজকে ব্যাখ্যাই করে এসেছেন, সমাজকে গড়ে তোলেন নি। যা হচ্ছে তাই ভাল কেননা তাই বুদ্ধির নিয়মানুযায়ী, অতএব পুরাতনের চিন্তা করা ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য আমাদের নেই, আমরা এতদিন এই ভেবে এসেছি। কিন্তু ইতিহাস সমাজেরই ইতিহাস এবং সমাজ মানুষেরই সমাজ, একথা মনে পড়েনি। আমরা বিশ্বাস করিনি যে মানসিক প্রক্রিয়ায় অনেক মিল থাকে, সেই মিলের উপরই সমাজের ভিত্তি এবং সেই ভিত্তির উপরই ইতিহাসের ইমারৎ খাড়া করা হয়েছে। অতএব সেই ইতিহাসের কোথাও না কোথাও মূলগত ঐক্য থাকবেই থাকবে

অর্থাৎ নিয়ম থাকবে। আজ আমাদের অজানিতে আমরা সকলেই ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়েছি, আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ভাবনায় শান্তি দিচ্ছে না। সেজন্য নতুনতর সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত না হলেও তার ঐকান্তিক প্রয়োজন স্বীকার করি, এবং ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করে অন্তত আংশিকভাবে, অতিপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক ও তথাকথিত সামাজিক নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হতে চাই। আমরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসিনা, নিষ্কর্ম্মা হয়ে পুরাতন মহিমায় ডুবে থাকতেও চাই না। এই প্রকার অক্ষমতা, এবং কাজ ও চিন্তার সাহায্যে ক্ষমতা-অর্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই আমাদের যোগসূত্র। এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার ইচ্ছার অর্থ হল স্বীকার, সমাজ-সত্তাকে স্বীকার।

পূর্ব্বোক্ত মনোভাব নিয়ে আমি সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার মতামত যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করতে চান না, কিম্বা সাহিত্যিকের জন্যই সাহিত্য বিবেচনা করেন, কিম্বা যাঁরা পুরাতন সমাজকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চান, তাঁদের মনঃপূত হবে না। সাহিত্য-সম্বন্ধে এতদিন যা ভাবছি, অল্পকথায় আপনাদের তাই বলব—বিস্তারিত ভাবে বলবার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বদেশের সাহিত্যই ভারি লঘু ঠেকে ; ঠুনকো মনে হয়, বুনোন তার ঠাশ নয়, বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য। **রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আমার মন্তব্যের বাইরে।** আমার ধারণা এই যে বর্ত্তমান সাহিত্যিক সাহিত্য-বস্তুর সত্তা স্বীকার করতে পারেন নি, স্বীকার করতে ভয় পান। সাহিত্যবস্তু হ'ল মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ। মানুষ সামাজিক জীব এবং মানুষের সম্বন্ধই হল সমাজ ; সমাজ বদলাচ্ছে মূলত আর্থিক কারণে, ও কলকব্জা, যন্ত্র আবিষ্কার অর্থাৎ বিজ্ঞানের দৌলতে। বিজ্ঞান অর্থে কেবল নৈসর্গিক প্রকৃতিকে বশে আনা নয়, বাইরের সমাজ ও অন্তঃপ্রকৃতিকেও বশে আনা। জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় নৈসর্গিক প্রকৃতিকে জয় করা মানুষের সম্বন্ধ ও স্বভাবকে জয় করা অপেক্ষা সহজ। কিন্তু তাই বলে সমাজ ও অন্তর

আমাদের শক্তির বহির্ভূত নয়। সামাজিক ব্যবহার ও অন্তর্গত দৈহিক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমেই আমাদের বিশদ হচ্ছে। সেই জ্ঞানবৃদ্ধির পদ্ধতি এক ভিন্ন দুই নয়। এই দুই প্রকার জ্ঞান এবং একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা বুঝেছি যে উৎপাদন-শক্তির রূপপরিবর্ত্তন হলে সমাজের রূপপরিবর্ত্তন হয়। অতএব সাহিত্য-বস্তুর পরিবর্ত্তন অস্বীকার করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী হই। বিজ্ঞানের ফলাফল না গ্রহণ করে যে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় তার মূল্য অকালের ফুল ফলের মতনই। নতুন উৎপাদন-শক্তির তাগিদে সামাজিক পরিবর্ত্তন, সামাজিক সত্তার গঠন-পরিবর্ত্তন এবং সেই পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের আচার ব্যবহারের প্রভেদ ও সংঘাতই হল সাহিত্যের প্রকৃত সত্তা। আমার বিশ্বাস পুনরায় বলছি—বর্ত্তমান সাহিত্যের লঘুত্ব, এই প্রভেদ ও সংঘাতকে না মানার জন্য। এ দেশে আমরা সকলে সমাজসত্তাকে পাশ কাটিয়ে আসছি, তাই আমাদের সাহিত্য আমাদের সমশ্রেণীর প্রাণেই কেবল সাড়া দেয়, জনসাধারণের কাছে তার কোনও আবেদন ও মূল্য নেই। অথচ সাহিত্য একতরফা ডিক্রি নয়ই নয়, কোনও আর্টই নয়। সাড়া না পেলে সাড়া দেওয়া যায় না। সাড়া না দিতে জানলে সাড়া পাওয়া যায় না। এতদিন সর্ব্বত্র, অন্তত গত কয়েক শতাব্দী ধরে, সাহিত্য ছিল ধনী-ব্যক্তির সখের সামগ্রী, সৃষ্টির নামে ধনীশ্রেণীর আত্মপ্রসাদ, এবং উপভোগের নামে নির্ধনের ও অশিক্ষিতের আত্মপ্রবঞ্চনা। এখন বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে কল ও যন্ত্র এসেছে। টান পড়েছে তার গ্রামে গ্রামে, কেবল আমাদের মগজেরই টনক্ নড়ছে না। সমাজ গেল ভেঙ্গে, মানুষের ব্যবহার গেল বদলে, অথচ সাহিত্যিক খরগোশের মতন ভাবছেন, চোখ বুজলেই বিপদ কেটে যাবে। **তা হয় না, তা হয় না, তা হয় না।** এখন চোখ খুলে দাঁড়াতে হবে, সমাজ ভাঙ্গার ও গড়ার শক্তিকে, তাকে বিজ্ঞানই বলুন বা শ্রেণী বিরোধই বলুন—কি দুইই বলুন, আমার তাতে আপত্তি নেই, ব্যবহার করতে হবে। তবেই হবে সৎসাহিত্য, নাটকের মত নাটক, নভেলের মত নভেল, গল্পের মত গল্প—তবেই হবে সতেজ সাহিত্য যা আমাদের নেই। কেবল নেই নেই বলে আফশোষ করলে চলবে না। সামাজিক বিবর্ত্তনের শক্তির দ্বারা আমরা নব্য সাহিত্য

সৃষ্টি করব। জীবনকে অগ্রাহ্য করছি অথচ সকলকে আনন্দ দেব এ কি হয়? সামাজিক সত্তা, সমস্যা ও তার স্বীকার, নিরাকরণ বাদ দিলে সাহিত্য হয় একদেশদর্শী, প্রাণহীন, ছোট, হাল্‌কা, ঠুন্‌কো, মেলোয়ারী। সাহিত্যিক নিশ্চয়ই সমাজকে স্বীকার করবে, কেননা সমাজ হল মানুষের সম্বন্ধ, তবে যে শ্রেণীর হাতে সমাজ পড়েছে সে সমাজকে নয়। সাহিত্যিক সেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করবে, কেননা যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও নেতৃত্ব করবার শক্তি ও বাসনা তার আছে, তবে সে সমস্যা ঐ ওপরকার শ্রেণীর চিন্তাবিলাস সে সমস্যা নয়, ভাঙ্গা গড়ার সমস্যা। এ যুগে বেড়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মজা দেখা কাপুরুষতা। এ সময়, অপক্ষপাতিতা, ঔদাসীন্য, মধ্যস্থতা করা, সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও শঠতা। বিজ্ঞানে শুনেছি রায় না দিলেও চলে, যদিও আমি তা বিশ্বাস করি না, কিন্তু সাহিত্যে নিজেকে বাদী-প্রতিবাদী হতেই হবে, এ যে মানুষের জীবন নিয়ে কারবার, কেবল মায়ার খেলা নয়। চাকরীস্থলে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' প্রণালীটা উপকারী, কিন্তু সাহিত্যে অচল। সাহিত্যিককে দলে নামতেই হবে, দলের হয়ে তাকে লড়তেই হবে, দল অর্থে ছোট্ট গণ্ডী নির্দ্দেশ করছিনা, হাটবাজারের কোলাহল তাকে শুনতেই হবে, জীবন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতেই হবে। চিরন্তন মূল্যের দোহাই দিয়ে নিজেকে কূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে, চিরকাল ধরে ভোগসত্ব উপভোগ করবার বাসনা পোষণের জন্য তাকে দায়ী হতে হবে, জবাবদিহি পর্য্যন্ত করতে হবে। আমার সিদ্ধান্তগুলি যে সহানুভূতির নামান্তর নয় প্রমাণ করবার জন্য তাদের গোড়াকার বিচার-বাক্যগুলিকে একত্রে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। একটি অন্যের সঙ্গে যুক্তির গাঁটছড়ায় বাঁধা।

(১) সাহিত্য মনের ক্রিয়া, মন মানুষের, মানুষের মন জীবনযাত্রার একটি উপায়, জীবনের কাজ অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, প্রকৃতির সঙ্গেও। প্রথমটির নাম সমাজ-গঠন, দ্বিতীয়টির নাম বিজ্ঞান। এর একটি অন্যটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। দুটোই ক্রিয়াবাচক। অতএব সমাজে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা থেকে মানুষের মনের কোন ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বিচ্ছিন্ন করলে মানসিক ক্রিয়াকলাপ অন্যের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে, যেমন সাহিত্য,

বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করলে চিন্তা হয়ে ওঠে কাজের চেয়ে ঢের বেশী দরকারী জিনিষ, অতএব সত্তার বিচার হয় সেই চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সঙ্গতি দিয়ে; যেমন দর্শনের মতো আর্টেও হওয়া উচিত বলা হচ্ছে। কিন্তু সত্য কথা অন্যধরণের। জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক নয়, কর্ম্মের জন্য জ্ঞানের উদয়, সেই জ্ঞানের সাহায্যে কর্ম্মের সুবিধা ও সুব্যবস্থা, আবার তারই ফলে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান। কাজের সেরা কাজ জীবন-যাত্রা, আরো ভাল করে, নতুনভাবে, তীব্রতর উপায়ে, ব্যাপকভাবে, সমগ্র শক্তিকে পুরোদমে খাটিয়ে, নতুন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ কোরে। সাহিত্যই জীবনের শেষ নয়, যেমন জীবনের শেষ নয় দর্শন, বিজ্ঞান, কিম্বা অন্য যে কোন আর্ট; ভাল করে জীবন চালানই সাহিত্যের শেষ, যা-তা করে, যেমনভাবে জীবন চলে আসছে তেমন ভাবে নয়। অবশ্য জীবনের অর্থ বদলে গেলে আমার বক্তব্যও বদলে যাবে। আপাতত, জ্ঞান উপায় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অতএব বর্ত্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের জীবন যে কেবল প্রতিফলিত হবে তাই নয়, তখনকার সমাজ-গঠন ও জীবন-যাত্রার রীতি-নীতির ইঙ্গিতও সেখানে থাকা চাই। এই হল সাহিত্যিকের যথার্থ ঋণ-পরিশোধ, এইখানেই তার নেতৃত্ব ও যথার্থ প্রতিপত্তি।

(২) সমগ্র ইতিহাসই সম-সাময়িক ইতিহাস, অর্থাৎ ইতিহাসের মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটনের সময় এখনই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই। যাঁরা মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটন ক'রে ভবিষৎ চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দিতে পারেন সাহিত্যিক সেই দলেরই একজন। তিনিও অন্যের মতন ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কারক, তবে তিনি ইতিহাসের নিয়মাবলীকে বিচার-বাক্যে পরিণত করেন না, মানব-চরিত্রের সংঘাতে, ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে পরিস্ফুট করেন। দার্শনিকের আবিষ্কৃত নিয়ম নিরালম্ব, আবেগশূন্য, সাহিত্যিকের নিয়ম ব্যক্তির সম্পর্কিত, আবেগময়, চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশিত। তাই সাহিত্যিকের আবিষ্কৃত নিয়ম আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করি। আমার সেই জন্যই এই 'স-গুণ' নিয়মের আবিষ্কারকদের অন্যের চেয়ে বেশী খাতির করি। মানুষের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ধারা কি ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে সাহিত্যিক জানেন বলেই সাহিত্যিক কালের অধীন নন্। নিয়তির নিয়ম

জানেন বলেই সাহিত্যিক স্বাধীন, অতএব কালাতীত। সাহিত্যে চিরন্তন মূল্যের অর্থই হল এই। যে সাহিত্যিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ইতিহাসের সামাজিক পরিবর্ত্তনের গূঢ় কথা বোঝাতে পেরেছেন তিনিই বিশ্ব-সাহিত্যিক, তিনিই দেশের প্রকৃত নেতা। আজকালকার সাহিত্যিক পরিবর্ত্তনের বিশ্ব ইতিহাসের তোয়াক্কা রাখেন না, তাই নেতৃবৃন্দের প্রকোপ। সাহিত্যিকের কাছে সমাজ অনেক বেশী প্রত্যাশা করে, সাহিত্যিকের দায়িত্ব অন্যের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁরা কেবলমাত্র 'আর্টিষ্ট' হয়ে সমশ্রেণীর আনন্দবিধান করলে সমাজের আশা মেটেনা, সমাজের সাথে সম্বন্ধকে, (কর্ত্তব্যের কথা নাই তুললাম) অস্বীকার করার জন্য তাঁদের ক্ষতি হয়, অতএব আমাদের প্রত্যেকের ক্ষতি হয়।

অতএব আর্টের জন্য আর্ট বিশ্বাস করিনা, কারণ তা হলে টাকার জন্যই টাকা রোজগার, মন্দর জন্যই মন্দ, ভালর জন্যই ভাল কাজ করায় বিশ্বাস করতে হয়, আর মানতে হয় কেবল বস-বাসের জন্যই বসত বাড়ী, আরামের জন্য নয়, ভাল করে থাকবার জন্য নয়। ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এইটুকু—আর্টিষ্ট যেন নিজের কাজে ফাঁকি না দেন, সস্তায় নাম কেনার জন্য কিম্বা বড়লোক হবার জন্য তিনি যেন সততার পথ থেকে বিচ্যুত না হন। আর্টের জন্য আর্ট মানার অর্থ হল, কর্ম্ম থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা আর্টের বিষয়-বস্তু, সমাজসত্তাকে পরিত্যাগ করা, ইতিহাস না বোঝা, এবং জীবনকে দূরে সরিয়ে রাখা, উপায়কে উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন বিবেচনা করা। 'আর্টের জন্য আর্টের' যুক্তিগত সঙ্গতি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু সে যুক্তি জীবন ও পরিবর্ত্তনের যুক্তি থেকে বিযুক্ত। কোন যুক্তি মানব? কেতাবে-পড়া সত্তার সঙ্গে অসম্পর্কিত যুক্তি, না জীবনের, পরিবর্ত্তনের, ইতিহাসের দুর্ব্বোধ্য অথচ দুর্নিবার যুক্তি? কর্ম্ম থেকে চিন্তাকে বৃন্তচ্যুত করবার জন্যই; (যাঁরা করেছেন তাদের কৃপাতেই) একটি অন্যটির বিপরীতধর্ম্মী হয়ে উঠেছে। যাঁরা যুক্তির অন্তর্নিহিত সঙ্গতির ওপরই যুক্তির সার্থকতা নির্ভর করছে প্রমাণ করতে ব্যগ্র তাঁরাই সামাজিক জীবনের, ইতিহাসের, পরিবর্ত্তনের প্রতিকূলে পাল তুলে অ-জানার উদ্দেশ্যে ভেসে চলেন। আমরা কিন্তু নিজ হাতে গড়তে চাই, আমরা ভাসতে চাই না, কূল-কিনারা

আমরা জানতে চাই, দিশেহারার অবস্থা আমাদের ভাল লাগে না। ভেসে বেড়াবার বিলাস আমাদের বরদাস্ত হয় না। আর্টের জন্য আর্ট হল অনেক ক্ষেত্রেই একটি শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভদ্রভাষা, অর্থাৎ পরিভাষা, নিজেদের প্রতিপত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির নামান্তর, নিঃশেষিত হবার পূর্ব্বনিঃশ্বাস, এবং জনসাধারণের রসোপভোগের অন্তরায় সৃজন, অতএব রস-সৃষ্টির একটি প্রধান বিপত্তি।

সাহিত্য হল মানুষের মনের ক্রিয়া, সমাজের বাইরে মানুষ নেই, কেননা, মানুষের সম্বন্ধই হল সমাজের প্রাণ। সমাজের বাইরে আছেন যোগী-ঋষি, কিম্বা বাঘিনী-প্রতিপালিত মানবশিশু। শেষ জীবটির সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কম, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এখনও আছে। অবশ্য যোগীঋষির সাহিত্যিক সৃষ্টি ও মতামতের মূল্য সমাজের কাছে কম, শিষ্যের কাছেই বেশী। যতদিন না সমগ্র সমাজ শিষ্য হচ্ছে ততদিন মহাপুরুষদের কথা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। সাহিত্য এক প্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকা চাই, প্রক্রিয়াটি ঠিক্ খেলা নয়; খেলারও উদ্দেশ্য ছিল আদিম যুগে, এখনও অন্যরূপে আছে, পরেও থাকবে, অন্যরূপে। এমন কি যোগেরও একটা উদ্দেশ্য আছে, আনন্দ কিম্বা শান্তি, কিম্বা স্বরাট হওয়া। নিষ্কাম প্রক্রিয়া কাঁঠালের আমসত্বের মতন কথার কথা। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকলে সে উদ্দেশ্যের মূল্য থাকা চাই। উদ্দেশ্য বাইরের কোন ভাব হলে একজনের হওয়া সম্ভব হত, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিতরের, কাজ থেকেই তার উৎপত্তি, অতএব উদ্দেশ্য একাধিক ব্যক্তির। উদ্দেশ্যের মূল্যও একজনের দান নয়। উদ্দেশ্যের মূল্য সম্বন্ধে জনকয়েকের মতামতে মিল থাকা চাই, নচেৎ সাহিত্য ডাকটিকিট-সংগ্রহের চেয়েও নীচুস্তরের খামখেয়াল হত। যাঁদের শিক্ষাদীক্ষার আনন্দ পাওয়ার ও সৃষ্টির সুবিধা ছিল এতদিন তাঁরাই ছিলেন জনকয়েক। সেই ওপরতলার বাসিন্দার মতামতে মিল থাকলেই যে কোন উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের বলে গৃহীত হত, সর্ব্বসাধারণকে গ্রহণ করান হত, বিচার করবার সুযোগ না দিয়ে, নানা প্রকারে। এখন জন কয়েক আর কয়েকজন মাত্র নয়, তার অর্থ আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কী আশ্চর্য্য! যখন সাহিত্য ছিল একটি মাত্র শ্রেণীর প্রক্রিয়া, তখন সে

প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামতের প্রচারকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা হত না, তখন সাহিত্য হত সাহিত্যের জন্য, তার মধ্যে চিরন্তন মূল্যের আভাস পাওয়া যেত, আর এখন ঢের বেশী সংখ্যক লোকের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মতের ঐক্যকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলেই সাহিত্যকে জাতিচ্যুত করা হচ্ছে। আমার বক্তব্য, অধিক সংখ্যক লোকের মতামতকে সংখ্যাধিক্যের জন্য, কিম্বা বিপরীত মতামত পোষণ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা অন্যায়। যাঁদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে, স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে তাঁরা অবশ্য তাই বলবেন। তাতে এসে যায় না, তাঁরাই প্রথমে পথ দেখিয়েছেন। সাহিত্য, অন্তত নবযুগের সাহিত্য প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট হতে বাধ্য। রামায়ণে, মহাভারতে আর্য্যধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্মের তরফ্দারি আছে; রবীন্দ্রনাথেও আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার; পুরাতন সমাজের বিপক্ষে এবং এখনকার নতুন সমাজের তরফে কিছু বলতে গিয়েও ব্যাস বাল্মিকী রবীন্দ্রনাথকেও প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট হতে হয়েছে। জনকয়েক যখন সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যায়, কিম্বা জনসাধারণে কোন কারণে, বুঝে, না বুঝে, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার দরুণ একটি শ্রেণীকে স্বীকার করে নেয়, তখন সাহিত্যের প্রাপাগ্যাণ্ডিষ্ট হয়ে ওঠেন প্রফেট্। প্রোপাগ্যাণ্ডা হল জীবনস্রোতের এই ঘাটার ঢেউ।

(৪) সাহিত্য হল মানুষের মনের ক্রিয়া, মানুষ সমাজেই জন্মায়, সমাজের মধ্যে লালিত পালিত হয়, সমাজেই তার প্রতিপত্তি, মৃত্যুর পর সমাজই তার বার্ষিকী, শতবার্ষিকী উৎসব করে। সাহিত্যিকও মানুষ। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার ক্ষমতা বেশী, কিন্তু তিনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন। মানুষ একপ্রকার জীব। যতক্ষণ মানুষ জীব ততক্ষণ সাহিত্যিককে প্রতিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে, নচেৎ তাঁর বাঁচা অসম্ভব। জীবজগতের এই অভিযোজন-কর্ম্মের কর্ত্তা হল জীবের সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি। গাছপালা, জন্তুজানোয়ার, সাধারণ মানব-সমাজে কিভাবে একটি গাছ, একটি জন্তু, একটি মানুষ বাঁচবে নিজের নিজের সমাজ ঠিক করে দেয়। কোথাও যে ব্যতিক্রম হয় না বল্ছি না, কিন্তু ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়ম নয়, এবং জীববিজ্ঞানই বল্ছে ব্যতিক্রমের বাঁচবার সম্ভাবনা

কম। অর্থাৎ জীবজগতে বিধান দেয় সমাজে, জীবকে এই বিধানের অনুবর্ত্তন করতে হয়। এখন, অভিযোজন-কার্য্যের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম মানসিক ক্রিয়াতে প্রতিভাত হয় স্বীকার করলেও আমি একথা মানতে প্রস্তুত নই যে মনোময় কি চিন্ময় জগতের আইনকানুন জীবজগতের রীতি-নীতির প্রতিকূল। অতিরিক্ত কর্ম্ম কিম্বা ক্রিয়ায় প্রভেদ থাকলেও সাধারণ মানুষের সাধারণ মানসিক ক্রিয়া থেকেই সেই প্রভেদ। কতটুকু প্রভেদ জান্তে হলে কিসের থেকে প্রভেদ জানাটাই প্রথমে দরকার। প্রকৃতির নির্ব্বাচনই সামাজিক নির্ব্বাচনের মূলে আছে, তাদের মধ্যে অন্যপ্রকার যত প্রভেদ থাকুক না কেন। যতদূর জানা যায় ততদূর বলা চলে যে এই মনোময় জগতে এমন কোন আগন্তুক অসাধারণ গুণ আবির্ভূত হয় না, যার সম্বন্ধে জীবজগতের ধাপ থেকেই দৈবব্যাখ্যার অপেক্ষা বুদ্ধির পক্ষে বেশী সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা চলে না। জীববিজ্ঞান সম্পূর্ণতার দিকে আরো অগ্রসর হলে আত্মা, প্রতিভা প্রভৃতি যে কোন আগন্তুক ও আকস্মিক গুণের আবিষ্কারের কারণ বার করা সম্ভব হয়। তখন হয়ত টের পাওয়া যায়, আত্মা কি প্রতিভা মানে মানুষের সব শক্তির পরিণত অবস্থায় সামঞ্জস্যের 'আদুরে' নাম। মোদ্দা কথা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়েই মনের কাজকে যাচাই করতে হবে, এমন কি, সাহিত্যিকেরও মনকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল তথ্য যুক্তির সাতত্য, ঐক্য নয়। অজীব, সজীব, অতিজীব, মানবাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে প্রমাণ করতে গেলে সমাজের তৈরী যুক্তির মালা ছিঁড়ে যায়। সে মালা নতুন করে সাজান যায়, কিন্তু ছেঁড়ে না। আমি অন্তত ছেঁড়া মালা পরতে রাজী নই। রসায়নে ইয়ুরিয়া বলে একটা জিনিষ আছে, হেন্‌রী সাহেবের কাছে তার ব্যবহার আজব গোছের মনে হয়, 'ভোলার' সাহেব তাকে ভেঙ্গে যখন গড়লেন তখন তার আজবত্ব রইল না, কেননা কোন কালেই ছিল না। অজ্ঞানতাই আজবত্ব সৃষ্টি করেছিল। আগে মনে হত, শুভ্রজাতির, বড়লোকের ছেলেদের একটা নতুন শক্তি আছে, তারা বিবর্ত্তন-সোপানের উচ্চস্তরের বলেই তারা জগজ্জয়ী, বেশী বুদ্ধিমান ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে যে শেখবার পদ্ধতি এক, কুকুর বাঁদর থেকে আরম্ভ ক'রে নর্ডিক্ ও কোটিপতির ছেলেদের পর্য্যন্ত। বিজ্ঞান আমাদের বড়ই

সাধারণ করে দিয়েছে, কারণ অনেক বিজ্ঞানই এখনও সমাজ থেকে বৃন্তচ্যুত হয় নি। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি ক্রমেই কিন্তু সমাজ থেকে সরে আস্‌ছে, দার্শনিক ও অঙ্কশাস্ত্রবিদের টানের জোরে। না সরিয়ে নিলে যে তাঁদের কর্ম্মের অবসান হয়, অন্ন মারা যায়। বর্ত্তমান সমাজের আবিষ্কৃত জীবনযাত্রা চালাবার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজকাল নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে। যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদেরই সমশ্রেণীর সাহিত্যিক স্বীকার করছেন যে বিজ্ঞান একপ্রকার গুহ্যধর্ম্ম, সাহিত্যেরই মতো, অতএব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই চক্রান্তের ফাঁদে অনেকেই পড়েছেন। ফল কি হয়েছে আমরা জানি, বিজ্ঞান একেবারেই অবোধ্য, যেমন সাহিত্য একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। এই দুইদল ও তাঁদের পরিপোষক ধনী সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে সমাজ এখন মানুষের বাইরের জিনিষ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে জীবন বহিষ্কৃত, সাহিত্যকলা সমাজ থেকে দূরীভূত, চিন্তা থেকে কর্ম্ম, কর্ম্ম থেকে চিন্তা, জীবন থেকে আর্ট ও বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সব হয়ে পড়ল নিষ্কাম। যেমন নিষ্কামভাবে ধনীশ্রেণী অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে এসেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসের অর্থ সমাজকে অস্বীকার করা, সমাজের পরিবর্ত্তন না মানা, এবং সেই পরিবর্ত্তনকে বুদ্ধির দ্বারা মানুষের অধীনে আনাতে আলস্য। সাহিত্যিককে সমাজসত্তা মানতেই হবে, অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাঁকে মানতেই হবে নচেৎ তাঁর সাহিত্য হবে একটি শ্রেণীর স্বার্থোপযোগী ভাববিলাস। বর্ত্তমান সাহিত্যের এত গলদ, সে সাহিত্য উপভোগে এত বিপত্তি, সাহিত্যে আভিজাত্য-অনুভব—এসব দোষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অ-প্রত্যয়ের দরুণ—অর্থাৎ জীবনের প্রতি আস্থা কম থাকার দরুণ, সমাজ-সত্তাকে গ্রহণ করলে স্বার্থে ঘা পড়বে এই ভয়ের দরুণ। যুক্তির সাতত্য রাখতে আমি শঙ্কিত হই না, কারণ যুক্তি হল সামাজিক আদান-প্রদানের রীতি-নীতি এবং পুরানো সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়লেও পুরাতন দর্শনের ভাষার সমাজ 'সত্তা'র অস্তিত্ব অটুট থাকে। আমি প্রাণবাদীর দৈবব্যাখ্যা মানি না। আত্মার বিশিষ্টতা স্বীকার করি না, বুদ্ধিতে বিশ্বাস করি, মেক্যানিষ্টিক ব্যাখ্যায় আপাতত সন্তুষ্ট, সর্ব্বক্ষেত্রেই সেই পদ্ধতি খাটাতে তৎপর, খাটাতে না পারলে অপেক্ষা করি,

অধীরভাবে দৈবশক্তির কাছে ব্যাখ্যা ভিক্ষা করি না, প্রতীক্ষা করি সেই দিনের জন্য যেদিন বৈজ্ঞানিক, সাহসভরে, সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ, চিন্তার সঙ্গে কর্ম্মের যোগ মেনে নিয়ে, সামাজিক কল্যাণরূপ সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্য স্বীকার করে, শ্রেণীর স্বার্থ ভুলে গিয়ে তার মার্জ্জিত পদ্ধতি সামাজিক সমস্যার মীমাংসা-কার্য্যে নিযুক্ত করবে। তখন হয়ত এই যুক্তির নাম হবে অন্য, তা হোক। আমি বিশ্বাস করি যে সাহিত্য সৃষ্টি কাজটাও সাহিত্যিক নামক জীবেরই একধরণের কাজ। সাহিত্যিক নামক জীবটির মনের উৎকর্ষসাধন হয়েছে, তাই বলে সে অতিজীব নয়, তাই বলে তার মনোভাব প্রকাশ করা এবং লোকের দ্বারা সে মতামত আলোচিত ও গৃহীত হওয়ার গুরু দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত নয়, অর্থাৎ সে কখনই অতিসামাজিক নয়। প্রকাশ তাকে কর্ত্তেই হবে, লোককে তাকে বোঝাতেই হবে, এবং ভাষারই দ্বারা, যে ভাষা তার একার সৃষ্টি নয়। এমন কি নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেও তাই। নচেৎ ব্যর্থতার অসাধারণত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সাহিত্যিকের মন্ত্র নয়। অতএব, জীব ও মনবিশিষ্ট জীব বলেই সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ তাকে বজায় রাখতে হবে। যার সঙ্গে লেন্‌দেন্ তাকে বুঝ্‌তে হয়, নচেৎ ব্যবসা চলে না, বাঁচা চলে না, ঘরের মাল ঘরেই পচে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিক নামক মনবিশিষ্ট জীবের সংবিধানই হল সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন। সাহিত্যিকের মন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সেই মনই হবে রাজা, অন্য জীব তখন প্রজার মতন তারই কথা শুনবে। কিন্তু তখনও সেই অসাধারণ মনের সঙ্গে সাধারণ জীবের মনের সম্বন্ধে ছেদ পড়বে না। এ যেন পুরুষপ্রকৃতি, কোনটা পুরুষ কোনটি প্রকৃতি বোঝা গেল না, কে কাকে চালাচ্ছে তাও জানা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল, দুইএর সম্বন্ধেই জীবনের উৎপত্তি। আশা করি সাহিত্যিক নিজেকে জীবন্ত জীবই ভাবেন।

(৫) রূপ ও বস্তুসত্তার মধ্যে পার্থক্য মধ্যযুগের আবিষ্কৃত স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে পার্থক্যের মতনই জীবনের পক্ষে অনাবশ্যক, অবাস্তব এবং অপকারী। মঠের মধ্যে, পুস্তকাগারে কি পরীক্ষাগারে আবদ্ধ থাকলে এই প্রকার বিভাগ স্বাভাবিক মনে হয়। সুবিধার জন্য বিভাগ করতেই হয়। কিন্তু নিজের সুবিধা যদি বাস্তব জীবনের স্কন্ধে আরোপ করা যায়,

তা হলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়, এবং জনকয়েকের সুবিধার জন্য আমরা যাই মারা। অসভ্যজাতি কেন, গ্রীক্ হিন্দুরাও গাছপালা, নদী পাহাড়ের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করতেন, তাঁরা রূপ ও বস্তুকে একই জিনিষের ভিন্ন দিক ভাবতেন, তাই বস্তুর প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল প্রকৃত বিনয়ের। বাইরের বস্তুকে আবার জয় করবার প্রয়োজন হল, তাকে বুদ্ধির কাঠোমোর মধ্যে আনা হল, পাখী গেল উড়ে, হাতে রইল তার পালক, তখন পালকই হল পাখীর প্রতিভূ, শেষে প্রমাণিত হল, হাতে যেটা সেইটাই আদৎ জিনিষ; রূপই আসল, বস্তু-সত্তা হল নকল। কিন্তু এইভাবে জীবন চালান যায় না, কোন আর্টই সম্ভব হয় না—**বিনয় চাই। আবার গরবও চাই।** বিনয়ের জন্য রামায়ণ, যেখানে বানর হয়ে ওঠে মহাবীর, গাছ হয়ে ওঠে মহীরুহ, যেখানে পাথর হয়ে ওঠে দেবতা, পাহাড় হয়ে ওঠে গন্ধমাদন, পাখী, লতাপাতা, রামের শোকে কাঁদে। আর দাম্ভিকতার জন্য গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের হাতে প'ড়ে প্রকৃতি মহাপ্রাণী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে মহা-প্রাণ নির্গত করে, ত্রিয়ানন্ তৈরী হয়, চিত্র হয় জ্যামিতি, সুর হয় অঙ্ক, স্থাপত্য হয় কলকারখানার নকল। অতি বিনয়ও ভাল নয়, দাম্ভিকতাও ধাতে বসে না। যে ব্যক্তি সত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করেছে সেই স্বাভাবিক পুরুষ। সেই স্বাভাবিক পুরুষ রূপ ও সত্তার মধ্যে আন্তরিকতা স্বীকার করে, বিলাসীর মতন আপেলের রং উপভোগ করবার জন্য খোসা কেটে টেবিলে সাজায় না, আপেলই রাখে। মূর্ত্তিগড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ণের ছটা বিচ্ছুরিত হয় সেই বর্ণই পাকা, নচেৎ বিসর্জ্জনের সময় যে হরতেল ধুয়ে যায় তাকে কাঁচা রংই বলতে হবে। রূপ ভিন্ন সত্তা সম্ভব নয়। রূপ ও সত্তার পার্থক্য মানলে সত্তার প্রতি, রূপের প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় না। দ্বিখণ্ডিত করবার পর আবার যদি খণ্ডগুলি জোড়াও যায় তা হলেও সেই আদিম, অকৃত্রিম সত্তায় ফিরে আসা যায় না। অথচ আর্টিষ্টকে সেই আদিম অকৃত্রিত অখণ্ডিত সত্তায় ফিরে আসতেই হবে। 'শান্তিতে স্মরণ করলে' যে কবিতা হয় তার মধ্যে আর্টের চেয়ে পরমাত্মার সন্ধানই বেশী পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, 'রূপ ও সত্তা দুটি ভিন্ন বস্তু'—এই দার্শনিক মতামত

সম্ভব হয় সেই সময় যখন সমাজে শ্রেণীবিরোধ ঘটে, তারই ফলে মনের ঐক্য বহুধা-বিভক্ত হয়ে যায়। সেইজন্য চিন্তার ক্ষেত্রেও বিভাগটি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।[১] মধ্যযুগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগের সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রায় সকলেই সমাজের রূপ ও সত্তা নিয়ে চুলচেরা তর্ক তুলেছিলেন। এই সময় যে শ্রেণীবিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল কে না জানে? সমাজের মধ্যে যতদিন ঐক্য থাকে, এমন কি শ্রেণীবিরোধ সুরু হয়েছে না বোঝা পর্য্যন্ত, রূপ ও সত্তা সাধারণের কাছে পৃথক মনে হয় না। আমার সন্দেহের আর একটি সমর্থন দিচ্ছি। যুদ্ধের পূর্ব্বে য়ুরোপীয়ান পণ্ডিতদের মুখে শুনতাম—সাহিত্যের বিষয় রূপ, বিজ্ঞানের বিষয় বস্তুসত্তা। আমাদের দেশেই বস্তাপচা মালের কাট্‌তি সম্ভব, তাই আজকাল অনেক যুবকদের মুখেই ঐ মতের পাণ্ডুর পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। কিন্তু সত্য কথা এই, আর্ট ও বিজ্ঞানের মিল গরমিলের চেয়ে আন্তরিক—পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উভয়েরই উপকার হয়। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে যে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে পূর্ব্বে বলেছি। বৈজ্ঞানিকও যদি আর্টিষ্টের কাছে শিক্ষানবিশী করেন তা হলে বিজ্ঞানেরই উপকার হয়। বৈজ্ঞানিক ও আর্টিষ্ট দুজনকেই সততার পথে চল্‌তে হয়, ফাঁকি দিলে কারুরই চলে না—যে রঙ্গীন কাঁচের টাইল করে তারও নয়, আবার যে স্ফটিকের গঠনপ্রণালী নিয়ে পরীক্ষা করে তারও চলে না। বিজ্ঞানেরও ইতিহাস আছে, যার জন্য আইনষ্টাইনের অঙ্ক বোঝা যায় না হাইবোলসন্—মরলি, মিনকাউস্‌কীর কাজের সঙ্গে পরিচিত না হলে; আবার আর্টেরও ইতিহাস আছে, যার জন্যে অবনী ঠাকুরের ছবি বোঝা যায় না অজন্তার ছবির সঙ্গে পরিচিত না হলে। দু'এরই ইতিহাস সমাজ নির্ণয় করে, সমাজের সঙ্গে দু'এরই সম্বন্ধ স্থির ও নিশ্চিত। দুইই এক-প্রকারের সংযম, এবং দু'এতেই বাদ দিতে হয় অবান্তরকে, কিন্তু দু'এতেই আসল জিনিষ বাদ পড়লে সবটাই নিরর্থক হয়ে পড়ে, অনর্থ ঘটায়, যেমন হচ্ছে—বিজ্ঞান পড়ছে 'ভূয়ো' দর্শনের গর্ত্তে, আর আর্ট পড়ছে জ্যামিতির প্যাঁচে, কিম্বা হাজির হয়েছে বড়লোকের বৈঠকখানায়। প্রকৃত সাহিত্যিক সত্তা নিয়েই ব্যস্ত, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গঠনপ্রণালীও দেখেন।

গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ কেবল রূপকার নন, তাঁরা সমাজ ভেঙ্গেছেন, সমাজ গড়েছেন, আবার রাদারফোর্ড, নীল বর্ পরমাণুর মডেল তৈরী করে বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করেছিলেন। জীবতত্ত্বে বীজ নিয়ে পরীক্ষা হয়, আবার সেই বীজের সজ্জাপ্রণালী নিয়েও কল্পনা করার একান্ত প্রয়োজন আছে। আজকালই কেউ কেউ আর্ট ও বিজ্ঞানের পরস্পরের সম্বন্ধ স্বীকার করছেন, কারণ তাঁরা বুঝেছেন যে **সমাজে** ঐক্য আনার একান্ত প্রয়োজন। আজকালই লোকে বুঝেছে যে কারুশিল্প ও সাধারণ শিল্পের মূল এক ভিন্ন দুই নয়। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা জানিনা, জানলেও বুঝি না, কেননা যে সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরণের কথা মানুষের মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে সে পরিবর্ত্তন আমাদের সমাজে হয়ত আসেনি, অন্তত অমনভাবে প্রকট হয়নি।

(৬) আর একটি মাত্র বিচার-বাক্য আপনাদের দরবারে পেশ করব। ভাষা নিয়েই সাহিত্য। ভাষা প্রধানত মানুষের মুখের। তলিয়ে দেখতে গেলে, বাক্‌তত্ত্বে, ঐ মুখের অধিকারীভেদ নেই। শিশুর কচি মুখ, শ্রীমুখ, আর পাগলের মুখ যাই হোক না কেন, মুখ-নিঃসৃত ভাষার প্রকৃতি হল এই যে সেটি নিতান্ত দৈহিক ক্রিয়ার অনুকল্প প্রক্রিয়া। ভাষা দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিভূ। কাজের বদলি কথা, কিন্তু কাজেই কথার উৎপত্তি। এক একটি কথা মূলত এক একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিরূপ সংজ্ঞা। কথার পিছনে যে চিন্তা থাকে তার প্রকৃতিই হল কার্য্যের পূর্ব্বাববোধ। একেবারে অশরীরী চিন্তা নেই, শারীরিক কাজের সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ কিম্বা অ-প্রত্যক্ষ। যত অ-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ততই ভাষার পরিণতি—সুরের দিকে। তবুও দৈহিক প্রক্রিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সূক্ষ্মতম অ-বাস্তব চিন্তার পরিণতিও দৈহিক প্রক্রিয়ায়, প্রত্যেক চিন্তার বেগ প্রশমিত হয় দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে। যে কবি ও আর্টিষ্ট সত্য কথা কন, তিনিই ঐ কথা স্বীকার করেন। ভাল গান শুন্‌লে আমার গাল কণ্টকিত হয়ে উঠত, আবার দাড়ি কামাতে ইচ্ছে হত বল্‌লে লোকে হেসেছেন—সেদিন একজন বড় কবি বলেছেন—'কবিতা ভাল কি মন্দ পরীক্ষা করা যায় না, তবে যে কবিতা পড়্‌লে গা শিউরে

ওঠে—গায়ে কাঁটা দেয় তাকেই ভাল কবিতা বলি।' ক্ষুরের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর একজন সাহিত্যিক যিনি একাধারে বড় কবি ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তিনিও কবিতা লেখার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, কবিতা লেখবার পূর্ব্বে দেহের যে টানটান ভাব থাকে কবিতা লেখবার পর তার অবসান হয়, এবং তাইতেই যা কিছু সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দ। এখন মানস-বিজ্ঞানে বলছে, যে এই পূর্ব্বাববোধের অবস্থায় মানসিক ব্যবহারগুলি স্থিরীকৃত হয় সামাজিক ব্যবহারের আদান-প্রদানের দ্বারাই। এই সামাজিক আদানপ্রদানেই বৈজ্ঞানিকে যাকে মন বলে তার উৎপত্তি, তারপর মন দেহে আশ্রয় করে, এবং আমরা বলি, একটি বিশেষ দেহের বিশিষ্ট মন। কিন্তু মনের বিশেষত্ব বাস্তবিক পক্ষে 'অতি সামাজিক' একেবারেই নয়। যদি আমরা অন্যের সঙ্গে কথা না কইতাম, তারা যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কইত, যদি কারুর সঙ্গে কারুর বাক্ বিনিময় না হতো, তা হলে আমরা নিজেদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা কইতে পারতাম না। আধুনিক সাহিত্যিকের মতে সাহিত্য হল নিজের সঙ্গে কিম্বা নিজের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে কথা কওয়া। কিন্তু বাকের প্রকৃতি ঐ হলে কি করে তা সম্ভব? বাক্ হয় স্পষ্ট, না হয় গুপ্ত ব্যবহারের প্রতিভূ, ব্যবহারের পূর্ব্বাববোধ ও প্রত্যক্ষতার সঙ্গে তার যোগ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের সঙ্গে বাকের ও বাক্যের সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু ঐ সম্বন্ধবিষয়ে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। ব্যাপারটাকে বিশদ করা যাক্। মানসিক ব্যবহারকে সুবিধার জন্য দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে; (১) যে ব্যবহার বাইরের নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে কোন উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সজ্জিত; এবং (২) যে ব্যবহার ভেতরকার প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের ভাষা খামখেয়ালীর, বিকৃত মস্তিষ্কের, **সীজোফ্রেনয়েডের** আবোল-তাবোল। এপ্রকার বাক্যের সঙ্গতি নেই বলা চলে না, সঙ্গতিটুকু কোন বিশেষ কথা, ঘটনা কিম্বা ব্যক্তির অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয় মাত্র। মনে হয় যেন সে বাক্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, যদিও বক্তার কাছে হয়ত আছে। আধুনিক লেখকেরা বলেন তাঁদের নিজেদের ও দলের কাছে নিশ্চয় আছে। কেন তবু অসঙ্গত

মনে হয় বিচার করলেই বোঝা যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে উদ্দীপক ও উদ্দীপনার সম্বন্ধে কোন ভাষার সঙ্গে এই আবোল তাবোল ভাষার পদ্ধতিতে পার্থক্য নেই—আছে পার্থক্য কেবল **সমাজের গ্রহণশীলতায়**। যে সব উদ্দীপনায় পাগলের মুখ থেকে বাক্য বেরুচ্ছে তাদেরকে সমাজ উপযুক্ত ভাবছে না। অর্থাৎ অনুষঙ্গে কোন দোষ নেই; তবু অসঙ্গত মনে হয় এইজন্য যে সমাজ অর্থ-সঙ্গতিটুকু স্বীকার করছে না। এইখানে অন্তত সমাজ কর্ত্তা। অর্থ-সঙ্গতির শেষ আপীলও রুজু করতে হবে সাধারণের এজ্‌লাসে। যদি জনসমাজ সে আপীল গ্রাহ্য করে তবেই আধুনিক লেখকদের গুপ্তমন্ত্র সাহিত্যপদবাচ্য হবে। খানিকটা মতের ঐক্য হওয়া চাই, নচেৎ প্রকাশের কোন মূল্য থাকে না, সাহিত্যিক মনের সংবাদেরও মূল্য থাকে না। বাক্যের মধ্যে সঙ্গতি বা যুক্তির অংশটুকু বক্তার নিজের সৃষ্টি নয়। অন্তত এইখানে শুদ্ধ ব্যক্তিতন্ত্রবাদ আর টেঁকে না। তা হলে মোট কথা দাঁড়ায় এই যে, কি বাক কি বাক্যে সামাজিক সত্তা ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যিকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সামাজিক সত্তা স্বপ্রকাশ করছে না বলে স্বীকার করা চলে না যে সামাজিক সত্তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নেই, কিম্বা কম। হাওয়া যখন স্থির তখন মানুষে হাওয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করলেও তার চলে, কিন্তু যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীতে যখন বারুদ তৈরীর জন্য সোরা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন হাওয়া আনার প্রয়োজন হয়েছিল। জলের ওপর নৌকো-জাহাজ চালাবার সময় হাওয়া মানতে হয় কি না হয় সারেঙ্গ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাওয়া যায়। আজ আকাশে ঘনঘটা, ঝড় উঠেছে, তাই বলছি সব সাহিত্যিককে—আবহাওয়ার মতন এই সমাজ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করুন, নচেৎ মাঝদরিয়া পর্য্যন্তও পশ্চিমী সাহিত্যের মতন যেতে হবে না—কিনারার কাছে ভরাডুবি হবে। তখন সেলুনে বসে নাচ্‌গান ও কক্‌টেল টানলে, ফষ্টিনষ্টি করলে, ঝড় লজ্জায় ইয়োলাসের থলের ভেতর আত্মগোপন করবে না। সমাজ-সত্তাকে অবহেলা করেই সব সাহিত্য হয়ে উঠেছে বেলোয়ারী চুড়ীর ব্যবসা, বড়ই ঠুন্‌কো, বড়ই হাল্‌কা, বড়ই ফাঁকা, যদিও রঙ্‌বাহার্‌।

এই বিপদ আমাদের আরো বেশী, কারণ পুরোনো কালে যে সমাজ মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মে বুঝিয়ে দিত যে সে আছে, সে সমাজ আজ ভেঙ্গে গিয়েছে, সে সামাজিক সত্তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমাজ ভেঙ্গে গিয়েছে, পড়ে রয়েছে তার টুক্‌রো, তার মধ্যে একটি বলছে আমিই সব, অন্য টুক্‌রো শুনতেই পাচ্ছে না এই দাবী, যারা পাচ্ছে তারা মানছে না। সমাজ যখন নেই, অথচ একটি মাত্র শ্রেণী রয়েছে, তখন সেই শ্রেণীর সত্তাকে সমগ্র সমাজ-সত্তা বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ত' চিরকাল থাকবে না, অন্য শ্রেণী মাথা তুলবে, তখন বাধবে বিরোধ! সে বিরোধের অবস্থা কারুর কারুর কাছে অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও বিরোধ কিছু চিরন্তন নয়। **শ্রেণীবিরোধ ইতিমধ্যের ইতিহাস**। শ্রেণীর সত্তা ভাঙ্গছে গড়ছে, তার শেষ নতুন সমাজে। শ্রেণী-সত্তাকে আশ্রয় করে বড় সাহিত্য হতেই পারে না। কোন ব্যক্তি এই শ্রেণীর আব্‌হাওয়াতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, কোন সাহিত্যিক এই অবস্থায় বড় কিছু লিখতেই পারে না। খণ্ড সত্তায় যাদের আশ মেটে তাদের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু বড় আর্টিষ্ট এক একটি বৃকোদর, তাই রবীন্দ্রনাথ ছোটেন অন্যদেশে, রাশিয়ায়, ক্ষুধা মেটাতে, নতুন সমাজ দেখতে। যে দিন একটি মাত্র শ্রেণী স্ব-ইচ্ছায় সমাজের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করবে সে দিন শুভদিন—কিন্তু ইতিমধ্যে কি করা যায়? আমি প্রথমেই বলেছি বাংলাদেশে যেন নতুন শ্রেণী তৈরী হচ্ছে মনে হয়; যা প্রমাণ দিয়েছি তা'ছাড়া অন্য প্রমাণও পেয়েছি। এই নতুন শ্রেণীর উত্থান ও পুরাতন শ্রেণীর পতনের মূলে যে সমাজ শক্তি আছে তাকেই সাহিত্যের কাজে লাগতে হবে। সে শক্তির নাম বিজ্ঞান, অর্থাৎ নিয়তিকে বশে আনা; তার আর একটি নাম আর্থিক-বৈষম্য অবসানের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা, বাঁচবার জন্য, ভাল করে বাঁচবার জন্য। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।'

এখন সাহিত্যে সামাজিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন কারা? যাঁরা ঐ একমাত্র শ্রেণীর চেয়ে অন্ততপক্ষে ষোলগুণ সংখ্যায় বেশী, যাঁরা উকীল ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, চাকুরে নন। যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের নিয়ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির

দ্বারা আবিষ্কার ক'রে নিয়তির হাত থেকে মুক্ত হতে চান, সমাজের ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করতে চান। যাঁরা তরুণ অথচ জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক। বিশেষ ক'রে যাঁরা জমির সংস্রব ছাড়েন নি ; কেননা জমিই হল আমাদের সমাজসত্তার প্রকৃত সত্ব। আমি শুনেছি পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যাঁরা জমি চাষ করেন তাঁদের বেশীর ভাগ মুসলমান। ভাল কথা, অতএব মুসলমান সাহিত্যেকের দায়িত্বই এ ক্ষেত্রে বেশী। তাঁরা যদি কেবল আরবী ফার্সী উর্দ্দু জবান আমদানী করে বাংলা সাহিত্য বড় করতে চান, তা হলে তাঁদের চেষ্টা সফল নাও হতে পারে, কেননা হিন্দুরা আপত্তি করবে। কিন্তু তাঁরা যদি নতুন শ্রেণী-গঠনের ভার নিয়ে সমাজসত্তাকে সগৌরবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহালে সত্যই সাহিত্যের উপকার হবে। তখন সে সাহিত্য হবে সকলের, হিন্দুরাও আর আপত্তি করবে না, আনন্দে গ্রহণ করবে, আরো বড় করতে সাহায্য করবে। কারণ হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক, সমাজ এক, দুই নয়, ভাল করে বাঁচবার ব্যগ্রতায় তারা এক, তাদের গোষ্ঠীজীবন এক, অধিকারের চেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধে তারা এক। তাদের চিন্তাধারা একই প্রণালীতে বয়। কিন্তু মানসিক সংস্কারে যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তার মূল কারণ এই মাটির সংস্রবে ও গ্রামে থাকার দরুণ তাঁরা হিন্দুদের মতন অ-বাস্তব হয়ে পড়েন নি, এখনও সত্তার সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, জমির সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে। সেই জন্য তাঁদের ভাষায় অত প্যাঁচ নেই। লাঠির মতই তাঁদের ভাষা সোজা আসে। তাঁদের ঐতিহ্যে ধনিকতন্ত্র ফুটে উঠতে পারে নি, তাঁদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কম, জাতিবিভাগ কম, তাঁদের ধর্ম্মে সামাজিক সাম্য খুব জোরেই ঘোষিত হয়েছে। আজ পূর্ব্ববঙ্গে তাঁরা অধিকাংশই গরীব। চাকরীও তাঁরা কম করেন, সহরে বাস করতেও চান না। এত সুবিধা তাঁদেরই। অতএব তাঁদের কাছেই আমার প্রত্যাশা বেশী। তাঁরা ইচ্ছা করলে সমাজকে ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারেন। নতুন সমাজ তৈরী না হলে তাঁদের ক্ষতিই বেশী। সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা হিন্দু তাঁরাও এই কাজ গ্রহণ করুন। হিন্দু মুসলমান সমস্যা নতুন সমাজে থাকবে না, ক্ষুধার চোটে সমস্যা মিটবে বল্‌লে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হল না। নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত হলে হিন্দু মুসলমানের

যে প্রকৃত মিলন ঘটবে তারই ফলে হবে সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। বড় কাজ একত্রে না করতে পেরেই আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, যেমন নতুন কাজ না পেয়েই পুরাতন শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়েছিল। ইতিহাসের পটভূমিকায় নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে সমাজসত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োজন। যে সেই সমাজ গড়বে, সেই বড় সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

সমাজসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার পর, তার সঙ্গে যুক্ত হবার পর সাহিত্যের মাত্রা ঠিক্ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। আমি যা বলতে চেষ্টা করিলাম সেটি হল কাব্য-জিজ্ঞাসার মুখবন্ধ। 'অথ' কথাটির অর্থ পরিষ্কার না হলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যেমন কচি ছেলের আবদার মনে হয়, তেম্‌নি সাহিত্যের বস্তু না বুঝলে কিম্বা তার সঙ্গে বিযুক্ত হলে কাব্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যের মাত্রা-নিরূপণ নিতান্তই নিরালম্ব বিচার হয়ে উঠে। 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'। কাব্য-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে আমার বলবার বেশী কথা নেই, কেননা আমি কবিও নই, আর্টিষ্টও নই। আমি আনন্দ পেতে চাই, মিলে মিশে। নমস্কার, ধন্যবাদ।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর—সাহিত্যশাখার অভিভাষণ

নব্য-বাংলার শক্তিকেন্দ্র

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর মাত্র এক শত বৎসর অতীত হইল। এই একটি শতাব্দীর মধ্যে বাংলা দেশে যে অদ্ভুত শক্তির ফোয়ারা ছুটিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। বস্তুতঃ বাংলার ইতিহাসে ইহাই স্বর্ণযুগ। গৌরবের এত উচ্চশীর্ষে বাঙ্গালী আর কখনও আরোহণ করে নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীর যে কোন জাতি গৌরবান্বিত হইতে পারে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এতগুলি কর্ম্ম-বীরের এত অল্প সময়ের মধ্যে একই দেশে আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসেও দুর্লভ।

কিন্তু কেন এমন হইল? যে জাতি শত শত বৎসর ধরিয়া মরিয়াছিল কোন মন্ত্রশক্তিতে যে পুনর্জীবিত হইল? জড় পদার্থে কে প্রাণ-সঞ্চার করিল? কোন্ সোনার কাঠির পরশে ঘুমন্ত রাজকন্যা জাগ্রত হইল?

ইহাই আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয়।

আমাদের জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের পতন এবং অভ্যুদয়ের মূলে রহিয়াছে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আমাদের ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মের দ্বারাই আমাদের উন্নতি হইয়াছে, এবং এই ধর্ম্মেই আমাদের অবনতি হইয়াছে।

ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝি সর্ব্বাগ্রে তাহারই চর্চ্চা করা উচিত। আমাদের কাছে ধর্ম্ম একটি ব্যাপক পদার্থ। সংজ্ঞা দ্বারা ইহাকে সঙ্কীর্ণ করা যায় না। কোন একটি পুস্তকে বা শাস্ত্রের মধ্যে ইহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ইহা মানুষের প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি আদেশ মাত্র নহে। ধর্ম্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্ম্মের জন্য নহে। মানুষ শুধু সীমাবদ্ধ জীব নহে। সে "সীমার মাঝে অসীম"। অসীমত্বের উপাদান দ্বারাই মানুষ গঠিত। সে স্বতন্ত্র, স্বাধীন। সে নিজের ইচ্ছায় যথারুচি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যে আদেশ তাহার অন্তরাত্মা হইতে উদ্ভূত হয়, সে তদনুসারেই চলে। বাহিরের আদেশ

দ্বারা মানুষকে বদ্ধ করা অসম্ভব। মানুষ "নির্যোগ-বিষয়" হইতে পারে না। শাস্ত্রাদেশ পালনের জন্য মানুষ শুধু উপকরণীভূত হইতে পারে না। "স্বতন্ত্রস্ত ইচ্ছামাত্রেনৈব মন-আদি-প্রেষয়িতৃত্বম্" (কেন-ভাষ্য)। স্বতন্ত্র মানুষ নিজেই তাহার পরমার্থ নির্ণয় করে। মনুষ শাস্ত্রাধীন হইলে তাহার নিজের পরমার্থ নির্ণয়ের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়। আমরা সমস্ত শাস্ত্রের উপর মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করি। শাস্ত্র মানুষের আলোচনার বিষয় মাত্র; শাস্ত্র মানুষের প্রভু হইতে পারে না। শাস্ত্র চর্চ্চা দ্বারা মানুষের জ্ঞানলাভের সাহায্য হয়। মানুষ শাস্ত্রের ভৃত্য নহে।

"জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং, ন কারকং। ন তু শাস্ত্রং ভৃত্যানিব বলাৎ নিবর্ত্তয়তি নিয়োজয়তি বা। পুরুষাঃ স্বয়মেব যথারুচি সাধন-বিশেষেষু প্রবর্ত্তন্তে।" (বৃহদারণ্যক-ভাষ্য—শঙ্কর)

"শাস্ত্র জ্ঞাপক মাত্র, আদেশক নহে। শাস্ত্র মনুষকে ভৃত্যের মত বলপূর্ব্বক কর্ম্মে নিবৃত্ত বা প্রবৃত্ত করায় না। মানুষ স্বেচ্ছায় সাধনে প্রবৃত্ত হয়।"

মানুষ স্বতন্ত্র, স্বাধীন জীব। ধর্ম্ম তাহার আত্মাতে বিকশিত হয়, বাহির হইতে আসে না। মানুষের স্বাধীনতা স্বীকারই আমাদের ধর্ম্মের প্রধান তত্ত্ব।

আমাদের ধর্ম্মের দ্বিতীয় তত্ত্ব হইতেছে ধর্ম্ম-দর্শনে অবিচ্ছেদ। দর্শন ব্যতীত ধর্ম্ম কিংবা ধর্ম্ম ব্যতীত দর্শন আমাদের ধারণায় অসম্ভব। আমাদের দর্শন শুধু একটা মতবাদ মাত্র নহে। জীবনে দর্শনের প্রয়োগ করিতে হইবে; দর্শনকে সাধনে পরিণত করিতে হইবে; দর্শনানুরূপ জীবন গঠন করিতে হইবে, তবেই তো দর্শনের সার্থকতা। দর্শন অলসচিন্তার বিষয় নহে; দর্শন কর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে, জীবনে দর্শনের উপলব্ধি করিতে হইবে। তদ্রূপ ধর্ম্মও বাহিরের সামগ্রী নহে; কয়েকটি কর্ম্মের শাস্ত্রানুগ অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত নহে। ধর্ম্ম পুস্তকে নাই; ধর্ম্ম অন্তরাত্মায়। ধর্ম্মের মূল অন্তরাত্মার দর্শনে। অন্তরাত্মার দর্শনলব্ধ সত্য জীবনে সাধন করিতে হইবে; তবেই তো ধর্ম্মলাভ হইবে। ধর্ম্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। দর্শনের পরিণতি ধর্ম্মে; ধর্ম্মের মূল দর্শনে। মনুষ্যাত্মা স্বাধীন

জীব। সে নিজের দর্শন দ্বারা নিজের ধর্ম্ম নির্ণয় করে। এবং স্বনির্দিষ্ট ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক আপনার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। মানুষের ভাগ্য-বিধাতা মানুষ নিজে।

আমাদের ধর্ম্মের এই দুইটিই হইতেছে মূলতত্ত্ব। এত বড় স্বাধীনতার বাণী, উৎসাহের বাণী আর কে শুনাইতে পারিয়াছে? এ বাণী যে অফুরন্ত শক্তির উৎস। যখনি আমরা এ বাণী বিস্মৃত হইয়াছি, তখনি আমাদের শক্তি লোপ হইয়াছে। তখনি আমরা অদৃষ্টবাদী হইয়া জড়ত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং বাহ্য কর্ম্মের শাস্ত্রানুগ অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম মনে করিয়াছি। তখনই শাস্ত্র আমাদের জ্ঞানলাভের সহায়ক না হইয়া আমাদের প্রভু হইয়া উঠিয়াছে। আবার কোন মহাপুরুষ এই পরম-উৎসাহ-পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী স্মরণ করাইয়া দিতে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন; তখনি আমাদের মধ্যে শক্তির ফোয়ারা ছুটিয়াছে; আমরা অসাধ্য-সাধন করিয়াছি।

আমাদের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর" জাতীয় ইতিহাসের ইহাই মূল সূত্র।

কথাটিকে আর একটু বিশেষ ভাবে বা নির্দ্দিষ্টাকারে আলোচনা করা যাউক।

আমাদের সকল ধর্ম্মের, সকল দর্শনের মূলে রহিয়াছে 'বেদান্ত'। বেদান্তকে হিন্দুমাত্রেই শ্রদ্ধা করেন এবং ইহারই ব্যাখ্যাভেদে ধর্ম্মের সম্প্রদায়ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত হিন্দুই অন্তরে অন্তরে বৈদান্তিক। সমস্ত হিন্দুই বিশ্বাস করেন যে তিনি অসীমত্বের উপাদানে গঠিত; ব্রহ্ম হইতেই অবরোহণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মে অধিরোহণ করাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ।

"অহং দেবো ন কান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং, নিত্যমুক্তস্বভাববান্"।

"আমি দেব, অন্য নহি। আমি ব্রহ্ম, আমি শোক-ভাগী নহি। আমি সচ্চিদানন্দময়; আমার স্বভাব নিত্যমুক্ত।"

সমস্ত হিন্দুই একথা বলিবার অধিকারী এবং নানা আকারে বলেন এবং বিশ্বাস করেন। এ যে বড় উৎসাহময় বাণী। অনন্ত শক্তির উৎস যে এ বাণীর মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আমি তো ক্ষুদ্র নহি; আমি

যে অমৃতের অধিকারী। সমস্ত হীনতা আমার মধ্য হইতে দূর হইয়া গেল; রহিল শুধু অনন্ত উৎসাহ, অবাধ শক্তি, অপরিসীম আনন্দ।

কিন্তু এই মহাবাণীই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কখন কখন মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে। তখন আমরা গর্ব্বান্ধ হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এত বড় কথা শুনিয়া আমাদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আমরা মনে করিয়াছি আমরাই এক একটি ব্রহ্ম। আমাদের কর্ম্ম বা উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তির লোপ হইয়াছে। আমরা উপাসনা ভুলিয়া গিয়াছি। কর্ম্ম ভুলিয়া ব্যর্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছি। সত্য উপাসনা ভুলিয়া কতকগুলি অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছি। আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে; আমরা অসার জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছি এবং শাস্ত্রের ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছি।

এইরূপেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উত্থান ও পতন হইয়াছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও বেদান্তের ইতিহাস ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। বেদান্তে বা ধর্ম্মেই আমাদের উন্নতি ও অবনতি। যখন বেদান্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত জনমত আমাদের কর্ম্ম ও ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তখনই আমাদের অবনতি; যখন কোন মহাপুরুষ এই ভ্রান্ত জনমতকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া আমাদের কর্ম্ম ও ভক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন তখনই আমাদের উন্নতি; তখনই আমাদের দেশে অসংখ্য কর্ম্মবীর ও ভক্তবীরের আবির্ভাব হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য একবার সমস্ত ভারতবর্ষকে নাড়িয়া দিয়াছিলেন নবম শতাব্দীতে। মীমাংসকগণ তখন ধর্ম্মকে অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যজ্ঞবেদীর সুষ্ঠু নির্ম্মাণ এবং চরুরন্ধনের হাতা-বেড়ীর মাপ নির্ণয় করাই ছিল সে যুগে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব। মানুষ শাস্ত্রের ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবান শঙ্কর তখন তাঁহার ভাস্বর দর্শন* লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে নাই; ধর্ম্ম ব্রহ্ম-পদ-প্রাপ্তি-সাধনায়। আর ব্রহ্মপদ লাভ হইবে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা 'অনাত্মার' জয়ে, আত্মার স্বরূপোপলব্ধিদ্বারা, তিনি ঘোষণা করিলেন যে মানুষ শাস্ত্রের দাস নহে। মানুষ স্বাধীন,

স্বধর্ম্মনির্ণয়ে অধিকারী ; মানুষ অমৃতের পুত্র। সে যুগে আমরা যে দর্শন রচনা করিয়াছিলাম তাহা আজও জগৎ-সভায় সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

আবার আমরা সে স্বাধীনতার বাণী, সে উপাসনার বাণী বিস্মৃত হইলাম। বেদান্তের কুব্যাখ্যাদ্বারা আমরা মায়াবাদী হইলাম। সংসারকে অস্বীকার করিলাম। কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে চাহিলাম। উপাসনা ভুলিয়া গেলাম। ফল হইল জাতীয় জড়ত্ব, অসারতা, অধঃপতন। সে যুগের দর্শনের প্রতীক চৈতন্য-চরিতামৃতের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

আবার এই বাংলার মাটিতে নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হইল। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বিধ্বস্ত করিলেন। সার্ব্বভৌমের শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় ভগবানে তিনি অনন্ত শক্তি ও অনন্ত প্রেমের সঞ্চার করিলেন।

“অপানি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পানি করণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
* * * *
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয়”॥

ভগবান অপানি করণ ; অতএব তিনি নিষ্ক্রিয় নিঃশক্তি নন। তিনি অনন্ত শক্তির উৎস ; তিনি অনন্ত লীলাময়। আবার ভক্তির বন্যা ছুটিল। সমস্ত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিল। “সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান”-এর সঙ্গে ভক্তগণের মধুর লীলা চলিতে লাগিল। সে লীলা আজও এই বাংলার মাটিতে চলিতেছে। আজও অসংখ্য ভক্তের চরণ-ধূলিতে বাংলা দেশ পবিত্র হইতেছে।

সে যুগে আমরা বাংলা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছি। এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছি যার সমকক্ষ পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে দুর্লভ। সে বাঙ্গালীর একটি পরম গৌরবময় যুগ। তখন অসংখ্য ভক্তবীরের আবির্ভাবে বাংলা দেশ পবিত্র হইয়াছে।

আবার আমরা সে মন্ত্র বিস্মৃত হইলাম। আবার অলস, অসার, জড়বুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। বিদ্যাচর্চ্চা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম। কর্ম্মের

শক্তিতে আস্থাহীন হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলাম ; অধঃপাতের চরমসীমায় উপনীত হইলাম। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সে এক তমোময় যুগ।

তখন ইংরাজ তাহার পাশ্চাত্য কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এতই জড় হইয়াছি আমরা যে ‘আঁখি’ মেলিয়া সে আলো দেখিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। বরং “জাতি যাইবে” প্রভৃতি নানা আজুহাতে সে আলোককে দূরে ঠেলিতে প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছি। তখন বিধাতার বিধানে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইল। তিনি এই পাশ্চাত্য কর্ম্মশক্তি বাঙ্গালীর চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন এবং কর্ম্মশক্তিকে আমাদের রক্তমজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম-কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। শুধু অনুকরণ যে কর্ম্মশক্তির আশ্রয় সে শক্তি অধিকদিবস-স্থায়ী হইতে পারে না। শুধু বুদ্ধি-পরিচালিত শক্তিও আত্মঘাতী হইয়া উঠিতে পারে। কেননা, বুদ্ধি তীক্ষ্ণধার ; যে কোন গ্রন্থি কাটিয়া ফেলা তার পক্ষে সুসাধ্য। ধারণ-স্বভাব ধর্ম্মই কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম উৎস। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধিত হইল।

বেদান্তেই এই সুন্দর সামঞ্জস্যের সমাধান হইল। মনুষ্যাত্মার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। এই স্বাধীনতাকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া স্বীকার করা হইল। সমস্ত শাস্ত্রকে স্বাধীন মনুষ্যাত্মার উন্নতির উপকরণীভূত বলিয়া স্বীকার করা হইল। শাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। শাস্ত্র আর আমাদের আদেশ প্রদান করিল না ; তৎপরিবর্ত্তে প্রচুর ‘আলোক’ উদ্গীরণ করিল। সমস্ত সংসার ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বলিয়া মান্য হইল। কাজেই সংসার ত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা রহিল না। বরং সংসারসেবাই ব্রহ্মসেবায় পরিণত হইল। সংসার লঙ্ঘন আর ব্রহ্মকে লঙ্ঘন একই জিনিষে পরিণত হইল। কর্ম্মের গুণগত পার্থক্য রহিল না। গৃহসম্মার্জন করা, সমুদ্রযাত্রা করা, আর বেদীতে বসিয়া প্রার্থনা করা যাহা কিছু কর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হইল। ধর্ম্ম বেদী ত্যাগ করিয়া সমস্ত বিশ্বে শিকড় গাড়িল। কর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ম্ম অন্যরূপে এখন আমাদের কাছে উপনীত হইল। কর্ম্ম আর শুধু কর্ম্ম রহিল না ; কর্ম্ম

ভগবদুপাসনায় পরিণত হইল। শাস্ত্র নিত্য নূতন আলোক বিতরণ করিতে লাগিল। তখন হইতেই বাংলাদেশে এক বিরাট শক্তির লীলা চলিয়াছে। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই বিরাট শক্তিরই পূর্ণ প্রকাশ। বিবেকানন্দ এই নূতন বাণীর শ্রেষ্ঠ প্রচারক। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগৎ অবাক হইয়া শুনিয়াছে। বাঙ্গালীর ধমনীতে নূতন শক্তির লীলা বহিয়াছে।

ইহাই বাঙ্গালীর বর্ত্তমান গৌরবের মূল সূত্র। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি এই বাণীকেই তাঁহার "মুক্তি-সাধন" কবিতায় সুন্দর ভাষা দিয়াছেন,

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।"

ইহাই নব্য বাংলার শক্তিমন্ত্র। শঙ্করের জ্ঞান, চৈতন্যের ভক্তি ও বর্ত্তমান যুগের কর্ম্ম—এই ত্রিধারার অপূর্ব্ব সমাবেশে নব্য বাংলার সংগঠন হইয়াছে। বিবেকানন্দ এই ত্রিধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

লিঙ্‌হামের পথে

[লর্ড ডান্‌সানী]

জরকেন্‌স্ বল্লে, "কোনও রকম পানীয় পেটে না পড়লে আমি গল্পই বলতে পারি না, এই রকম একটা ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে। এমন কথা কেন রটে আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। আজ বিকেলেই হঠাৎ একটা গল্প মনে এল—বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যদি গল্প বলতে চাও। একটু অসাধারণ অভিজ্ঞতা, যদি শুনতে চাও বলতে পারি। কিন্তু বলে রাখছি এক বিন্দু পানীয়েরও প্রয়োজন নেই।"

আমি বল্লুম, "তা আর বল্‌তে ?"

জরকেন্‌স্ বল্লে, "আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে—এই গল্প যদি আর কোথায়ও চালাও, এমন ভাবে বোলো যাতে লোকে বিশ্বাস করতে পারে। এমন লোকও আছে—হয়ত বেশী নয় তারা—যারা তোমার-বলা আমার গল্পগুলোকে নেহাৎ আষাঢ়ে খেয়াল ভেবে থাকে। একজন তো আমায় মুনচাউসেনের জুড়ি বলেছে তুলনাটা আমার পক্ষে গৌরবের, নয় কিনা মুনচাউসেন বলে বসলো! তুলনাটা আমায় বেশ ব্যথা দিয়েছিল—তোমার প্রকাশককেও আঘাত করে থাকবে। এ তোমার ঐ গল্প বলার ভঙ্গীর দোষে। ঘটনাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু এমন ভাবে বলেছ যাতে এই সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে। এখন থেকে একটু হুঁশিয়ার হবে ত, কি বলো ?"

আমি বল্লুম, "হুঁ, মনে থাকবে।"

এইবার জরকেন্‌স্ গল্প সুরু করলে।

"হাঁ একটু অসাধারণ বই কি—বেশ একটু। তাই বলে তুমি উড়িয়ে দেবে না নিশ্চয়ই। নইলে শুধু বিশ্বাস করানোর জন্য মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে নেহাৎ নীরস ঘরোয়া গুলোই বেছে নিতে হত—য়র না পেঞ্জ থেকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন অবধি রেল-যাত্রার কাহিনী। আমাদের সে অবস্থায় এসে নিশ্চয়ই পৌঁছুতে হয় নি।"

আমি বল্লুম, "খেপেছ ?"

"যাক।" এই সময় আর দু জন বন্ধু আমাদের কাছে এসে ঘেঁসে বসলেন। জরকেন্‌স্ বল্লে :—

"মনে হচ্ছে কালকের কথা। পূর্ব্ব ইংলণ্ডের একটি লম্বা রাস্তা। দু ধারে পপ্‌লারের শ্রেণী—রাস্তাটার পাড়ের মত। মাইল তিনেক লম্বা হবে রাস্তাটা। নীচু জলে ডোবা দেশ—তারই বুক চিরে পথটা চলেছে। ডোবাগুলো থেকে জল ছেঁচে নিয়েছে, তবুও দু চারটে ছোট ডোবা থেকে গেছে—তারই পাশে আর গর্ত্তগুলোর পাশ দিয়ে নলখাগড়ার ডগাগুলো কাঁপছে—যেন একটি সৈন্যদল মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যায় নি। ডোবাগুলোকে শুকিয়ে ফেলেও যেন স্বস্তি নেই, পপ্‌লারগুলোও কাটতে সুরু করেছে। এ পথ যখন প্রথম চোখে পড়ল—প্রান্তরের উভয় প্রান্তে দুটি ঋজু পপ্‌লারের শ্রেণী, যেন সবুজ ও সাদা পালক—তখন লোকগুলো এই কাজেই রত ছিল। আর যাই বল, কি খাসা হাত। ঠিক পথের উপরে এড়োভাবে তারা গাছগুলো ফেলছিল—সেই ভাবেই গাড়ী বোঝাই করার সুবিধা, আর এতে করে লোক-চলাচলের যা অসুবিধা হচ্ছিল তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—সোজা তিন মাইল ফাঁকা, কোনও যান বাহন পথিক এলে দেখতে পাওয়ার অসুবিধাও নেই। আর আমার চোখেও কিছু পড়ে নি, এক যার কথা বলব সে ছাড়া। সে যাই হোক, কাঠুরেরা একটা গাছ কাটছিল—সেটাকে ফেলতে হবে ঠিক দুটো গাছের মধ্যে, ফাঁকটার ভিতর, এই দুটো গাছের ডাল পালা বাঁচাতে গেলে হাতখানেক জায়গার মধ্যেই গাছটাকে ফেল্‌তে হয়। এমন ওস্তাদের মত তারা গাছটা ফেল্লে যে একটা পাতাতেও ছোঁয়াছুঁয়ি হল না—ঐ দুটি গাছের মধ্যে দিয়ে বিরাট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে গাছটি ভূমিসাৎ হল, আর ঐ দুটি গাছের যে পল্লবগুলি এই গাছটির দিকে মুখ ফিরে ছিল, তারা আতঙ্কে ত্রস্ত হয়ে কেঁপে উঠল। এই পাকা ওস্তাদি দেখে আমি টুপি খুলে হর্ষধ্বনি করে উঠলাম। সবাই এমন করত। যারা ধ্বংসের কবলে পড়েছে, তাদের পতনে আনন্দবোধ করা উচিত নয়, প্রকাশ্যে ত নয়ই। কিন্তু এ রকম চিন্তা করে সব সময় ত আর কাজ করা হয় না। হর্ষনিনাদের

অস্ফুট প্রতিধ্বনিটুকু এই অভিশপ্ত তরুশ্রেণীর পথে মিলিয়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরে সে কথা স্মরণ করে আমার ভারী লজ্জা হ'ল।

সেদিনকার মত এই তাদের শেষ গাছ-কাটা। একটু পরেই আমি লিঙ্‌হাম গ্রামের দিকে একা হেঁটে এগিয়ে চল্লুম। তিন মাইল জলা পেরিয়ে ঐখানেই প্রথম লোকালয়। সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ায় বৃক্ষশ্রেণীর রুক্ষতা মোলায়েম হয়ে আসছিল। কাঠুরেরা তাদের গাড়ী আর কাঠ নিয়ে গেল অন্য দিকে, তাদের উঁচু গলার কথাগুলো, ঘোড়ার উপর হাঁক ডাক, সব ক্রমশঃ শ্রুতির অগোচর হয়ে উঠল। চারিদিকে অক্ষুণ্ণ নিস্তব্ধতা, শুধু আমার নিজের পদধ্বনি আর থেকে-থেকে পেছনে অতি অস্ফুট গুঞ্জনের মত কি এক শব্দ শোনা যাচ্ছে—মনে হল বৃক্ষ-চূড়ায় মৃদু বায়ুর বীজন, বায়ু যদিও তখন একটুও ছিল না।

মাইল খানেকও যাই নি, এমন সময় কেমন যেন মনে হল কেউ চুপি-চুপি আমার অনুসরণ করছে। কেন মনে হল বলতে পারব না, কিন্তু বেশ গভীর ভাবে যেন অনুভব করলুম, ক্ষীণ সন্দেহ থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে ধারণাটা ধ্রুব নৈশ্চিত্যে পরিণত হল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুই চোখে পড়ল না কিম্বা হয়ত রাস্তার বাঁকের পেছনে কিসের একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখতেও পেয়ে থাকব—খানিক পরেই যাকে অতি স্পষ্টরূপে দেখেছিলাম—কিন্তু তখন বিশ্বাস করি নি। কে যেন পেছু নিয়েছে এই ধারণাটা যতই ধ্রুব হয়ে উঠল, পেছুন ফিরে তাকানোর সাহস ততই হচ্ছিল ক্ষীণ। আমার কল্পনায় যত রকমের লোক আমার অনুসরণ করতে পারে তাদের কারুকে আমার সন্দেহের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলুম না। আর সিকি মাইল পথও হয় নি—শ চারেক গজ বড় জোর হবে—কিন্তু দেখ আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এ রকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি—আজও মনে করলে আমার গলা কাঠ হয়ে আসে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।" তোমাদের কারুকে নিশ্চয়ই এ অবস্থায় পড়তে হয় নি।"

"নিশ্চয়ই না" বলে আমি ওয়েটারকে ইসারা করলাম। জরকেন্‌সের দৃষ্টিতে এমন একটা ভয়ের ছাপ নিশ্চয়ই লেগে ছিল যাতে করে এখনও সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হতে পারে নি বলে মনে হল। সামলে নিয়ে সে আমায়

ধন্যবাদ জানালে—এতে তার ভুল হয় না—তারপর গল্পটা কের ধর্‌লে।

"আর চার শ' গজও যাই নি এমন সময় আমি নিঃসংশয় হলুম যে আমার অনুসরণকারী নিশ্চয়ই মানবজগতের কেউ নয়। কেউ অনুসরণ করছে এতে যা বিচলিত হয়েছিলুম, এই নিঃসংশয়তায় তার চাইতে ঢের বেশী হলুম; অনুসরণটা যে ধ্রুব সত্য তা সন্দেহ করার উপায় নেই, মাপ করা পা ফেলাও শুন্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু মানুষের পা নয়। নীচু, জলাভূমি-বহুল সম্পূর্ণ বিজন প্রান্তরে আমার মনে হল—একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় এ ধারণাটা কিছু বিচিত্র নয়—যে কোনও কারণে মানুষ যদি কোনও শক্তিকে চটিয়ে থাকে, তা হ'লে তার ভোগ পোহাতে হবে আমাকে। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে সমস্ত বস্তু যত অস্পষ্ট ও রহস্যগুণ্ঠনাবৃত মনে হতে থাকল, এই ধারণাটা আমার মনকে ততই পেয়ে বসল। সাহস নেহাৎ মন্দ দেখাই নি—আমার পিছনের পদধ্বনি স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, তখনও আমি দৃঢ় পদবিক্ষেপে পথ চলেছি। শুধু পিছনে তাকাতে পারছি না। অস্বীকার করি না যে অনুসৃত হয়েছি জেনে ভয় পেয়েছিলাম, অনুসরণকারী মানুষ নয় জেনে আরও ভয় পেয়েছিলাম—তবুও ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করব না এ বিষয়ে কতকটা দৃঢ়তাও যে ছিল না, তা নয়—শুধু পেছনে তাকানোর ভীতির থেকে অব্যাহতি পাই নি। তোমাদের যা বলেছি তারই কথা ভেবে গলা শুকিয়ে উঠেছে ভেবো না যেন।" এই বলে একটু চুপ করে থেকে জরকেন্‌স এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করে ফেল্লে।

"আরও সাংঘাতিক ভয় আমার বরাতে তোলা ছিল—এমন মর্ম্মান্তিক ভয় যে আমি মুহ্যমান হয়ে রাস্তার উপর পড়ি আর কি—আজও সে কথা মনে হলে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে, কত রাত্রি দুঃস্বপনে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। প্রাণী-জগতে আমরা এত গর্ব্ব অনুভব করি, আর এই জগতে আমরা এমন ভাবে মিশে আছি যে বাইরের থেকে কোনও আঘাত পেলেই আমরা বিচলিত, বিহ্বল হ'য়ে পড়ি। আমারও ঠিক এই অবস্থাই হ'ল যখন বুঝতে পারলুম আমার অনুগামী প্রাণী-জগতের অধিবাসী নয়। পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—খট্‌খট্‌—একটা কেমন একটানা খস্‌ খস্‌ শব্দও, কিন্তু

একটি নিঃশ্বাসের স্পন্দনও শুন্‌তে পাচ্ছি না। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখার সময় ঢের হয়েছে, অথচ সাহস নেই। পরুষ পদশব্দে কোমলতার স্পর্শও নেই। থাবা নয়, খুরও নয়। ঐ শব্দ এত কাছে এসে পড়েছে যে প্রাণী হলে তার নিঃশ্বাসের শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পেতুম। এই রকম অবস্থায় এক ধরণের অধ্যাত্ম-চেতনা আমাদের চালিত করে—তাকে অন্তর্দ্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম অনুভূতি যাই বল না কেন। সেই আমাকে অতি সুস্পষ্টভাবে বল্লে এই অনুসরণ-কারী আমাদের কেউ নয়। এর না আছে মাংসল কোমলতা, না আছে প্রাণ। এ যে আমাদের কেউ নয়, কেউই নয়, আমায় তা জানতে হয়েছিল।

এই যে ক মুহূর্ত্ত আমি পথ বেয়ে চলেচি আর ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্কল্প করছি—এতে যা ভয় পেয়েছিলাম তা জীবনে আর কখনও পাই নি। ঘাড় কিছুতেই ফেরাতে পারছি না। তার পর হঠাৎ থেমেই ঘুরে দাঁড়ালাম। ঠিক এ রকম কেন করেছিলাম বলতে পারি না—হয়ত আমার দেহ চালনার মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা স্ফুট হয়ে উঠেছিল, যাতে আমি আত্মসংযম করতে পেরেছিলুম—না পারলে অব্যাহতিও ছিল না। দৌড়লেই গিয়ে-ছিলাম। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে যা দেখার দেখে নিলাম, তার পর আবার ঘুরে দাঁড়ালুম।

বল্লুম না পপ্‌লারটা পড়ার সময় আমি হর্ষনাদ করেছিলুম—ঠিক তার পাশের গাছটার নীচেই তখন আমি দাঁড়িয়ে—অনেক হপ্তা ধরেই পপ্‌লার কাটা চলেছিল। যে গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে উল্লাস-প্রকাশ করেছিলাম তার চেহারাটা আমার মনে ছিল; তার ডাল পালা ছড়ানোর ভঙ্গীটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। দেখেই তাকে চিনলাম। সেই বটে ঠিক রাস্তার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে। একটা শিকড় উঁচুতে তোলা, তার গায়ে মাটির ডেলা লেগে রয়েছে। সেই খট্‌ খট্‌ করে লিঙ্গহামের পথে আমার অনুসরণ করছে। এখন বেশ শান্ত ছেলের মত তোমাদের সঙ্গে কথা কইছি, তা থেকে ভেবোনা তখনও মাথা এমনি ঠাণ্ডাই ছিল। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় নি বল্লে নেহাৎ মিছে কথা বলা হবে। একটা কথাকে শুধু আমার ভয়ে-ভরা মন জোর করে ধরে ছিল—দৌড়লে চলবে না। কতই পুরোনো গল্প

মনে হল, কাদের সব সিংহে তাড়া করেছিল; সেগুলোকে আশ্রয় করে তাদের মর্ম্ম অনুযায়ী আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করলুম। দৌড়লেই গিয়েছি, আমার রিক্ত বুদ্ধির এই ছিল একমাত্র সম্বল।

অতর্কিতে আমার পদক্ষেপ দ্রুততর করতে অবশ্যই চেষ্টা করেছিলাম। পেরেছিলাম কি না জানি না—গাছটা ঠিক যেন পেছনে। ঘুরে আর দাঁড়াই নি, কিন্তু এর পদধ্বনি থেকে চেহারাটা এঁচে নিতে পারলুম—কাঁকড়ার মত গুড়ি মেরে হাতীর মত বিরাটকায় গাছ খট্ খট্ করে চলেছে, পাতাগুলোর মর্ম্মর থেকে বোঝা যাচ্ছে ডালগুলো নুয়ে আসছে, তাতেও আমি দৌড়ই নি।

আর যে গাছগুলো ছিল, সবারই যেন আমার দিকে লক্ষ্য। উদ্ভিদ যদি সত্যিই প্রাণহীন হয় তাদের যে রকম নির্লিপ্ত হওয়া উচিত সে ভাবটা এদের নেই—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ত' দূরের কথা। এই এতগুলো পপ্‌লারের ক্রোধের মাঝে নিঃসহায় আমি একা—অথচ জানো ত, আমি তাদের একটিকেও আঘাত করি নি।

হাঁটুতে যে জোর ছিল না তা নয়—দৌড়তে আমি পারতাম, শুদ্ধ আমার শুভবুদ্ধিই আমাকে নিবৃত্ত করলে। জানতাম দৌড়িয়ে এই বিরাটকায় অনুসরণকারীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। এখানে বসে যুক্তির চোখ দিয়ে দেখে বেশ বোঝা যায় যে অনুসরণকারী যেই হোক না কেন সহজে ছেড়ে দেবে না—আর পালানোর চেষ্টা যতই করবে, ততই তাকে উত্তেজিত করে তোলা হবে। তার পর আর যারা আছে তারাই বা কি করবে, তাও জানি না। এতক্ষণ অবশ্য তারা শুধু লক্ষ্যই করছে, কিন্তু আমি এত নিঃসঙ্গ—জনমানবের চিহ্ন মাত্রও সামনে নেই—ভাবলুম কিছুই হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে স্থিরভাবে পথ চলাই সমীচীন, আর অচেতন পদার্থকে আমরা যে দম্ভ দেখিয়ে থাকি সেই দম্ভের ভাবটাই বেশ জোরে বজায় রাখি না কেন। ঘনায়মান সন্ধ্যায় আমার চারদিকের জলাভূমিতে কাদাখোঁচার ডাক শুনতে পেলুম। এই শোচনীয় দশায় প্রাণী জগতের এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরেও আমি সাহচর্য্য অনুভব করতে পারতুম কিন্তু কেন জানি না এরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। এদের কণ্ঠস্বরে যেন

একটা অস্বস্তির ভাব আছে, অন্তত যখন ঠিক বুঝতে পারা যায় না এরা শত্রু কি মিত্র, তখন মনে হয় সমস্ত আকাশ যেন গোঙাচ্ছে। তা ছাড়া, এটাও ঠিক যে এদের জন্য গাছের অনুসরণে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নি। প্রাণী-জগতের কেউ যদি আমার দলে আসত তা হলে গাছের অনুসরণ তো থেমে যাবার কথা। এক ঝাঁক দাঁড়কাক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, পরম উদাসীন—গাছটা কিন্তু ঠিক আমার পেছনে। ভয়ের তাড়সে ভুলে গেলাম আমি মানুষ, শুধু মনে রইল আমি প্রাণবান জীব। নেহাৎ নির্ব্বোধের মত আশা হল, যেই দাঁড়কাকগুলো উড়ে যাবে, কাদাখোঁচাগুলোর পাখা বাতাসের স্তর ভেদ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এই নিরীক্ষমাণ ভীষণ পপ্‌লারশ্রেণী এবং আমার পশ্চাতের ভীতির কারণটিও যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়বে। কাদাখোঁচাদের কলতান নিঃসঙ্গতাকে আরও নিবিড় করে তুল্ল; দাঁড়কাকগুলোর পক্ষবিস্তারে ঘনায়মান অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠল—অথচ পপ্‌লার গাছটির এই অন্যায় জুলুম কেউই প্রতিনিবৃত্ত করলে না। বাধ্য হয়ে নেহাৎ বোকার মত আমাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হল। খুঁড়িয়ে চলেছি বড়ই যেন শ্রান্ত, অথচ একটা পা দিয়ে আর একটা পায়ের চাইতে কখনও বড় বড় কখনও জোরে জোরে ধাপ ফেলছি—যেটায় বেশী ঠকান যায়। কিন্তু কি-ই বা এই ছেলেমান্ষীর মূল্য? যেই অনুসরণ করুক পলাতকের গতির বিচার সে করবে মধ্যের ব্যবধানটুকু দিয়ে, আর গতিও সে ঠিকই লক্ষ্য করছে—তারই অনুযায়ী চলতে হবে তাকে। তাই যদিও মাঝে মাঝে আমি ব্যবধানটুকু বাড়িয়ে ফেলছিলাম, খানিক পরেই শাখাগুলোর মর্ম্মর স্পষ্টতর, আর সেই খট্ খট্ আওয়াজ আরও জোর হয়ে উঠছিল। আজও রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখলেই সে শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাই; অন্য শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্য মুহূর্ত্তেই ধরা পড়ে।

তিন মাইল শুনতে আর কতটুকু? বড় জোর এখান থেকে কেনসিংটন; কিন্তু আমি একজন লোকের কথা জানি—তাকে সিংহ তাড়া করেছিল এর চেয়ে ঢের কম পথ। সে শপথ করে বলেছিল এর চাইতে দীর্ঘতর পথ তাকে একবারের কেন, দশবারের হাঁটা জড় করলেও কখনও অতিক্রম করতে হয় নি। তাও সিংহ—যার হৃদ্‌যন্ত্র আছে, রক্ত আছে

মানুষের মতনই। মৃত্যু বটে, তবুও এ মরণ হাজারো লোকের ভাগ্যে ঘটেছে। কিন্তু আমার এ ভীতি মানব অভিজ্ঞতার বাইরে, কোনও মানুষকে এর সম্মুখীন হতে হয়নি, আমিও জানতুম না কোনও দিন এই ভীতির সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে। তবুও আমি দৌড়োই নি।

আমার চারিদিকের নির্জ্জনতায় যেন একটা পরিবর্ত্তনের ছায়া পড়ল। লিঙ্গহামের আলোকগুলিই নয়—চিমনির ধোঁয়াও নয়, বাড়ীগুলো থেকে এতদূরে এসেও যেটুকু মৃদু উত্তাপ আমায় স্পর্শ করছিল—মানবের অস্তিত্বের বৈজয়ন্তি-স্বরূপ সেই উত্তাপের স্পর্শও নয়, একটা অনুভূতি যা উত্তাপের চেয়ে ব্যাপকতর, কেমন একটা জ্যোতি যা মানবের সান্নিধ্য থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে পড়ে। এই অনুভূতি শুধু আমাকেই যে স্পর্শ করেছিল তা নয়। একটু আগেই পপ্‌লার শ্রেণী উত্তেজিত আগ্রহে আমার বিনাশের প্রতীক্ষা করছিল—সে আগ্রহ এখন যেন অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে।"

টারবাট্ জরকেন্‌সকে পেলে ছাড়ে না। সে বল্লে "পপ্‌লারগুলো কেমন করে তাদের ভাব প্রকাশ কর্‌লে হে?"

জরকেন্‌স বল্লে, "অনেক বছর ধরে যদি তুমি পপ্‌লারদের নিয়ে অনুশীলন করতে, কিম্বা অন্তত সেদিন পথে আমাকে যেমন করে নজর রাখতে হয়েছিল, তেমন করে নজর করতে, এমন অবস্থায় যদি পড়তে যখন বহু বিস্তৃত সময়ের পরিসর একটি মাত্র আতঙ্কময় অভিজ্ঞতায় সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—তা হলে তুমিও বুঝতে পারতে কখন পপ্‌লার সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে। এই ঘটনার পর কদাচিৎ আমি এ দৃশ্য দেখেছি, তাও নিঃসংশয় হওয়ার মত করে কখনও দেখি নি। কিন্তু তখন যে ভাবটি দেখেছি, তাতে ভুল হতে পারে না—প্রতিটি পল্লবে একটা টন্‌টনে আগ্রহ, শাখাগুলো যেন অশরীরীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গ্রামকে বলছে—চুপ্! ভুল হবে কি করে? এখন কিন্তু মৃদু সান্ধ্যবায়ুতে পল্লবগুলি স্পন্দিত হচ্ছিল, শাখাগ্রে সেই সর্ব্বনাশের ভ্রূকুটি নেই—কোনও নির্দ্দেশ, বা ইঙ্গিত বা প্রতীক্ষার ভাব আর গাছগুলোয় নেই—প্রতীক্ষা বল্লে অবশ্য তাদের এই ত্রাস-সঞ্চারী স্থির আগ্রহের কথাটা কিছুই বলা হয় না। আরও ভাল কথা—আমার আশা হল—আশার চেয়ে বেশী এখনও আমি মনে করতে পারি নি, যে আমার অনুসরণকারী ক্রমশ যেন

পিছিয়ে পড়ছে। জানালাগুলোর দিকে অগ্রসর হতে হতে আমার আশা বেড়ে চলল। গবাক্ষপথে স্নিগ্ধ আলোক—কতকগুলিতে সন্ধ্যার ম্লানিমা, কতকগুলিতে প্রজ্জ্বলিত দীপালোক—জলাভূমির বহু দূর পর্য্যন্ত যেন মানুষের প্রভাব বিস্তার করে দিল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। একটু পরেই একটা মালটানা গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল—ওঃ কি তাতে স্বস্তি! গাড়ীখানা খামারে চলেছে। সমগ্র প্রকৃতির উপর এই সব শব্দের প্রভাব অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নয়। মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলুম কোনও বিপ্লব ঘটে যায় নি—প্রাণী-জগতের প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পিছনের ভীতি-প্রদ পদধ্বনিতে একটা দ্বিধার ভাব বেশ শুনতে পেলুম। নাড়ী আমার যাই বলুক, স্থির পদে আমি পথ চলেছি। কতকগুলো হাঁস কলরব করে উঠল। আরও কতকগুলো মালটানা গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। মাঝে-মাঝে একটা ছেলে গাড়ী দেখে চেঁচিয়ে উঠছে, কতকগুলো কুকুর তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। বুঝলাম প্রাণীজগতের সীমানার মধ্যে এসে পড়েছি। পিছনে সেই রক্ত-জল-করা খট্ খট্ শব্দ যদি না শোনা যেত, তা হলে গাছটাতেই হয়ত অবিশ্বাস করে বসতুম। এই যেমন তুমি এখানে তোফা বসে বসে অবিশ্বাস করেছিলে, বুঝলে না হে টারবাট্?" শেষ অবধি টারবাট্ চুপ করেই থাকল।

"যখন গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম পদশব্দ অতি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, শুধু আমার ভয় দিয়েই বুঝতে পারলুম কেন মানবজাতির প্রভুত্ব ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গ্রামের ভিতরেও এত দূর পর্য্যন্ত গাছটা আমার অনুসরণ করছে। একটু লম্বা পা ফেলে চল্‌তে চল্‌তে একটা সরাইয়ের সামনে এসে আমি দাঁড়ালুম—দরজাটা বেশ মজবুত। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে দরজা, ছাদ, আর সামনের দেয়াল দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হলুম। সহজে ঘা মেরে ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকার জো নেই। এই রকম আশ্রয়ই খুঁজছি বুঝে খরগোসের মত সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লুম।

পপলারের সামনে যে বীরপনা দেখিয়েছিলুম্ ঢিলে জামার মতন ফস্ করে তা গেল খসে। টেবিলের পাশে একখানা কাঠের চেয়ারে ধপ্ করে বসে, শুয়ে বল্লেই হয়, পড়লাম, দেহের খানিকটা রইল চেয়ারে, বাকীটুকু

রইল টেবিলের উপর। কতকগুলো লোক আমার কাছে এসে কথা জুড়ে দিলে, আমার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। জন তিন চারেক মজুর বিয়ার খেতে এসেছে সন্ধ্যায়, আর 'মাগ অভ এলের' সত্ত্বাধিকারী স্বয়ং, এঁরা সবাই এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। আমি চুপ।

এরা আমায় খুব আপ্যায়িত করলে। যখন দেখলুম মুখে রা ফুটছে বল্লুম, শরীর ভাল নেই। কি হয়েছে তা আর বল্লুম না, হয়ত বেফাঁস এমন অসুখের কথা বলে বস্‌ব, যার পক্ষে হুইস্‌কী অনিষ্টকর, অথচ তখনই আমার এক চুমুক না টানলেই নয়। দিলেও তারা। না বল্লে বেইমানী করা হবে। জল না মেশানো একটি পুরো গেলাস হুইস্‌কী খেলুম। আর এক গেলাস দিলে। বিশ্বাস কর কিছুই হল না দু গেলাসে, এতটুকুও না। আরও এক গেলাস চাইলুম, কিন্তু সেটুকু গ্রহণ করার আগে একটা জিনিষ-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চাই ত। বাইরে আমার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করছে না ত? সোজা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোল না। মাথা ভুলে বল্লুম "খাসা গাঁ-টি। বাইরে কেমন সুন্দর গাছ!"

"একজন বল্লে, গাছ আবার কোথায়?"

"গাছ নেই? পাঁচ শিলিং বাজি রাখছি, নিশ্চয়ই আছে।"

সে বল্লে, "না"—বেশ জোরের সঙ্গে—বাজি অবধি ধরার তার আগ্রহ নেই।

"আমার মনে হচ্ছে যেন একটা"—পপ্‌লার বলতে ভরসা হল না, তাই বল্লুম, "যেন একটা গাছ দেখেছিলুম ঠিক দরজার বাইয়ে।"

সে বল্লে "নাঃ। গাছটাছ কিচ্ছু নেই।"

"বেশ, দশ শিলিং বাজি!"

সে বাজি ধরলে। "আচ্ছা, যান না কর্তা বাইরে গিয়ে দেখেই আসুন না!"

ফের আমি দরজার বাইরে যাই আর কি? বল্লুম, "নাঃ। তুমি গেলেই হবে। তোমার স্মৃতিশক্তিতে আমার সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু তুমি বাইরে গিয়ে চোখে যদি দেখে এস আছে কি নেই, তাতে আমি অবিশ্বাস করব না।"

সে একটু হাসল, ভাবলে যে আমি একটু রঙে আছি। হায় ভগবান! যদি সত্য কথা বলতুম না জানি কি ভাবত।

যাক্‌—সে ফিরে এল এমন একটা খবর নিয়ে যাতে আমার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল—বাজির দশ শিলিং আমি হেরেছি। তখনই বাজির টাকাটা দিয়ে আমি তৃতীয় পাত্রটি গলাধঃকরণ করে ফেল্লুম—এতক্ষণ অবধি যে পানীয়টুকু গ্রহণ করতে ভরসা পাইনি। সেই পাত্রেই বাজি মাৎ। কোথায় গেল আমার দুর্দ্দশা, কোথায় গেল শ্রান্তি, কোথায় গেল ভয়। প্রাণী-জগতের অবিসংবাদিত আধিপত্যের হয়ত বা অবসান ঘটেছে এই যে মর্ম্মন্তুদ সংশয় আমার বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল—এ সব যেন অন্তর্দ্ধান করল। সব গেল দূরে, আমি টেবিলের উপরেই গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লাম।

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। লোকগুলো ভালো—তারা আমাকে দোতালায় তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। লাল টালিগুলোর উপর দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা উঠোনে কতকগুলো মুরগী, চারিদিকে লাল ইঁটের দেওয়াল। একটা ছাগল বাঁধা—একটি মেয়ে তাকে খাবার দিতে যাচ্ছে। দূর থেকে গৃহস্থ বাড়ীর সেই সব সনাতন শব্দ শোনা যাচ্ছে, যারা কালের প্রবাহ উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণীজগতের প্রভুত্বের প্রতীকস্বরূপ এই সব শব্দে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। সেই উজ্জ্বল প্রভাতের আলোকে এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় অনুভব করলাম যে মনে হল আমার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার অবসান ঘটেছে।

বলতে পার সব স্বপ্ন; কিন্তু এত বছর ধরে কেউ স্বপ্ন মনে করে রাখতে পারে না। সেই পপ্‌লারটির মানুষের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোন ভীষণ অভিযোগ ছিল, তার কারণও যথেষ্ট ছিল স্বীকার করি।

যদি দৌড়োতাম, তা হলে আমার কি যে করত, ভাবতে পারি না।"

জরকেন্‌স তা ভাবতে চাইলেও না—মহা স্ফূর্ত্তিতে হাত নেড়ে সে ওয়েটারকে সঙ্কেত করলে এমন একটা জিনিষের জন্য যার প্রবাহে স্মৃতি পর্য্যন্ত তলিয়ে যায়।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

কবিতা-গুচ্ছ

মর্ম্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্ত্তিমতী,
গানে যাহা ঝরে ঝরণায়,
সে-বাণী হারায় কেন জ্যোতি,
কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়
মুখের কথায়
সংসারের মাঝে
নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে ?
কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে
পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারিনে "প্রিয়ে
ভালোবাসি" ?
কেন আজ সুরহারা হাসি
যেন সে কুয়াশা মেলা
হেমন্তের বেলা ?

অনন্ত অম্বর
অপ্রয়োজনের সেথা অখণ্ড প্রকাণ্ড অবসর,
তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে
জানাইতে পারে
আপনার কানে কানে কথা।
তপস্বিনী নীরবতা
আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যেপে
অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে
আলোকের নিগূঢ় সঙ্গীতে।

খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে
নাই সেই অসীমের অবসর,
তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,
ক্ষীণসত্য ভাষা তার।
প্রত্যহের অভ্যস্ত কথার
মূল্য যায় ঘুচে,
অর্থ যায় মুছে।

তাই কানে কানে
বলিতে সে নাহি জানে
সহজে প্রকাশি'
"ভালোবাসি"।
আপন হারানো বাণী খুঁজিবারে,
বনস্পতি, আসি তব দ্বারে।
তোমার পল্লবপুঞ্জ শাখাব্যূহভার
অনায়াসে হয়ে পার
আপনার চতুর্দ্দিকে মেলেছে নিস্তব্ধ অবকাশ।
সেথা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস
সূর্য্যোদয় মহিমার পানে
আপনারে মিলাইতে জানে।

অজানা সাগর পার হতে
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে
অনাদি প্রাণের যে বারতা
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,—
তোমার অন্তরতম—
সে-কথা জাগুক প্রাণে মম,—
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি'
"ভালোবাসি"।

তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে ;
বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেরে
অবলুপ্ত করি' দেয় কালহীনতায়।
জন্মান্তর হতে যেন লোকান্তরগত আঁখি চায়
মোর মুখে।
নিষ্কারণ দুখে
পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে
সকল সীমার পারে।
দীর্ঘ অভিসারপথে সঙ্গীতের সুর
তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর।
কোথায় পাথেয় পাবে তার
ক্ষুধা পিপাসার,
এ-সত্যবাণীর তরে তাই সে উদাসী
"ভালোবাসি"।
ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি
আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাথী
এ-আদিম বাণী
করেছিল কানাকানি
গগনে গগনে।
নবসৃষ্টি যুগের লগনে
মহাপ্রাণ সমুদ্রের কূল হতে কূলে
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে
এ-মন্ত্রবচন।
এই বাণী করেছে রচন
সুবর্ণ কিরণ বর্ণে স্বপন-প্রতিমা
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা।
অবসাদ গোধূলির ধূলিজাল তারে
ঢাকিতে কি পারে ?

নিবিড় সংহত করি এ-জন্মের সকল ভাবনা
সকল বেদনা
দিনান্তের অন্ধকারে মম
সন্ধ্যাতারা সম
শেষবাণী উঠুক উদ্ভাসি—
"ভালোবাসি"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা ও কবি

[D. H. Lawrence-এর একটি কবিতার ছায়ায়]

আমি যারে আঁকিয়াছি মোর কবিতায়—
প্রত্যহের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার
বিচিত্র বরণ রাগে,

করিয়াছি রূপায়িত যে মূরতিখানি—
মোর কাব্য-দেউলের সুদুর্গম মণিপীঠতলে
চিরদীপ্তা কলালক্ষ্মী-রূপে আলোকিয়া
যে রয়েছে বিরাজিতা

তোমরা দেখেছ' তারে—তোমাদের চোখে
না জানি কি রূপ তার! কল্পনায় দেখি,
তোমরা পেয়েছ' তার অচঞ্চল আঁখির আভাস,
আকাশের প্রান্তে আঁকা শুকতারকায় ;
সমুদ্র-কল্লোলে,
উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত তরঙ্গ-ফুৎকারে,
মলিন দিগন্ত হ'তে ঝ'রে-পড়া পাংশু চন্দ্রকরে
স্বর্ণাভ অলক তার পেয়েছ' দেখিতে… ;

মর্ম্মরিত পবন-সঞ্চারে
লঘুচ্ছন্দ পদক্ষেপ বাজিয়াছে তার
তোমাদের অন্তঃকর্ণে··· ; ভোরের শিশিরে,
দগ্ধ স্বর্ণ-কণিকায় দিবা অবসানে,
অবনত-পক্বশস্য হেমন্তের পীত দ্বিপ্রহরে,
তার হাসি, তার কান্তি, তার অভিমান
ছড়ায়ে জড়ায়ে আছে···। মোর কাব্য হ'তে
নাহি জানি চুপে-চুপে কবে অতর্কিতে
বাহিরিয়া গিয়াছে সে জগতের মাঝে ;
মোর মর্ম্ম হ'তে,
আহরিয়া নিশিদিন তিল তিল রস,
যে হ'য়েছে রসময়ী, আজ তার সাথে
অনন্ত বিচ্ছেদ মোর—আজ সে সবার !
তোমরা দেখেছ' তারে, হয়ত বা কেহ,
নিভৃত ঘুমের ঘোরে, একান্ত নির্জ্জনে,
তাহারে বেসেছ' ভালো—দিনরজনীর
কর্ম্মক্লান্ত অবসরে তার ছবিখানি,
বার বার ঝলকিয়া উঠিয়াছে তোমাদের চোখে—
তোমরা ভেবেছ' কভু, কখনো কি জাগিয়াছে মনে,
এই যে তরুণী তন্বী লীলা-বধূ মোর ,
এ নয়ক আফ্রোদিতি—
আদিম প্রভাতে,
ওঠেনি এ সমুদ্রের আছন্ত মন্থনে ;
আলুলিত কেশদাম আকাশে ছড়ায়ে,
অপাঙ্গে মদির দৃষ্টি, স্রস্তবাস, ত্রস্ত পদক্ষেপে ;
উত্তাল উদ্দাম সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া এর কটিতটে
মূর্চ্ছিয়া পড়েনি আত্মহারা !
এ নয়ক বিয়াত্রিস্—নেপ্‌লস্ সমুদ্র-উপকূলে

অদৃশ্য বায়ুর মতো সচকিত লঘুশ্বাস ফেলি
ছুটে ছুটে করে নাই চেরী-বনে কুসুম-চয়ন !
পাণ্ডুর দিগন্ততলে ছল ছল কালো আঁখি মেলি,
এ ছিল না কোনদিন অলিন্দে এলায়ে—
রোমিওর প্রতীক্ষায় মুগ্ধা জুলিয়েট্ !
কবির কল্পনা নয়—
আকাশের নীল,
পাখীর কাকলীগান,
অরণ্যের চকিত মর্ম্মর,
কুসুমের কোমলতা, তিল তিল আহরিয়া আনি,
আমি এরে গড়ি নাই তিলোত্তমা করি !
একান্ত বাস্তবী এ যে—
লাজে-ভয়ে, কুণ্ঠিতা ব্যাকুলা,
পদে পদে বেপমতী এ বালিকা বধূ
মোর প্রতিবেশী কোন দীন গৃহস্থের !
ইহারে দেখেছি আমি, বহুদিন বহু অবস্থায় ;
কভু রত গৃহ কাজে, কভু শিশু ক্রোড়ে ;
প্রতিটি ভঙ্গিমা এর—
হাসি-কথা, চরণ-সঞ্চার,
ভূষণ-সিঞ্জন সহ তীক্ষ্ণ দিঠি, স্তন শিহরণ,
সমস্ত দেখেছি আমি।
প্রত্যহের ছোট বড় ঘাত-প্রতিঘাতে,
উৎপীড়িত প্রাণ-পিণ্ড, বিহ্বল ব্যাকুল—
কখন বাসনা এসে লুকায়ে বাঁধিল বাসা তার মর্ম্মমূলে ;
দুর্নিবার অন্তর্দাহে জ্ব'লে জ্ব'লে প্রতি নিশিদিন,
তাহারে দেখেছি আমি—
অসংবৃত লালসা-বিলাসে,
উচ্ছৃঙ্খল কামনা-পীড়নে,

কবিতা লিখেছি আমি।
এই রুক্ষ ধূলিম্লান, যন্ত্রের চক্রান্তভরা মূঢ় মৃত্তিকায়
প্রত্যহের প্রয়োজনে পলে পলে আত্ম-অপমান ;
রক্তপায়ী বর্ব্বরতা স্বর্ণের সভ্য আচ্ছাদনে—
হেথা হ'তে দূরে,
বিজন চেতনা তলে,
আত্মার দুরবগাহ গহন অতলে,
তাহারে ক'রেছি পূজা—তারি ক'টি ফুল
আমার কবিতা বন্ধু… ;
কত বেদনায়,
কত দীর্ণ দুরাশায়, একে একে ফুটেছিল তারা,
তোমরা জান' কি তাহা ?
তোমরা দেখেছ' মোরে নির্ব্বিশেষ রূপে—
আমার আপন সৃষ্ট কল্প-লোক হ'তে
আমারে দিয়েছ' নির্ব্বাসন—
আমি আজ কেহ ন'ই, নাই কোন খানে ;
আমার সৃষ্টির তলে কোথা আমি গিয়েছি তলায়ে
আমি আজ অভিনেতা…… ;
মোর ভূমিকার
সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাসে,
সমুৎসুক সর্ব্বজন ;
শুধু মোর সাথে,
নাহি কারো পরিচয় !
আমার সমস্ত সত্তা নিঙাড়ি দেছি যে কবিতায়,
তার দীপ্তি, তার ভাতি,
বিশ্ব মর্ম্ম-লোকে,
মেলিয়াছে লক্ষ শিখা…শুধু আমি নাই !
নিঃশেষে হারায়ে গেছি কোথা আমি অকূল আঁধারে !

তবে কেন লিখেছি কবিতা,
কার তরে,
কোন্ প্রয়োজনে ?

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জরদ্গব

বৃদ্ধ অশথের শাখা বসন্তে নবীন,
মুঞ্জরণ-বেদনায় হয়েছে অধীর ;
এই দীপ্ত দ্বিপ্রহরে দখিণ সমীর
বুলায় পরশ-সুধা। ছিল অন্তরীণ
যত কচি কিশলয় হ'ল বন্ধহীন,
শুষ্কত্বক্ রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, করি' চৌচির
উদার মুক্তির মাঝে হয়েছে বাহির,
আলোকে পুলকে তারা ফোটে অনুদিন।

দূর হ'তে দেখি আমি তরুণের মেলা,
জরাজীর্ণ অশথের শুষ্ক ডালে ডালে,
মুখর কিরণে তারা করে কলরব,
তালে তালে কি মধুর ঝিকিমিকি খেলা !
বাতাস ছুটিয়া আসি' মোর বক্ষে ভালে
সুধা-স্পর্শ হানি' কয়,—'জাগো জরদ্গব !'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

"নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও"

[La figlia che Piange—T. S. Eliot]

সিঁড়ির পরে সবার চেয়ে উঁচু ধাপে দাঁড়াও,
বাগানের এই টবের কাছে ঘেঁসে,
নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও,
ব্যথিত বিস্ময়ে লহ ফুলের রাশি বুকের কাছে টানি',
ধূলায় তাদের দাও ছড়িয়ে নিমেষ শেষে
দাঁড়াও ফিরে ক্রুদ্ধ চকিৎ চক্ষে তবে বহ্নিশিখা হানি',—
জড়াও তবু রবির আলো, তোমার নিবিড় কেশের জালে জড়াও।

চাহি, কিশোর এম্‌নি করেই ফিরে যাবে,
চাহি, তন্বী এম্‌নি ক'রে দাঁড়িয়ে রবে, ব্যথা পাবে।
কিশোর তবে যেতো চলে,—
যেমন করে আঘাতদীর্ণ জীর্ণ দেহে আত্মা নাহি থাকে,
পূর্ণপাত্র পানের শেষে চিত্ত যেমন দেহভাণ্ড উজাড় করি' মাটির
পরে রাখে।

পেতাম তবে খুঁজে
তারো উপায় এম্‌নি লঘু, এম্‌নি কৌশলে,
মোদের কাছে রহস্যময় অর্থ কোন রইত না তার বাকী,—
হাসির মতন সহজ তবু কপট হ'ত, সম্ভাষণের মতই স্পষ্ট ফাঁকী।

ফিরল বালা আপন পানে, তবু হেমন্তের স্বর্ণালোকে
চিত্ত আমার পূর্ণ করি' রইল অনেকদিন,—
অনেক দিবস, অনেক নিমেষ ভরি' ঃ
কবরী তার লুটায় বাহুর পরে, বাহুতে তার কুসুম-মঞ্জরী।
ভাবি মনে, এমন ছবি কেমন ক'রে লাগ্‌ল চোখে!
ভাবি যদি অদেখা মোর হারিয়ে যেতো দেহের ছন্দ, দেহের যতি!
ভাবা-না-যায় সেই ভাবনায় আজো অধীর নিদ্রাবিহীন
মধ্য রাতের অশান্তি মোর, মধ্য দিনের স্নিগ্ধ পরিণতি!

হুমায়ুন কবির

অননুতপ্ত

জাগরূক বীর্য্যের বিস্ময়ে
ভুবনবিবাগী রথে বাহিরিনু শূন্য দিগ্বিজয়ে
যবে আমি যুগান্তরে অলৌকিক প্রাতে,
সেদিন আমার হাতে
মন্ত্র-অভিষিক্ত অসি করো নাই তুমি সমর্পণ।
আমার জীবন
তাই কি নিষ্ফল হলো তীব্র পরাজয়ে
ঊষর-ধূসর অপচয়ে?

সে-সুদিনে জানিতাম যদি
জ্বালায়ে মঙ্গলদীপ তুমি নিরবধি
সন্ধ্যার তোরণতলে বসে রবে মোর প্রত্যাশায়,
তাহলে কি উদ্ধত অন্যায়
লুটাতো আমার পায়ে নাটনষ্ট কালিয়ের মতো?
কালের তস্করসেনা—পিশাচ প্রমথ—
আমার অলক্ষ্যভেদে করিতো কি সভয়ে বর্জ্জন
স্বল্পপ্রাণ সুন্দরের সরণী নির্জ্জন,
তরুণের তীর্থযাত্রা নিরাপদ হতো কি তাহাতে?

তোমার সতর্ক রাখী যদি মোরে সেদিন পরাতে,
হয়তো তাহলে
মোর দিব্য ঐরাবৎ সংগ্রথিত তৃণের শৃঙ্খলে
করিতো না আজি কালপাত;
মোর বজ্রাঘাত
আঁধির চক্রান্তে প'ড়ে তবে বারম্বার
হারাতো না লক্ষ্য আপনার।
অমৃতের ত্যজ্যপুত্র পরবশ উত্তরাধিকার

আবার কি ফিরে পেতো আপনার গুণে,
আমাদের দেখা হতো যদি কোনো আদিম ফাল্গুনে ?

কি জানি, হয়তো হতো তাই।
অন্তত অমন স্বপ্নে মাঝে মাঝে নিজেরে লুকাই
বিরাট ব্যর্থতা যবে নৈশ ভূকম্পনে
অসংহত ধিক্কার বর্ষণে
উলঙ্গ আত্মারে মোর চায় নিষ্পেষিতে।
স্বয়ম্বরসভামাঝে তুমি যদি মোরে মাল্য দিতে,
তবে—তবে—। কিন্তু থাক সে-নিরর্থ কথা।
কল্পনার কোষাগারে আজিকে যে এসেছে শূন্যতা
শতমুখ দুর্দ্দিনের উৎকোচ জোগাতে।
আর মিথ্যা অনুশোচনাতে
অন্তিম অস্থৈর্য্য মোর চাহিবো না করিতে গোপন ॥

যদি সেই অনবগুণ্ঠন
তোমার অসহ্য লাগে, করিবো না তবু অস্বীকার,
যে-পথে চলেছি আমি, সেই ছিলো অভীষ্ট আমার;
কহিবো না, যত ভুল সে-সবি দৈবাৎ।
আমার অনাদি অমা যদি হয় আবার প্রভাত,
আপনার ভাগ্যনির্ব্বাচনে
শুধু মোর ইচ্ছা যদি মান্য হয় নবীন জীবনে,
তবে আরবার
বরণ করিবো, জানি, এ দৈন্য দুর্ব্বার,
এ-উন্মার্গ নিঃসঙ্গতা, উন্মুখর এই বিসংবাদ,
বিধ্বস্ত রূপের সেবা, অপক্ব প্রমাদ ॥

আজ আমি জানি
বুদ্ধির বন্ধুর পথে অগ্রগামী হানি, অন্ধ হানি ;
তাহার সীমান্তে এসে যারা শান্তি পায়
খালি তাহাদের ঝুলি, পাংশু ধূলি তাহাদের গায়,
পিপাসায় কণ্ঠহারা আমার সমান।
ভগবান
তাহাদের ক্ষমিয়াছে কি না,
আমি তা জানি না।
কিন্তু তারা নিজেদের করেছে মার্জ্জনা,
যত আবর্জ্জনা
পদে পদে তাহাদের দিয়েছিলো বাধা,
ভুলেছে সে-সব তারা, অভিযোগ করেছে সমাধা।
তাহাদের মনে
বহিরাশ্রয়িতা নাই, তাই তারা অনন্ত শয়নে
দাবি করে সুষুপ্তি যে-জোরে,
সে নহে যোগ্যতা যার দুশ্ছেদ্য নিগড়ে
মানবতা মরে অপঘাতে ॥

যদি তোমা সাথে
দেখা হতো সময় থাকিতে,
উন্মুদ্র উষার লগ্নে যদি তুমি আদরে রাখিতে
তোমার বিশ্বস্ত হাত মোর করপুটে
সিদ্ধির অঙ্কুটে
সোনার স্বর্গের দ্বার খুলিতো না তবু,
মোর দুঃস্থ ভবিতব্য অন্য রূপ ধরিতো না কভু।
তাহলেও আজ
ধূমকেতু সম আমি করিতাম নাস্তিতে বিরাজ

অসার্থক অপব্যয়ে স্বরচিত অন্ধকার চিরে ॥
তবু আজ সবিনয়ে ধীরে
তোমার উদাস কানে এইটুকু ব'লে যেতে চাই
আমি নিঃস্ব নিরাশ্রয়, তাই
দানের প্রকৃত মর্ম্ম, নির্ভরের যথার্থ স্বরূপ
কেবল আমারি কাছে পেতে পারে অর্ঘ্য অনুরূপ।
কিছু মোর প্রাপ্য নয়, জানি, তাই শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা
গ্রহীতারে পুণ্য করে, দান করে দাতারে ধন্যতা।
ভবিষ্য রহসে ঢাকা, তুমি আমি জানি না কেহই
কি ঘটিবে বৎসরান্তে। কিন্তু আমি অনুতপ্ত নই
আর অতীতের লাগি, আবশ্যিক উদ্‌ভ্রান্তির তরে।
উচ্চাবচ বক্র পথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে
যে-জীবন তব পদে পেয়েছে বিরতি,
তার অসঙ্গতি
নিশ্চয়ই নিতান্ত বাহ্য, অশ্রুপাত তার ধর্ম্ম নয়।
তাই পুন প্রাক্তন বিস্ময়
জাগিয়াছে মোর মনে,
বিদগ্ধ নয়নে
লাগিয়াছে প্রসাদের সুস্নিগ্ধ কজ্জল;
দ্বেষ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন অপ্রত্যাশী মোর অন্তস্তল
ক্ষমিয়াছে জগতেরে, লভিয়াছে জগতের ক্ষমা,
করিয়াছে আবিষ্কার নবজন্মে সৃষ্টির সুষমা ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

ন্যায়-পরিচয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ-প্রণীত, ২৪শ পরগণা যাদবপুরস্থ বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

এই "ন্যায় পরিচয়ের" প্রণেতা তর্কবাগীশ মহাশয়ের পরিচয় প্রকাশ অনাবশ্যক। তিনি ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্র ও তাহার বাৎস্যায়ন মুনি কৃত সুকঠিন ভাষ্যের বঙ্গ ভাষায় বিস্তৃত অনুবাদ ও বহুবিচারপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বত্র বিদ্বৎসমাজে যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্গের বড় গৌরব নব্যন্যায়ের প্রবল প্রভাবে ক্রমশঃ সর্ব্বত্রই মূল ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের পঠন পাঠনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন ন্যায়ের সম্প্রদায়-লোপে ঐ সমস্ত গ্রন্থের বিশুদ্ধ পুস্তকও ছিল না। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় দীর্ঘ কাল যাবৎ অতি কঠোর পরিশ্রমে বহু প্রাচীন গ্রন্থের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া যে ভাবে বাৎস্যায়নভাষ্যের উদ্ধার পূর্ব্বক বিশদ বঙ্গভাষায় যে ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এখন আর ঐ সুকঠিন ভাষ্যার্থ বুঝিবার কোন অন্তরায় নাই। পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় আর কোন দার্শনিক গ্রন্থের এই ভাবে বহু বিচার পূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যা হয় নাই। আমি জানি, বঙ্গের বাহিরেও বহু স্থানে অন্য দেশীয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিয়াও তর্কবাগীশ মহাশয়ের ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। এবং সর্ব্বত্রই বহু ছাত্র ও অধ্যাপক তর্কবাগীশ মহাশয়ের ঐ গ্রন্থের সাহায্যেই এখন বাৎস্যায়নভাষ্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন। ইহা বঙ্গ ভাষা ও বাঙ্গালীর বড় গৌরবের কথা। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ সেই বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ন্যায়দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভকরা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। দীর্ঘকাল যাবৎ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ঐ রূপ বৃহৎ গ্রন্থ পাঠের সুযোগও সকলের ঘটে না। সুতরাং যাহাতে অল্প সময়ে সহজে ন্যায়দর্শনের মত ও বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়, এমন একখানা গ্রন্থও সরল বঙ্গ ভাষায় রচনা করা অত্যাবশ্যক। বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ সেই উদ্দেশ্যেই সেই কার্য্যে যোগ্যতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়কেই "প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক বৃত্তি" দিয়া তাঁহার দ্বারাই উক্ত "ন্যায় পরিচয়" গ্রন্থ রচনা করাইয়া সম্প্রতি প্রকাশ করাইয়াছেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় এই পুস্তকে যথাসম্ভব সরল ভাষায় ন্যায়দর্শনের মত এবং প্রমাণাদি পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের বিশেষ মত এবং কাশ্মীরের শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের বিশেষ মত প্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত মতেরও সমালোচনা করিয়াছেন। আর তিনি দেখাইয়াছেন যে ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও শৈব সম্প্রদায়বিশেষ ন্যায়সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কোন কোন মতবিশেষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই গৌতমের মতে মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখানুভূতিও সমর্থন করিতেন। কাশ্মীরের ভাসর্ব্বজ্ঞ "ন্যায়সার" গ্রন্থে সেই প্রাচীন মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে, পরবর্ত্তী কালে কোন কোন অদ্বৈতবাদী গ্রন্থকারও কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি দ্বৈতবাদী ঋষিদিগকেও অদ্বৈতবাদী বলিবার জন্য অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রৌত অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবং "ভামতী" টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐরূপ কথা বলেন নাই। কণাদ ও গৌতমকে কোনরূপেই অদ্বৈতবাদী বলাও যায় না। তর্কবাগীশ মহাশয় এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষ বিচার করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত কথা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে ঐ বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকিবে না।

সুপ্রাচীনকাল হইতেই এদেশে নানা দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমে সেই সমস্ত মতের নানারূপে সমর্থন ও উহার বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন দ্বারা সম্প্রদায়-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং সেই সমস্ত মতের প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমে নানা দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বিচার ব্যতীত দার্শনিক গ্রন্থ হয় না। সুতরাং উক্ত গ্রন্থে তর্কবাগীশ মহাশয়ও দার্শনিক পূর্ব্বাচার্য্যগণের চিরন্তন রীতি অনুসারে কণাদ ও গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে অনেক বিচার করিয়াছেন। তিনি দ্বৈত মত সমর্থন করিতেই অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধে অনেক কথাও লিখিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি অনেকস্থলে বৈষ্ণব দার্শনিকগণের অনেক কথাও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সকল কথাও তিনি জানেন। অদ্বৈত মতেও তাঁহার শ্রদ্ধা আছে। তিনি সকল মতেরই সম্মান রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থে যে ভাবে ন্যায়-বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বিষয়ের কাঠিন্য বশতঃ অনেক স্থলে কোন কোন কথা আরও ব্যক্ত করিয়া লিখিলে ভাল হইত। অবশ্য সংক্ষেপের অনুরোধে অনেক কথা লিখিত হয় নাই।

জীবাত্মার দেহাদিভিন্নত্ব নিত্যত্ব ও জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে নানা পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ পূর্ব্বক নানা যুক্তির দ্বারা উহার খণ্ডন ও আস্তিক মতের সমর্থন ন্যায়দর্শনের অধ্যাত্ম অংশে সর্ব্বসম্মত বৈশিষ্ট্য। তর্কবাগীশ মহাশয় এই গ্রন্থে সুন্দর ভাষায় সেই সমস্ত বিচারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবের প্রাক্তন সংস্কারের সমর্থনে তিনি সুন্দর ভাবে আরও বহু কথা লিখিয়াছেন, যাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। এইরূপ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যে জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সাপেক্ষ কর্ত্তা এবং নিত্য মহেশ্বরই বেদের আদি বক্তা বা কর্ত্তা, তাঁহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রমাণ্য, কণাদ ও গৌতম পরতঃ প্রামাণ্যবাদী, ইত্যাদি বহু সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা দার্শনিক চর্চ্চাকারী সকলেরই বিশেষ জ্ঞাতব্য।

এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনোক্ত সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনোক্ত পঞ্চাবয়ব, তর্ক, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা ও হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে অনেক নূতন কথাও আমরা পাইয়াছি। আর এই গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকায় তর্কবাগীশ মহাশয় এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন যাহা ঐতিহাসিকগণেরও অবশ্যপাঠ্য। আমরা তাহাতেও অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। এখনও ভারতের ন্যায়শাস্ত্রে নবদ্বীপের নব্যন্যায়েরই বহুল চর্চ্চা হইতেছে। নব্যন্যায় বাঙ্গালীর এক মহা গৌরব সন্দেহ নাই। কিন্তু মূল ন্যায়সূত্র ও তাহার প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থের চর্চ্চা ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব-পরিজ্ঞান সম্ভব নহে। প্রথমে

ন্যায়দর্শনোক্ত নানা পদার্থে বুৎপত্তি ব্যতীত কোন দর্শনেরই সূক্ষ্ম বিচার বুঝা যায় না। বিশেষতঃ তর্কশাস্ত্রে অধিকার ব্যতীত তর্কের স্বরূপ এবং দোষগুণ ও সদুত্তর অসদুত্তর এবং বিচার-প্রণালী জানা যায় না। ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহারাজীবগণ যে, বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাহাদিগেরও ন্যায়দর্শনোক্ত বহু পদার্থে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। ফল কথা যাঁহারা তর্কশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, অথবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই "ন্যায় পরিচয়" পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে অন্য দর্শনের বহু কথাও আছে। তর্কবাগীশ মহাশয় সংক্ষেপে এই গ্রন্থ লিখিলেও ইহাতে নানা প্রসঙ্গে তিনি বহু কথা লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহাতেও বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া উচিত ছিল। আর ছাপা নির্দ্দোষ হওয়া নিতান্তই উচিত ছিল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে কর্ত্তৃপক্ষ সেবিষয়ে সুব্যবস্থা করিবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

A Modern Yoga—The Riddle of this World—By Sri Aurabindo, published by the Arya Publishing House, College Street Market, Calcutta.

শ্রীঅরবিন্দের কলম থেকে কোন নূতন বই বেরুনো হচ্ছে সাধকজগতে একটা সবচেয়ে বড় ঘটনা; অধ্যাত্ম অনুসন্ধানে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁদের কাছেও তা' তাই। বহুদিনের কথা, যখন অরবিন্দ 'Essays on the Gita' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নিষ্ফল ব্যবহারিক জ্ঞানলিপ্সা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র নিন্দাবাদ প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থে যোগের যে সব ইঙ্গিত ছিল সে সম্বন্ধে অরবিন্দের স্পষ্টতর নির্দ্দেশের জন্য অনেকেই এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল। আলোচ্য গ্রন্থখানি হচ্ছে অরবিন্দের নানা লেখার সংগ্রহ, আর এসব লেখায় অরবিন্দ কতকগুলি প্রশ্ন ও বাধাবিপত্তির বিচার করেছেন। এই প্রশ্ন ও বাধাবিপত্তিগুলি উপস্থিত হয়েছিল বেশীর ভাগ তাদের সাম্‌নে যারা অরবিন্দের আওতায় অধ্যাত্মজীবনযাপনের চেষ্টা করছে। তাই বাইরের পাঠকের উদ্দেশে লেখা অন্য বইয়ের চেয়ে এ বইয়ে সাধনপথের যাত্রীদের বেশী প্রয়োজন আছে।

পাছে কেউ ভুল বোঝে, সেজন্য এখানে বলে রাখা ভাল যে এই বইয়ে যে যোগের কথা রয়েছে তার সঙ্গে আজকালকার ইউরোপীয় 'যোগের' কোন সম্বন্ধ নেই। কারণ আমি শুনেছি বর্ত্তমান ইউরোপে কোন কোন মূর্খদের দলে এক রকম যোগ খুব চল্‌ছে—আর সে যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ, যৌগিক 'তুকতাক' ও স্বাস্থ্য, অর্থ কিংবা ইহলৌকিক সুখের ওপর বিশেষ মনোযোগ ও আসক্তি। এ বইয়ে যে যোগের কথা আছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অধ্যাত্ম-অনুসন্ধান, যা এমন কি যাজ্ঞবল্ক্যের যুগেও 'অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো' হিসাবে পরিচিত ছিল।

ভারতবর্ষে যাঁরা লেখেন তাঁদের ভেতর সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত এমন আর কেউ নেই যোগসম্বন্ধে যাঁর কোন মতামত লোকে বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে, তা'র প্রথম কারণ হচ্ছে—তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে তাঁর সাধনা দীর্ঘ ও কঠোর—সে সাধনা তিনি এখনো চালাচ্ছেন। এ'তে তিনি অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত 'জীবন্মুক্তদের' পন্থা অবলম্বন করেন'নি—কারণ তা'রা সাধনা কিছু সফল হ'তেই তা' ছেড়ে দেয় আর নিজেদের ঈশ্বরপদবাচ্য মনে করে সাধনায় অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না।

বইখানি লেখকের নিজের উপলব্ধি দিয়ে রচিত। যোগের আলোচনা নিয়ে এদেশে বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছে। লোকপ্রিয় সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সকলেও নানা যোগপন্থার কথা এত জোর গলায় বলেছেন যে সাধারণতঃ মনে হয়েছে যে তা'তে তাঁরা ওস্তাদ। কিন্তু যোগের সব প্রাচীন গ্রন্থে যে পরিভাষা আছে আধুনিকভাবে তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া তাঁরা আর কিছু করেননি, যোগের যে সব অবস্থার কথা তাঁরা জোরগলায় প্রচার করেন তার অতি সামান্য মামুলী ধরণের অনুভূতি ছাড়া তাঁদের আর কিছু হয়নি।

এইবার বইয়ের কথায় ফিরে আসা যাক্। যারা লেখকের পূর্ব্বেকার বইগুলির সঙ্গে পরিচিত নয় তাদের বুঝবার জন্য এইটুকু বললেই চল্‌বে যে এই যোগের প্রধান উপায় হচ্ছে পারমার্থিক সত্যে মানব প্রকৃতির আমুল ও সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ। যোগের প্রাচীন উপায়গুলি এ'তে পরিত্যাগ করা হয়নি, বরং এই মূল সমর্পণের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এই মূল সমর্পণই হচ্ছে যেন তা'দের আত্মা, তাই তা'র ভেতর দিয়ে হচ্ছে আমাদের সমস্ত সত্তা, দেহ, চিন্তা ও আত্মার, সমর্পণ। তাই তাপসিক দ্বৈত-মনোভাবের কোন আবশ্যক নেই, আবশ্যক আছে উর্দ্ধে আরোহণের, আর সে আরোহণের শক্তির উৎস হচ্ছে সমগ্র প্রকৃতি। নিজের জীবন সবচেয়ে বড় মনে করবার স্বার্থপর প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে যোগী যৌগিক ক্রিয়ায় নিজের সমস্ত শক্তিকে পবিত্র করেন ও পারমার্থিক সত্যের দ্বারে আরোহণ ও নির্ভরে অবস্থানের জন্য সে সব শক্তিকে নিয়োজিত করেন।

এই অবস্থায় পৌছে যখন অনেক সাধক থেমে যান তখনই যোগের দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হয়। সাধকের যখন আত্মজ্ঞান তিরোহিত হয়, ও উর্দ্ধে আরোহণের পরিমাণমত তিনি পারমার্থিক জ্যোতিঃ ও শক্তিলাভ করেন তখন তিনি পুনরাবর্ত্তন করে সেই জ্যোতি ও শক্তি নিয়ে আধিভৌতিক জগতে ফিরে আসেন। তখন তাঁর ভৌতিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সে প্রকৃতি এই আধিভৌতিক জগতে পারমার্থিক সত্যের প্রকাশের কেন্দ্রীভূত উপায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সাধনার গতি হচ্ছে দ্বিমুখী—ভগবানের দিকে আরোহণ আর ভগবানকে নিয়ে অবরোহণ, স্বর্গরাজ্যে আরোহণ ও আধিভৌতিক জগতে স্বর্গলোক নির্ম্মাণ। পৃথিবীর ধুলা ঝেড়ে ফেলে একক ভগবানের নিকট যাওয়া নয়, পরাবর্ত্তনের চেষ্টা, বা অধ্যাত্ম সত্যের প্রকাশের জন্য পথ ও কেন্দ্র তৈরী করে এই পার্থিব জীবনকে স্বর্গীয় করা। এই অধ্যাত্ম সত্যই হচ্ছে সমস্ত জগতের মূল, কিন্তু স্থূলজগতের তামসিক অকর্ম্মণ্যতা ও মনোজগতের স্বার্থপরায়ণতাই তা'র প্রকাশকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

এই হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের যোগের উদ্দেশ্য। আত্মা, মন ও দেহের পরাবর্ত্তন

চাই। আত্মাকে হোমারের "strengthless heads of the dead"-এর মত ক্ষীণ ও পাণ্ডুর ছায়া করে রাখলে চল্‌বে না। তা'কে সজীব ও দীপ্তিময় হ'তে হ'বে, তা'কে হ'তে হ'বে এমন একটা কেন্দ্র যা' স্বর্গীয় জ্যোতি ও শক্তির সংস্পর্শে গতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে, ও দেহমনের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে। তখন মনকে শুধু বিচার করবার যন্ত্র হিসাবে, ইহজীবনের উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ও নিজের স্বাধীন অবস্থানে মশ্‌গুল হ'য়ে থাকৃলে চল্‌বে না। তখন তা'কে বুঝতে হ'বে যে সে আত্মার দাস, তাই বুঝে তা'কে কার্য্যে অগ্রসর হ'তে হ'বে। আর সে কার্য্য হ'বে সৃজনকারী-শক্তির, যে শক্তি জগৎ ও অরূপ সত্যকে রূপ দেয়।

এমন কি দেহও, যা অনেক সাধকের চোখে ঘৃণ্য ও বর্জ্জনীয়, তাও তখন আর সেণ্ট ফ্রান্সিসের "Brother Ass" থাকে না; যেমনি করে একখণ্ড মর্ম্মর জড় পদার্থ না হয়ে রূপদক্ষের হাতে তার ভাবের দীপ্তিময় প্রকাশে পরিণত হয়, তেমনি করেই সে দেহ তখন হয়ে ওঠে স্বর্গীয় জীবনের নির্দ্বন্দ্ব বাহন।

যতটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তা'তে মনে হয় এই হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের যোগের সার কথা। আরও বিশদভাবে এ যোগের কথা না বল্‌তে পারলেও এটুকু স্পষ্টই বোঝা যাবে যে এর উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র নয়। এ শুধু মুক্তি-লিপ্সা নয়, এর ভেতর রয়েছে একটা মহা চেষ্টা "to remould things nearer to—not the heart's but the divine desire"। তাই যাদের চোখ বস্তুজগতের ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়নি তাদের কাছে এ আদর্শের বিশেষ মূল্য থাকা উচিত।

এতে তথাকথিত জ্ঞানমার্গীদের কোন বিরক্তির কারণ নেই। এ যোগের বিজ্ঞান মিথ্যা নয়, মনস্তত্ত্ব অপ্রচল কিম্বা ভূতত্ত্বও কল্পনার বস্তু নয়। প্রাচীন দর্শনপন্থাগুলি যে মানবজাতির প্রথম অবস্থায় অর্দ্ধস্ফুট উক্তি একথা আমি স্বীকার করতে রাজী নয়। তবে এ কথা বল্‌তে হ'বে যে অনেকেই এখন সেগুলির প্রকৃত অর্থ ভুলে গেছেন, আর প্রাচীনপন্থী টীকাকারেরা বেশীর ভাগই আঁধারের ওপর আলোকপাত না করে আলোকের ওপর আঁধারপাত করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থায় এক নূতন পরিভাষার সৃষ্টি করা হয়েছে—তাতে প্রাচীন সাধকদের চিন্তার ধারার কোন অবহেলা করা হয় নি, অথচ সেগুলি আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত পাঠকের সহজবোধ্য। এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে যদি দ্বিতীয় সংস্করণে একটা পরিশিষ্টে 'vital,' 'psychic,' 'supermind,' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহ'লে বইয়ের মূল্য আরও বেড়ে যাবে। ঐ সব শব্দ ও ঐ জাতীয় অন্যান্য কথা এই বইয়ে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সে অর্থ বুঝবার জন্য বইয়ের ভেতর যে সব ইঙ্গিত রয়েছে তা' অসম্পূর্ণ।

বইয়ের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে এতে যোগের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আদর্শবাদী দর্শনের intellectual concepts বা কাব্যের emotional intuitions-এর মধ্যে যে প্রভেদ তা স্পষ্ট করে ধরে দেওয়া হয়েছে। পারমার্থিক সত্য (Absolute Reality) সম্বন্ধে পণ্ডিতদের দার্শনিক মতবাদ যতটাই idealistic হোক না কেন তাঁদের নিকট তা' শুদ্ধ অনুমানের বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। "It cannot give the decisive experience or the spiritual certitude for which the soul is seeking"।

কবি কখনো কখনো ঐশ্বরিক জ্যোতির আভাস পেয়ে থাকেন কিন্তু তাঁর অনুভূতিগুলিও অত্যন্ত ভাসাভাসা রকমের আর সেগুলি এত শীঘ্র বিলীন হয়ে যায় যে সেগুলিকে কোন প্রয়োজনে লাগান সম্ভবপর হয় না। সেগুলি হ্রদের জলের ভেতরকার গাছের মতন,—সে গাছগুলি অত্যন্ত কোমল, আর সেগুলি যতক্ষণ জলের নীচে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে থাকে ততক্ষণ সেগুলির সৌন্দর্য্য হৃদয়গ্রাহী কিন্তু যেই সেগুলিকে দেখবার জন্য জলের থেকে তুলে নেওয়া যায় তখনি সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে জড়পিণ্ডে পরিণত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে কখনো কখনো সাধক এর চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেন। তখন তাঁর যে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় কবির বা দার্শনিকের তা' হয় না। আর এ স্পষ্ট উপলব্ধি লাভ করতে হ'লে চাই যোগাভ্যাস—সে যোগাভ্যাস করতে হয় পারদর্শী গুরুর সহায়তায়।

বর্ত্তমান শিক্ষার যুগে অনেকে মনে করেন সব কথাই বই পড়লে বোঝা যায়। কিন্তু সত্যই এমন অনেক বিষয় আছে যা' বই পড়লেও বোঝা যায় না—আর যোগ হচ্ছে তা'র ভিতর একটি। যোগ হচ্ছে আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করবার উপায়—তা'র শিক্ষা কোন গুরুর সান্নিধ্য ব্যতীত হয় না। প্রকৃত গুরুর সহায়তা ব্যতীত যখনই কেউ যোগাভ্যাস করতে চেষ্টা করেছেন, তখনই তা' হয় বিফল হয়েছে না হয় আধ্যাত্মিক তুক্‌তাকে পরিণত হয়েছে। তা'তে কোন কোন সাধকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে—আবার কেউ বা উন্মত্ত হয়ে গেছেন। যৌগিক ব্যাপারে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সাধকদের এ সব অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এ পথে যে সব বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয় তা'র আলোচনা এ পুস্তকের "Intermediate Zone" নামক অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে পাঠক বুঝ্‌তে পারবেন যে বর্ত্তমানকালে নানাস্থানে যে সব "অবতার," "জীবন্মুক্ত" ও "দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন গুরুরা" জনসাধারণকে মুক্তিদান করবার জন্য নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান তাঁদের নিজেদেরই মুক্তির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই সব স্বার্থান্বেষী "যোগিদের" প্রাদুর্ভাব হয়েছে বলেই যাঁ'রা কোন বিষয় তলিয়ে দেখ্‌তে চান না তাঁরা এ পথকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেন। কিন্তু বিচার করে দেখ্‌লে বল্‌তেই হ'বে যে যে পথে উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া অগ্রসর হওয়া চলে না সে পথে সবসময়ই শিক্ষার অভাবে এরূপ একদল লোক এসে জুটবেই।

এ বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তা' সাধারণের উপদেশ নয়, তার ভেতর occultismএর মত রোমাঞ্চকর অথবা romantic ব্যাপার নেই আর তা' অস্পষ্টও নয় অসম্পূর্ণও নয়। তাঁর উপদেশ হচ্ছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ। তা'র চেয়ে স্পষ্ট করে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া চলে না—বিশেষতঃ এ হচ্ছে এমন একটা বিষয় যার প্রকৃত বর্ণনা করতে গেলে বল্‌তে হ'বে—"half lights and tempting but often mixed and misleading experiences."

বস্তুতঃ এ পুস্তকে যে চিন্তার ধারা ব্যক্ত হয়েছে তা'তে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা রয়েছে—কারণ তার মূলে রয়েছে সাধকের নিজের সত্যকার উপলব্ধি। অনেকে মনে করেন 'যে যা' কিছু mystical তা অস্পষ্ট হ'তে বাধ্য।' এবং অধ্যাত্ম

বিষয়ে যা' কিছু লেখা তা'র ভেতর থাক্‌বে একটা স্বপ্নের আবছায়া ও একটা আলো-আঁধারি ব্যাপার। আর সে আলোআঁধারি ব্যাপারের মধ্যে যা' কিছু প্রকাশ তা'র চেয়ে লুকানোই থাক্‌বে বেশী। সুতরাং তার ভেতর অসংখ্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাক্‌লেও বিষয়বস্তুর উল্লেখে স্পষ্টতার অভাবের জন্যই উপলব্ধি হয়ে পড়ে বিফল। এ জাতীয় পাঠকেরা এ বই পড়লে বুঝ্‌তে পারবেন যে অধ্যাত্মজীবনের কথাকেও কত স্পষ্ট ভাষায় রূপ দেওয়া যায়। তাঁরা বুঝ্‌তে পারবেন যে যেসব বিষয় পরবর্ত্তীকালের লেখকের হাতে শুধু কদাকার dogmaয় পরিণত হয় তা'র ভাব ও ভাষা বড় বড় সাধকদের লেখায় কত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হ'তে পারে।

বইয়ের শেষ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ নির্ভীকভাবে সৃষ্টির অর্থ নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে এ চিরন্তন প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নয়, সেইজন্য বুদ্ধও তাঁর শিষ্যদের এ নিয়ে আলোচনা করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু যাঁ'রা বুদ্ধের বচন মেনে নীরব থাক্‌তে চান্‌ না তাঁদের সুবিধার জন্য শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের একটি জবাব দিয়েছেন। এ জবাব সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও, এই জ্বালাময় জগতের সীমানার বাইরে যে আনন্দময় জ্যোতি রয়েছে তা'র থেকে কেন এই দুঃখময় জগতের সৃষ্টি চল্‌ছে—যাঁরা সে প্রশ্নের সমাধান খোঁজেন তাঁদের মন এ জবাবে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'বে।

যাহ'ক এই শেষ সমাধানের চিন্তা থেকে এখন শ্রীঅরবিন্দের দ্বিমুখী যোগে ফিরে যাওয়া যাক্‌। এ যোগ আমাদের চিত্তকে যেন নাড়া দিয়ে যায়—মনে এ প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায় যে আমরা স্বার্থপূর্ণ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর থেকে চিরকাল আমাদের বাসনার পেছন পেছন ছুটব, অথবা আমাদের অহঙ্কারকে এমনভাবে বিসর্জ্জন দেব যা'তে যে পারমার্থিক সত্যের বন্ধনে সমস্ত মর্ম্মবাদী ও বস্তুবাদী জগৎ আবদ্ধ সেই সত্যের সঙ্গে তা'কে ফিরিয়ে পাই। এইখানেই হয়ত কেউ ভুল বুঝ্‌তে পারেন। একজন খ্যাতনামা ও সহানুভূতিসম্পন্ন পাশ্চাত্য লেখক লিখেছেন যে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করেন যে—humanity is going to enlarge its domain by the acquisition of a new knowledge, new powers, now capacities which will lead to as great a revolution in human life as did the physical science in the nineteenth century."

কিন্তু এ হচ্ছে সত্যকার যোগকে ভুল বোঝা, এ ভুল ক্ষুদ্র হ'লেও মারাত্মক। যোগ এমন কিছু যন্ত্র বা বেতার নয় যা'তে করে মানবজাতির সম্পদ বা সভ্যতার উন্নতি সাধিত হ'বে। শ্রীঅরবিন্দের সম্প্রদায়ের প্রকাশিত আর এক বইয়ে একথা জোর করেই বলা হয়েছে যে এ যোগ মানবজাতিকে ইহলৌকিক ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য নয়; এ যোগ হচ্ছে পরমার্থ চর্চ্চার জন্য, সুতরাং যিনিই এ যোগ সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে শুধু মানবজাতির কথা বল্‌বেন তিনিই ভুল করবেন—কারণ এ যোগের মূল কথা হচ্ছে পরমার্থ আর মানুষের ভেতর তা'র প্রকাশ। তাই এ ভুলটা বর্ত্তমানকালের humanistএর নিকট সামান্য বা শুধু কথার বাঁধুনী মনে হ'লেও তা' গুরুতর—কারণ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের ক্ষণভঙ্গুর humanist

উন্নতি ও প্রাচীন প্রাচ্যজগতের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মধ্যে এইটুকুই হচ্ছে প্রভেদ। এ'র অর্থ এমন নয় যে সে পাশ্চাত্য উন্নতিকে হেয়জ্ঞান করতে হ'বে। সে সভ্যতার আদর্শ প্রাচ্যদেশের এ যোগ বা অন্য যোগের চেয়ে নিম্ন স্তরের।

শ্রীঅরবিন্দের বইয়ের একটা সামান্য ত্রুটির উল্লেখ না করে পারলাম না। এ ত্রুটি হচ্ছে যে তিনি বৌদ্ধযোগের ন্যায্য বিচার করেন নি। তাঁর বইয়ে এ যোগের দু' একটা উল্লেখ আছে এবং তা'তেও বলা হয়েছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম জগতকে শিখিয়েছে বর্জ্জন ও ইহসংসারের বাইরে যে পারমার্থিক জগৎ আছে তা'র ভেতর নিজের সম্পূর্ণ লয় সাধন করতে। কতকগুলি সম্প্রদায়ের মত এইরূপ হলেও সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্বন্ধেই তা' বলা চলে না। অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন মহাযান সম্প্রদায়গুলি—বা সেগুলির মধ্যে দু'একটি—উচ্চতর আদর্শের বোধিসত্ত্ববাদ প্রচার করেছিল—আর সে বোধিসত্ত্ববাদে অর্হতের নির্ব্বাণের কোন স্থান ছিল না। তাদের মত ছিল যে নির্ব্বাণ ও সংসার একই পরমার্থসত্য আর সেই সত্যের প্রণিধানেই হচ্ছে বোধিজ্ঞান। এই সত্যকেই অশ্বঘোষ বলেছেন 'ভূততথতা'—আর অশ্বঘোষ হচ্ছে বৌদ্ধদার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। অশ্বঘোষ এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে বোধিজ্ঞানের দু'টো দিক্ আছে—যা'কে বলা হয় 'প্রজ্ঞা' ও 'অচিন্ত্য কর্ম্ম'। প্রথমটাকে বলা যেতে পারে একটা centripetal force যা'তে পাওয়া যায় অদ্বৈতজ্ঞান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের অচিন্ত্য ও অপ্রমেয় কর্ম্ম যা'কে বলা যায় centrifugal force আর যা'তে সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধিত হয়।

লঙ্কাবতারসূত্রে বুদ্ধ বলছেন যে অধ্যাত্ম প্রণিধান ও পবিত্রতাই হচ্ছে বুদ্ধত্ব। এই বুদ্ধত্বের জ্যোতি অগ্নিপিণ্ডের মত বিস্ফুরিত হয়। যাঁরা অত্যন্ত দীপ্তিসম্পন্ন মনোজ্ঞ ও সৌভাগ্যবান তাঁরা ত্রিভুবনের পরিবর্ত্তন সাধিত করতে পারেন। কতকগুলি জগৎ এভাবে এখনো পরিবর্ত্তিত হচ্ছে আর কতকগুলির পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। এ কথা মহাযানের কোন অপ্রসিদ্ধ কথা নয়। এ কথা কিভাবে শ্রীঅরবিন্দের যোগের দ্বিধাগতির অনুরূপ তা'র আলোচনা আমি এখানে করব না—কিন্তু এ কথা সত্য যে সংসার থেকে মুক্তি পাওয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের একমাত্র বাণী নয়।

যাঁরা যোগের পথে চল্‌তে চান তা'দের জন্য দু'একটি কথা এখানে অবান্তর হবে না। অরবিন্দের বইয়ে একথা স্পষ্ট করে বলা না থাক্‌লেও বইখানা পড়লেই বোঝা যায় যে, তাঁর প্রদর্শিত পথ প্রাচীন সাধকদের প্রদর্শিত পথ থেকে পৃথক নয়। তাঁর যোগের মূল কথা হচ্ছে "A central sincerity," "a fundamental humility", the ability to do all work in "a spirit of acceptance, discipline and surrender, not with personal demands and conditions but with a vigilant conscious submission to control and guidance, a calm equinanimity and a faith that inspite of our errors and weaknesses and inspite of any immediate appearance of failure the Divine will is leading us, through every circumstance

towards the final Realisation."। পরমার্থের সাহায্যে সমস্ত জগতের পরাবর্ত্তন—সেই পরমার্থ লাভ করবার একান্ত চেষ্টা ও নিজের যা কিছু তা' সেই পরমার্থে উৎসর্গ করবার একান্ত ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে চেষ্টা ও ইচ্ছা এতটা ঐকান্তিক যে ভগবানের লীলায় তা'কে কোন স্থান অধিকার করতে হবে সে চিন্তার তখন আর তার অবকাশ থাকে না।

সত্য কথা বলতে—যোগ ছেলেখেলা নয়, যাঁরা নূতন কিছু খোঁজেন তাঁদের ঔৎসুক্য শান্ত করবার উপায়ও নয়। এ হচ্ছে চিরন্তন অধ্যাত্ম-সাধনার পথ, alchemistদের "Great Work", সমস্ত মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন। একাজ সহজসাধ্য নয়। কারণ প্রকৃতির পরাবর্ত্তন ভগবানের দয়া ব্যতীত সম্ভব না হ'লেও, প্রথম অবস্থায় যা' আয়োজন, পাত্রকে ভগবানের সেই দয়া নেবার জন্য তৈরী করা—সবই নিজের চেষ্টায় করতে হয়।

কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন যে এ যোগ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ না কর্ম্মযোগ। যাঁরা যোগের এসব মার্কা খোঁজেন তাঁদের আমি অনুরোধ করি বইখানা পড়তে। বইখানা পড়লেই তাঁরা তাঁদের প্রশ্নের জবাব পাবেন। বইয়ে একথা স্পষ্টই বলা হয়েছে যে—এপথে যে জ্ঞান লাভ হয় সে জ্ঞান হচ্ছে সেই অদ্বৈত পরমার্থসত্যের। সে হচ্ছে উপনিষদের—সর্বখল্বিদম্ ব্রহ্ম। ভক্তিও সেইখানে কারণ তার জন্য দরকার হয় ভগবানে শাশ্বতপ্রেম ও আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের নবধা ভক্তির চরম কথা। কর্ম্মযোগও সেইখানে কারণ সে জ্ঞানের জন্য দরকার হয় গীতার "কর্ম্মসু কৌশলম্।"

এই সমস্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাইরে সেই অদ্বৈত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিরঞ্জন শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনশীল ভগবান তাঁর চিরন্তন পরিবর্ত্তনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর আঁধার ছায়ার মাঝে নিজে জ্যোতিষ্মান্। সব পথই পথ—আর এ বই হচ্ছে তার আর একটি সাক্ষ্য যে এই আধুনিক বস্তুবাদের জগতেও যাঁদের চলবার সাহস আছে তাঁদের জন্য সেই প্রাচীন বিপদসঙ্কুল পথ খোলা রয়েছে—তেন ধীরা অপিয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিব উর্দ্ধং বিমুক্তা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম (রোনাল্ড্ নিক্সন্)

Recent Poetry 1923--1933, Edited by Alida Monro ; The Poetry Bookshop.

Strange Battalion ;—By Mary Lang ; Dent.

কোনো কবিকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে তাঁহার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ আদ্যন্ত পড়া দরকার। কাব্যযুগ সম্বন্ধেও সেই একই কথা—খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত কবির সহিত পরিচয় না থাকিলে কোনো যুগের স্বরূপ আমাদের নিকট ধরা পড়ে না। এই ধরণের মতামত এমনই সত্য যে মনে হয় ইহাদের প্রতিবাদ চিন্তাতীত। তবুও প্রতিবাদ

প্রয়োজন ; বলা দরকার, ভাবজগতে আদর্শহিসাবে ইহাঁদের মূল্য যতই হোক, সাধারণের ইহাদের প্রসার অনেকাংশে পরিমিত। এক ইংরাজী ভাষাতেই কবি ও কাব্যের সংখ্যা এমন উল্কাবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে যে বেকনের মতো I have taken all Knowledge to be my province বলা দূরে থাক, ইংরাজীর সমস্ত প্রকাশিত কবিতা পড়িয়াছি বলার দুঃসাহসও বোধ হয় কোন পাঠকের নাই। তাই ইংরাজীতে উল্লেখ-যোগ্য কাব্য-চয়নিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য সকলেরই পলগ্রেভের কথা মনে পড়িবে। এমন পাঠকের কথা ভাবা যায়না যিনি ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন অথচ এই বইটির সহায়তায় সমৃদ্ধচিত্ত হন নাই। কে যেন একজন বলিয়াছেন, যদি তাঁহার কোনো নির্জ্জনদ্বীপে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হয়, ও সঙ্গে লইতে দেওয়া হয় মাত্র একখানি বই, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাছিয়া লন পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি। মানিতেই হইবে, ইঁহার মতো কাব্যরসিক যে কোনো দেশে অতি বিরল।

জ্যামিতিতে বলে, অংশ কখনও সমগ্রের সমান হইতে পারে না। এই সূত্রের সাহিত্যিক অনুমান টানিলে দাঁড়ায় এইরূপ, চয়নিকা দিয়া সংগৃহীতার অভাবপূরণ অসম্ভব। কিন্তু কাব্যের উৎকর্ষ ত পরিমাণগত নয়, গুণগত ; তাই জ্যামিতিক সত্যের বিপরীতই কি কাব্য জগতে অধিকতর সত্য নয় ? সেখানে কি একথা বলা চলে না যে অনেক ক্ষেত্রে অংশের মূল্য সমগ্রের চাইতে বেশী ? সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক কবি কি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই যাঁহারা প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে পারেন মাত্র দুয়েকটি রচনার জোরে ? এই সব কবিরা বাঁচিয়া আছেন চয়নিকার কল্যাণে ; কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের সংগৃহীত কাব্যাবলীর বিশালতায় এই ভালো কবিতাগুলি খড়ের গাদায় ছুঁচের মতো হারাইয়া গিয়া অধিকাংশ পাঠকের অপঠিত থাকিয়া যাইত। অনেক বিখ্যাত কবির বিখ্যাত কবিতাও বিখ্যাত হইতে পাইত কি না সন্দেহ, যদি না তাহারা বহু চয়নিকায় বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইত।

কবি বা স্রষ্টার গৌরবে চয়নকর্ত্তার অধিকার নাই বটে—তিনি মাত্র মিড্ল্ম্যান—তবুও তাঁহার স্বার্থের সফল সম্পাদনার জন্য সুষ্ঠু রূপজ্ঞানের প্রয়োজন। রূপজ্ঞানের গোড়ার কথা সীমাবোধ, অর্থাৎ গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন। তাই নিজের রুচি বা খুসীমতো কতকগুলি কবিতা একত্র করিলেই সুন্দর চয়নিকা গড়িয়া ওঠে না। প্রত্যেক চয়নগ্রন্থের থাকা উচিত একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হয় তাহার রূপ। এই রূপের খাতিরে চয়নকর্ত্তাকে অনেক সময় বাদ দিতে হয় এমন কোনো কোনো কবি বা কবিতাকে যাহা হয়ত তাঁহার ব্যক্তিগত রুচির অনুকূল অথচ চয়ন-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পলগ্রেভ এবিষয়ে আজিও পথ-প্রদর্শক রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল "সংস্ এণ্ড লিরিক্স" সংগ্রহ করা। তাই এমন কবিতা তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই যাহা প্রধানতঃ গীতিমূলক নহে। সেজন্য অনেক ভালো কবিতা—আখ্যান বা নাটক জাতীয়—তাঁহার স্বর্ণভাণ্ডার হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অনেক চয়নকর্ত্তা তাঁহাদের উদ্দেশ্যকে অনির্দ্দিষ্ট রকমে বিস্তৃত করিয়া সবধরণের ভালো কবিতাকে একত্র জমাইয়াছেন ; তবুও মনে হয় পলগ্রেভের মহিমাকে খর্ব্ব করিতে পারেন নাই। আর একটি গুণে পলগ্রেভ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার নির্ব্বাচিত কবিতাগুলিকে তিনি সাজাইয়াছেন এমন একটি ভাবক্রম-অবলম্বনে এমন

একটি poetically effective manner-এ, যাহাতে পরস্পর কিরণ সম্পাতে কবিতাগুলির স্বকীয় মর্যাদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুরূহ পথে সম্প্রতি লরেন্স বীনিয়ন ব্যতীত, অপর কেহ তাঁহাকে অনুসরণের চেষ্টাও করিয়াছেন কিনা, আমার জানা নাই।

অন্ততঃ ইংরাজী কবিতার নবতম চয়নগ্রন্থের সম্পাদিকা শ্রীমতী মানরো সে চেষ্টা করেন নাই। তাই বলিয়া এ কথা বলা চলে না এ সম্পাদনার সমস্ত উপযোগিতায় তিনি বঞ্চিত। কারণ তাঁহার ভূমিকার প্রথম বাক্য এইটি—An anthology must have a purpose। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই চয়নিকা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য তাঁহার নামকরণেই প্রকাশ, ১৯২০ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত দশকটির কাব্যরূপের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া। না, ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ...ক্ বিবৃত হইল না। তিনি চান এই যুগের সাম্প্রতিক মূর্ত্তিটি স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে। ফলে, তাঁহাকে বাদ দিতে হইয়াছে অনেক কবিকে যাহারা কালে আধুনিক হইলেও মনে সাম্প্রতিক নহেন ; আর গ্রহণ করিতে হইয়াছে অনেক কবিতাকে যাহা এই দশকে রচিত না হইলেও বর্ত্তমান ভাবধারার উৎসস্বরূপ।

সম্প্রতি লরা রাইডিং ও রবার্ট গ্রেভস্ A Pamphlet against Anthologies নামক পুস্তিকায় কাব্যচয়নকে প্রাণ ভরিয়া ঠুকিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যতম প্রধান আপত্তি এই—চয়নকর্ত্তারা কেবল অতীতের দিকে চাহিয়া থাকেন, যে সব কবি পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠিত, শুধু তাহাদের কবিতাই চয়নিকায় স্থান পায়, আর যাহারা ভাব ভাষা ছন্দ লইয়া নূতন পরীক্ষণ চালাইতেছে, যাহারা সনাতন প্রথা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নবতর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, অভিজ্ঞতা-অনুভূতিকে স্বরূপ নবীনতায় বাণীকায়া দিতে চাহিতেছে, তাহারা একান্তই প্রত্যাখ্যাত হয়। এ অভিযোগ যে একেবারে অমূলক নয় তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ—Georgian Poetry নামক চারিখণ্ড চয়নিকা গ্রন্থ যাহা ১৯১১ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ...রণ, লরেন্স, পাউণ্ড, এলিয়ট প্রভৃতি আজ যাঁহারা মর্য্যাদাবান কবি বলিয়া প্রতিপন্ন, তাঁহাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত এই বইগুলিতে মেলে না। শ্রীমতী মানরো-র "রিসেণ্ট পোয়েট্রী" এডওয়ার্ড মার্শ-এর "জর্জ্জিয়ান পোয়েট্রী"র সংবর্দ্ধনী। শুধু সংবর্দ্ধনী নহে, সংশোধনীও বটে। কারণ মার্শ সাহেব যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা এড়াইয়া চলিয়াছেন শ্রীমতী মানরো। তাঁহার চয়ন-উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই বলিয়া তিনি সাম্প্রতিকতার ছাপকে ...ন না করিয়াও প্রাচীন ও নবীন কবিবৃন্দকে একত্রিত করিতে পারিয়াছেন। একদিকে যেমন আছেন অডেন্, রীড্, বট্রাল্, স্পেণ্ডার, অলডিংটন, ডে লুইস্ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত তরুণ কবিবৃন্দ, অন্যদিকে ডালামার, ইয়েট্স্ সিটওয়েল-ভাইভগিনী ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনেরাও আছেন—কিন্তু আছেন তাঁহাদের আধুনিকতম রূপে, ...জেই তাঁহাদের উপস্থিতি বেসুরা বাজে নাই। মেসফিল্ড, গিবসন প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইয়াছেন, বর্ত্তমানযুগের সহিত তাল রাখিতে পারেন নাই বলিয়া। পাউণ্ড ও লরেন্স ...ন বাদ পড়িলেন স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু এলিয়টের The Hollow Men ও The Love Song of Alfred Prufrock ১৯২৩ এর পূর্ব্বে রচিত হইলেও ...চিত হইয়াছে। The Waste Landকে বাদ দিতে হইয়াছে বোধ হয় স্থানাভাবে। ...নিস্ নাই বটে, তবে প্যামেলা ট্রাভারস্ ও রূথ পিটার আছেন। এইরূপে

সাঁইত্রিশটি কবির কাব্যভাণ্ডার অন্বেষণের ফলে শ্রীমতী মানরোর চয়নিকা ইংরাজী কাব্যের আধুনিকতম বিকাশের প্রতিভূকল্প হইয়া উঠিয়াছে। কোনো চয়নিকাই সর্ব্বরুচিসম্মত হইতে পারে না, তাঁহার এটিও হইবে না। এটুকু নিশ্চিত, অনেক কাব্যসন্ধানী পাঠকের কৃতজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিবেন।

বইখানি আগাগোড়া পড়িবার পর আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে মনে যে অনুভূতি জাগিয়া ওঠে তাহাতে আনন্দ অপেক্ষা চমকই বেশী। ভাবব্যঞ্জনা, বচনভঙ্গী, ছন্দচালনা, ছেদবিভাগ ও পংক্তি-বিন্যাসের উদ্ভট দুঃসাহসিকতায় যত রকমে পাঠককে তাক লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহাতে কোনটি বোধ হয় এই কবিদের চোখ এড়ায় নাই। কবিতার একটি সঙ্গত অর্থ থাকা চাই। এই প্রাচীন ধারণাটিকে ইঁহারা অবজ্ঞা-ভরে অবহেলা করেন। তাই অনেকস্থলে অর্থের অভাবে অনর্থ আপনাকে জাহির করিয়াছে কাংস্যকণ্ঠ উচ্চরবে! ইঁহাদের চরম গৌরব দুর্ব্বোধ্যতায়—যেন পাঠকে বুঝিতে পারিলে ইঁহাদের জাতি যাইবে। মাঝে মাঝে এক একটি লাইনে বা স্তবকে, এক একটি উপমানে বা তক্ষণায় ইঁহাদের ক্ষমতার বিশেষত্ব ও কল্পনার স্বকীয়ত্ব বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো দীপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘন তমিস্রা, দুষ্ট সরস্বতীর বিকৃত মায়া। দুর্ব্বোধ্যতার এ অভিযোগ কেবল আমার মতো বিদেশী পাঠকের মনে উদিত হইলে তাহার কোন মূল্য থাকিত না। কিন্তু এ প্রশ্ন যে ওদেশের সুধী পাঠকমণ্ডলীকেও বিচলিত করিতেছে। অবশ্য কবিদের স্বপক্ষের ব্যাখ্যাকর্ত্তারও অভাব নাই। কী যে সাহিত্যিক কুরুক্ষেত্রের আয়োজন হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, ইষ্টম্যান, এলিয়ট, রিচার্ডস্, লীভিস্, স্প্যারো, রবার্ট্স্, ষ্টোনিয়ের, ইত্যাদির অস্ত্র সঞ্চালনের সংবাদ রাখিলে; পরস্পরের প্রতি ঘাত-প্রতিঘাতে ইঁহাদের কাহারো লেখনী হইয়া উঠিয়াছে বিস্তার ভারে নদীর মতো, কাহারো বা বিষতিক্ত ব্যঙ্গের প্রয়োগে ছুরিকার মতো তীক্ষ্ণমুখ। এই মসীযুদ্ধ সহজে নিবৃত্ত হইবে, এ আশা করা বৃথা। কারণ, কবিতার উৎকর্ষের সংজ্ঞা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই, কোনোদিন হইবে কি না সন্দেহ। তবে যে ধারা আজ ইংরাজী সাহিত্যে চলিতেছে তাহা যদি আরও কিছুকাল বজায় থাকে তাহা হইলে শুধু সাধারণ বিদ্যা ও সহজ রসবোধ সম্বল করিয়া আর কবিতা পড়া চলিবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতো আধুনিক কবিতা হইয়া উঠিবে অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাঠকের সম্পত্তি, ও আজকাল আমরা যেমন বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা পড়িয়াই তুষ্ট হই, তখন কবিতার পরিবর্ত্তে সমালোচকের আলোচনা পড়িয়াই তুষ্ট থাকিতে হইবে। এ সম্ভাবনায় আমার মন ত্রস্ত হইয়া উঠে; কিন্তু ভরসা পায় এই ভাবিয়া "রিসেণ্ট পোয়েট্রি"র মত সাম্প্রতিক চয়নিকাতেও এমন কয়েকটি কবিতা আছে—যদিচ তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প—যাহা পড়িয়া সে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারে, সমগ্রতার উপলব্ধির আবেগে। উদাহরণতঃ দুটি কবিতা তুলিয়া দেওয়া গেল।

১। Tempt me no more ; for I
Have known the lightning's hour
The poet's inward pride,
The certainty of power.

Bayonets are closing round,
I shrink ; yet I must wring
A living from despair
And out of steel a song.

Though song, though breath be short,
I'll share not the disgrace
Of those that run away
Or never left the base.

Comrades, my tongue can speak
No comfortable words,
Calls to a forlorn hope,
Gives work and not rewards.

Oh keep the sickle sharp
And follow still the plough ;
Others may reach, though some
See not the winter through.

Father, who endest all,
Pity our broken sleep ;
For we lie down with tears
And waken but to weep.

And if our blood alone
Will melt this iron earth,
Take it. It is well spent
Easing a saviour's birth.

—Cecil Day Lewis.

২। Fin De Fete

Sweetheart, for such a day
One mustn't grudge the score ;
Here, then, it's all to pay,
It's Good-night at the door.

Good-night and good dreams to you,
Do you remember the picture-book
thieves

Who left two children sleeping in a
wood the long night through,
And how the birds came down and
covered them with leaves ?

So you and I should have slept, but
now,
Oh, what a lonely head !
With just the shadow of a waving
bough
In the moonlight over your bed.

—Charlotte Mew

শ্রীমতী মানরো তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—this particular collection, not strictly an anthology। অতি প্রচলনের ফলে কথাটার অর্থের এমনই অধোগতি হইয়াছে যে যে-কোন collectionকে anthology না বলিতে পারার কারণ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। বোধহয় শ্রীমতীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছিল উহার মৌল গ্রীক অর্থ (anthost legeia=পুষ্পচয়ন) যে অর্থে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে মাডারাদেশীয় মিলিয়েগার সুবিখ্যাত গ্রীক অ্যান্থোলজি প্রণয়নের মুখবন্ধে প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। মিলিয়েগার বলিতেছেন :—

Beloved Muse, to whom do you bear this many-blossoming song? And who wove this flower-crown of poets? Meleager wrought it and made it perfect as a gift for remembrance to lovely Diocles, weaving into it many lilies of Anyte and many white lilies of Moero, and Sappho's few, but all roses, the narcissus of Melanippides heavy with song and the young vine shoot of Simonides, * * * * Now I bring this gift to my friends, for this sweet speaking garland of the Muses is for all who love the beauty of poetry.

(Aldington কৃত অনুবাদ)

নিজের গ্রন্থকে অ্যান্থোলজি বলিতে শ্রীমতী মানরোর এ সঙ্কোচ কেন? তবে কি তাঁহার ধারণা যে তাঁহার মাল্যগ্রন্থে আছে এমন অনেক কবিতা যাঁহারা প্রকৃত পুষ্প নহে? তাহারা কি তবে বর্ণে গন্ধে উগ্র কাগজের ফুল, প্রাকৃত সৃষ্টির স্নিগ্ধ অথচ শাশ্বত প্রকাশ হইতে বঞ্চিত?

শ্রীমতী মেরী ল্যাং বোধ হয় ইংলণ্ডের তরুণতম কবি। তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের মলাটে লেখা আছে তিনি আজও কুড়ির কোঠায় পৌছান নাই। অধিকাংশ কবিতা সতেরো বছরের আগের লেখা। এ সংবাদে স্তব্ধ হইতে হয়, কারণ

কবিতা পড়িয়া ইহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কোথাও ছেলেমানুষির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অনুভূতির গাম্ভীর্য্যে, প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতায় বয়স্ক পরিণত মনেরই পরিচয় মেলে। ইঁহার কবিতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার সময় আজিও আসে নাই। আমাদের দেশের সপ্তদশী কবিযশঃপ্রার্থিনীরা কম নহেন বলিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদের অবগতির জন্য তিনটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

(১) To Rain

O much abused inland of sodden skies,
I cannot hate the weary sullen sound
Of dripping, and the sight of spongy ground,
Because I see your face with other eyes ;
The eyes of retrospection. I am wise
In memories, and memories abound
Of a brown land, with parched and gasping
ground,
And burning, merciless and stark sunrise.
And I was waiting, looking on the land,
The barren paddocks, worn and brown and sere,
Waiting for you, the while the scalding hand
Of drought gripped all the land and me ; and fear
Supplanted hope, till suddenly in grand
Abundance you came, Rain, life-bringer clear.

(২) To—, At Evening

Across the scattered remnants of a day
I see your face in chiselled beauty clear ;
I see your level eyes, O thou most dear.
O thou most wonderful ; not turned away,
Nor cold as chiselled eyes, but steadfast grey,
And living blue, and changing green ; I hear
Your voice, as soft as when it soothed my ear
At dawn, and you outshone the sun's first ray.
Still is the tumult of each laden hour
Subordinate unto your face and voice ;
Yours is the vital image that doth tower
Triumphant in my heart ; I have no choice.
Would I forget you if I had the power ?
That power's denied me, I can but rejoice.

(৩) Realization.

So swift the flash, I thought that I had dreamed
One spaceless second on the crest of time,
Yet through the ragged veils, chill cities gleamed
And cold and sparkling pinnacled ; sublime,
As yet unseen, with places desolate
And towers fire-new, and wide-flung entrance gate.
All this beyond, yet swifter far than light,
And sharp as stars ; as stars so crystal pure.
And then a wind blew bleak, vanguard of night,
Dark leaned across the purple sweep of moor.
So swift the flash, I thought that I had dreamed.
Yet through the ragged veils, chill cities gleamed.

উৎসর্গপত্রে তরুণী কবি শেকসপিয়ারের 'টুয়েলফ্থ নাইট' হইতে বিনয় করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—"what's to come is still unsure," বিনয় সর্ব্বদাই শোভন; তারুণ্যে বিনয় শোভনতর ; শক্তিমান তারুণ্যের সহিত বিনয়ের সংযোগ শোভনতম। আশা করা যাক, এই বিনয়ই শ্রীমতী মেরী ল্যাংকে বর্ত্তমানের হাততালি ও যশোলিপ্সা অতিক্রম করাইয়া সমৃদ্ধতর কাব্যপ্রকাশের সহায় হইবে। যদি তাহা না হয়, যদি প্রতিভার উন্মেষ ভবিষ্যতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে রসপিপাসু পাঠকের দুঃখের কারণ ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

New Introductory Lecture on Psycho Analysis—
by Sigmund Freud.
Modern Man in search of a Soul by C. I. Jung.

ফ্রয়েড সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হয়েছে যে আলোচনার বাড়াবাড়িতে ফ্রয়েডের নিজের কথা অনেক জায়গায়ই চাপা পড়ে যায়। কান্ট্ এবং হেগেলের তুলনামূলক সমালোচনায় একজন দার্শনিক বলেছেন যে কান্টের মতামত কঠিন বলে যে জনপ্রিয় হয়নি, তা নয়, কারণ তাহলে তো হেগেলের মতামতেরও বাজারে কোন চলতি থাকত না। অথচ কথায় কথায় আমরা হেগেলের মতের কথা শুনতে পাই—সমস্ত প্রশ্নেরই যে দুইটি দিক আছে, অথবা বাড়াবাড়ি করলে তার ফলে পস্তাতে হবে এ সমস্ত কথাও তাই হেগেলীয় মতবাদ বলে পরিচিত। সহজ বলে হেগেল জনপ্রিয় হননি—তাঁর মতামতকে অতি সহজে বিকৃত করা চলে বলেই হেগেলের এত আদর।

ফ্রয়েডের বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে। ফ্রয়েডের নামে যারা কথায় কথায় কসম খায়, তারা সবাই যে ফ্রয়েডের মতামত জানে, একথা মনে করবার বিশেষ কোন কারণ নেই। তাই যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আঘাতে আমরা অনেক সময় শিউরে উঠি, একটু সাবধান হয়ে খোঁজ করলেই দেখা যাবে যে ফ্রয়েড হয়তো স্বপ্নেও কোনদিন তেমন কথা বলেন নাই।

ফ্রয়েডের বিশেষত্ব এই যে মানুষের মনের যে দিকগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ তিনি আসবার আগে অত্যন্ত কম ছিল। তার মানে এ নয় যে আমরা সে সব বিষয়ে কিছুই জানতাম না। ফ্রয়েডের বহুযুগ পূর্ব্বে লাইবনিট্জ্ দেখিয়ে গিয়েছেন যে আমাদের সজাগ মন আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। সে সজাগ মনের পিছনে রয়েছে অচেতন মনোবৃত্তি, কিন্তু জীবনে তাদেরও প্রভাব কম নয়। এই অচেতন ও অর্দ্ধচেতন মনোরাজ্যকে কান্ট্ও স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সে গোধূলিআলোর দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেও তাঁরা তার বিষয় আর বেশী কোন কথা বলতে পারেন নি। এই অচেতন ও অর্দ্ধচেতন রাজ্য আবিষ্কারেই ফ্রয়েডের প্রধান কৃতিত্ব।

আমরা প্রত্যেকেই প্রতি রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখি—বেশীর ভাগ স্বপ্নই মনে থাকে না, কিন্তু মাঝে মাঝে দুয়েকটি স্বপ্ন মনকে এমন নাড়া দিয়ে যায় যে তাদের কথা ভোলা যায় না। ফ্রয়েড ছিলেন চিকিৎসক—তাঁর রোগীদের এই সমস্ত স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে গিয়ে তাঁর মনে হ'ল যে এ সমস্ত স্বপ্ন আমাদের অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনার রাজ্যের। তাই নিয়ে আলোচনা করে তিনি দেখলেন যে সত্যই তাই। অর্দ্ধচেতন ও অচেতন মনকে আমরা বহুদিন স্বীকার করে এসেছি, সজাগ চেতনার উপর তার প্রভাবও স্বীকার করেছি, কিন্তু চেতনার বাইরে ছিল বলে এতদিন তাদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় নি। স্বপ্নের সঙ্গে তাদের নিগূঢ় যোগ আছে একথা স্বীকার করলে চেতনার পিছনকার এ মনোরাজ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার মেলে—স্বপ্নের অর্থ খুঁজে খুঁজে আমরা তাতে মনের এই সমস্ত গোপন কক্ষের পরিচয় পাই।

ফ্রয়েড চিকিৎসক—রোগীমন নিয়েই প্রধানতঃ তাঁর কারবার, তাই রোগীর স্বপ্ন-আলোচনার ফলে তাঁর ধারণা হল যে মানুষের অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে পরিপূর্ণ। চেতন জীবনে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান না করতে পারলে এক মুহূর্ত্তও বাঁচা চলে না; প্রয়োজনের খাতিরে যেমন করেই হোক, গোঁজামিল দিয়েও তার কোন একটা সমাধান খাড়া করতে হয়, তাই সজাগ জীবনে আমরা এ সমস্ত দ্বন্দ্বের পরিচয় পাইনে—কিন্তু জীবনধারণের প্রয়োজনের সঙ্গে অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনার সম্বন্ধ গৌণ বলে সেখানে এ দ্বন্দ্ব লুকোবার কোন দরকার নেই—সেখানেই আমরা মানুষের প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাই।

ফ্রয়েডের অভিজ্ঞতায় এ সমস্ত দ্বন্দ্বের বেশীর ভাগই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে—তাদের সেক্সজীবনকে কেন্দ্র ক'রে। তাই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে মানবজীবনের এই দিকেই ঝোঁক পড়ে, কিন্তু তাই বলে ফ্রয়েড নিজে কোনদিন এমন কথা বলেননি যে সমস্ত স্বপ্নেই সেক্স রয়েছে, অথবা সেক্স ছাড়া মানুষের জীবনে আর কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।

ফ্রয়েডের মতে সমস্ত স্বপ্নেরই কারণ কোন একটি মানসিক দ্বন্দ্ব। স্বপ্নের মধ্য

দিয়ে আমরা সে দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চাই, কিন্তু যেখানেই দ্বন্দ্ব, সেখানেই তার সঙ্গে অতৃপ্তি এবং ক্ষোভ অথবা কোন কোন সময় তীব্র দুঃখ জড়িত রয়েছে। যা কষ্টকর তাকে আমরা এড়িয়ে চলি, কাজেই স্বপ্নে দ্বন্দ্ব নিজের মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় না, তাকে প্রকাশের জন্য সিম্বল বা প্রতীকের আমরা ব্যবহার করি। কাজেই স্বপ্নে আমরা যা দেখি, তা কেবল স্বপ্নের বাহিরকার ছায়া, এর ভেতরকার অর্থ রয়েছে লুকোনো, তাকে জানতে হলে এ সমস্ত প্রতীকের অর্থ জানা চাই, প্রতীক দিয়ে স্বপ্নকে বুঝে তখন আমরা তার প্রকৃত মর্ম্ম জানব।

ফ্রয়েডের বিবরণে দুটি বিষয় দ্রষ্টব্য। প্রতীক স্বীকার করায় আমাদের সমস্ত স্বপ্ন রূপক হয়ে দাঁড়ায়, তার ফলে স্বপ্নের বিশ্লেষণ ও অর্থবোধ হয় মনস্তাত্ত্বিকের প্রধান কাজ। অন্যপক্ষে ফ্রয়েড সুখবাদকে আমাদের জীবনের ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছেন, কারণ বাস্তবের দুঃখকে এড়াবার জন্যই স্বপ্নে প্রতীকের ব্যবহার।

ফ্রয়েডের এককালীন শিষ্য ইয়ুঙ্গের মতে ঐ দুটি কথাই ভুল। কোন কোন স্বপ্ন রূপক হ'তে পারে; কিন্তু তাই বলে সমস্ত স্বপ্নই যে রূপক হবে এমন কোন কথা নেই। প্রতীকের ব্যবহারও অনেক সময় হয়তো হয়, কিন্তু তাই বলে প্রতীকের অর্থ সম্বন্ধে ফ্রয়েড যেমন নিঃসন্দেহ, তার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। কতকগুলি প্রতীক হয়তো মানুষের অতি প্রাচীন জীবন থেকে চলে এসেছে, কিন্তু দেশকালপাত্রভেদে তাদেরও যে বদল হয় নি, সেকথা জোর ক'রে বলা চলে না। অন্যপক্ষে অনেক স্বপ্নকে রূপক বলে অর্থ করা যায় না। আমাদের অতীত বা ভবিষ্যৎ অনেক সময় স্বপ্নে ধরা পড়ে, তার কারণ এই যে সচেতন মনের পেছনে যে মন অচেতন ও অর্দ্ধচেতন, তাদের স্বরূপ সেখানে প্রকাশ পায়। তার জন্য কোন রূপক অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নেই। স্বপ্নে অনেক সময়ে আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় পাই, সজাগ অবস্থায় এ পরিচয় আমরা অস্বীকার করি—স্বীকার করলেও সে স্বীকৃতি সহজ নয়। স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড জিজ্ঞাসা করেন, "এ স্বপ্নের কারণ কি? যে স্বপ্ন দেখল, তার অতীতে এমন কি ঘটনা আছে যার ফলে সে ঐ স্বপ্ন দেখল?" ইয়ুঙ্গ এ ধরণের প্রশ্নের সার্থকতা স্বীকার করেও বলেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে কারণ জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। তার বদলে জিজ্ঞেস করতে হবে "স্বপ্নের সার্থকতা কি? এ স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এখনকার কোন্ কথা প্রকাশ পাচ্ছে, কি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হচ্ছে?" প্রশ্ন দুটি পরস্পর সাপেক্ষ, কিন্তু তবু তাদের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য রয়েছে।

ফ্রয়েডের সুখবাদও তাই ইয়ুঙ্গ স্বীকার করেন না। মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই মানবজীবনের লক্ষ্য, তাতে যে সব সময়েই সুখ মেলে তা নয়। সুখ না মিললেও তাতে তৃপ্তি আছে, এবং এই গভীর তৃপ্তির জন্যই মানুষ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। ফ্রয়েডও আজকাল একথা স্বীকার করেন, কিন্তু এ স্বীকৃতির সঙ্গে যে তাঁর পূর্ব্বের মতামতের অনেকখানি সংশোধন দরকার, সেকথা এখনো তাঁর চোখে পড়েনি।

ফ্রয়েডের আধুনিক মত আর একদিক থেকেও খানিকটা বদলিয়েছে। মানুষের ধর্ম্মজীবনকে তিনি মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও তার সমাধানের দিক থেকে আগে দেখতেন—তাঁর চোখে তাই ধর্ম্মজীবনের কোন বিশেষ সার্থকতা ছিল না, এবং ধর্ম্মজীবনের অবসান তিনি আনন্দে প্রত্যাশা করেছেন। ইয়ুঙ্গও মানুষের স্বপ্নজীবনের সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের

সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে স্বপ্ন কেবলমাত্র রূপক নয়, মানব মনের বিশিষ্ট দিকের সত্য পরিচয়। ধর্ম্মকেও তাই তিনি মানবচিত্তের সত্য প্রকাশ বলে মনে করেন, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সমস্ত অনুষ্ঠান আচার এবং কাহিনীকে ফ্রয়েড কেবলমাত্র রূপক-মোহ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ইয়ুঙ্গ মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে তাদের স্থান মেনে নিয়েছেন। ফ্রয়েডের চোখে ধর্ম্ম কেবলমাত্র প্রতীক, তার পেছনে যে সত্য, তা আমাদের স্বভাবজাত বিভিন্ন বৃত্তির দ্বন্দ্ব ও মিলনের মধ্যে মেলে। ইয়ুঙ্গের কাছে ধর্ম্মের নিজের সত্তা আছে, এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির মতন ধর্ম্মান্বেষণও সত্য।

ফ্রয়েডের বিবরণে মানুষের সমাজজীবন অপরিস্ফুট। প্রত্যেকে নিজের নিজের সুখের অন্বেষণে বিভিন্ন বৃত্তির ঘাত প্রতিঘাতে জীবন কাটায়, কাজেই প্রত্যেকের জীবনের মধ্যেই অস্থির চক্রাবর্ত্ত রয়েছে। এমনই অস্থির ব্যক্তি বিশেষদের নিয়ে সমাজ, কাজেই তার স্থিতি আরো সহজে ভেঙ্গে পড়ে। অথচ সমাজজীবনের স্থিতিশীলতাই প্রথম আমাদের চোখে পড়ে। কেবলমাত্র চেতনা অচেতনা ও অর্দ্ধচেতনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজধর্ম্মের বিবরণ দেওয়া যায় না, তাই ফ্রয়েড এখন চেতনা অচেতনা এবং অর্দ্ধ চেতনা ছাড়াও ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক স্বীকার করেন—তার নাম তিনি দিয়েছেন super consciousness বা ঊর্দ্ধ চেতনা। ফ্রয়েডের পূর্ব্বেকার বিবরণে মানুষের জীবনে বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্য পরিষ্কার হয়নি, censor বা বিচারক যাকে তিনি বলেছেন, তার প্রকৃতি ও সম্বন্ধ দুইই হেঁয়ালীতে ভরা ছিল। বিভিন্নবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাতের রঙ্গভূমি, এই যদি মানুষের সত্য পরিচয় হয়, তবে মানুষের চরিত্রে বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্যের কোন কথাই ওঠে না। মানুষের চরিত্রে বিচারক বলে কোন বৃত্তির সন্ধান মেলে না, তাই এই বিচারককে টেনে আনায় আমাদের বোঝবার কোন সুবিধা তো হয়ই না, বরং দুর্ব্বোধ্যতা বেড়েই চলে। মানব চরিত্রের মধ্যেই ঊর্দ্ধ চেতনাকে স্বীকার করায় বিচারক আমাদেরই স্বভাবজাত বলে আমরা জানি। তার ফলে সমাজধর্ম্ম—ব্যক্তিধর্ম্মের বিবাদও সহজ হয়ে আসে এবং মানুষের জীবনে সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক জীবনের ঐক্য ও পরিণতি বোঝবার দিক থেকেও এ নূতন বিবরণ আগেকার বিবরণের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

এ বিবরণ মেনে নিতে ইয়ুঙ্গের কোন আপত্তি নেই। ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের হিসেব করে, বয়স অনুসারে তার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে, তিনি তাকে সুস্পষ্ট ও ফলবান করতে চেয়েছেন। সে সম্বন্ধে আজ আর আলোচনা সম্ভব নয়; কিন্তু একথা বোধ হয় বলা চলে যে ফ্রয়েডের মতামত মেনে নিয়ে ইয়ুঙ্গ তার উপর যে কারিগরী করেছেন তাতে আমাদের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অনেক বেড়েছে। অসুস্থ পীড়িত মনের আলোচনার বাইরেও তিনি মনবিশ্লেষণ বিদ্যাকে নিয়ে এসেছেন—এইখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ্গ দুজনেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দুজনেই সুলেখক; এবং তথ্য ও রচনার ঐশ্বর্য্যে দুখানি বইই সমৃদ্ধ। সমালোচনায় কোন বড় লেখকেরই লেখার পরিচয় দেওয়া যায় না, এখানেও তাই হয়েছে। যাঁরা ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ্গের মতামত সঠিকভাবে জানতে চান, ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ্গের বই পড়া ছাড়া তাঁদের আর কোন উপায় নেই।

হুমায়ুন কবির

So a Poor Ghost—By Edward Thompson (Macmillan)

আজকাল ভারতের দিকে ইংরেজ সাহিত্যিকদের বেশ একটু নজর পড়েছে। এর জন্য আমাদের ধন্যবাদ দিতে হবে—অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং গোল টেবিল বৈঠককে। ভারত স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত কিনা, ভারতবাসীদের কতটা শাসনাধিকার দেওয়া যেতে পারে—এসব বিষয়ে বিলেতে মতভেদ উপস্থিত হয়েছে, আর যেখানে মতভেদ, সেখানেই যে বিষয়টি নিয়ে মতভেদ সেটাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখবার স্পৃহা স্বাভাবিক। ভারতবাসীকে নিয়েই যত গোল, কাজেই ইংরেজী সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে, ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজ পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারত ও ভারতীয় সমস্যা যে ইংরেজ সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে আলোচ্য বইখানি তার একটি নিদর্শন। এখানি একখানি উপন্যাস। নায়ক হচ্ছেন Rattray নামে একজন ইংরেজ সাংবাদিক। আগে তিনি ভারতে শিক্ষা-বিভাগে কাজ করতেন—একজন I. E. S.এর লোক ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে যোগদান করেন এবং যুদ্ধের শেষে আবার ভারতে ফিরে আসেন। হৃদয়টা তাঁর ছিল অতি মহৎ ও উদার। এক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জায়গায় সাহায্যের ব্যবস্থা নিয়ে ঝগড়ার ফলে তিনি ছাড়েন চাকুরী। তার পর থেকে বিলেতেই কাগজে লিখে তিনি তাঁর জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। একজন দেশীয় রাজার আমন্ত্রণেই তিনি তাঁর শিক্ষা-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়ে ভারতে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এলেন—দেশীয় রাজ্যের প্রজা ও রাজার যাতে উন্নতি হয় এমন অনেক মতলব নিয়ে। কিন্তু তাঁর কল্পনাগুলি বাস্তবে পরিণত হ'বার কোন অবসর পেলেনা। শিক্ষা-বিভাগের যখন তিনি চাকুরী করতেন, তখন থেকেই তাঁর উপরে এখানকার শাসন-কর্ত্তাদের নজর পড়েছিল। রায়ালগড় কলেজের তিনি ছিলেন একজন অধ্যাপক, কিন্তু তিনি রায়ালগড়ের নাবালক রাজারও প্রাইভেট্-টিউটর-গিরি করতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ তিনি তাঁর ছাত্রের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন, যা বড় কর্ত্তাদের কাছে মোটেই ভাল মনে হ'ল না। তাঁকে বলা হ'ল —যে তাঁর কাজ হচ্ছে Shakespeare, Macaulay ব্যাখ্যা করা, অন্য বড় বড় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁর পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা।' এতে তিনি দমে গেলেন না, বরং মুখের মত জবাব দিলেন। তার পর তিনি যে ঘটনা সম্পর্কে এবং যেমন ভাবে চাকুরী ছেড়ে চ'লে যান তাতেও দিল্লীর কর্ত্তারা তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হতে পারেন নি। তা ছাড়া তিনি বিলেতে এমন সব কাগজে লিখতেন, যা এখানকার কর্ত্তাদের মতে ছিল "Bolshy papers"। এমন একজন লোক কোন দেশীয় রাজার শিক্ষা-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হ'বে, তা কি কখনও সার্ব্বভৌম শক্তি বরদাস্ত করতে পারেন? এমন কলকাঠি টেপা হ'ল, যে যে রাজা তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন ব'লে বিলেত থেকে আনিয়ে-ছিলেন, তিনি বাধ্য হলেন তাঁর সঙ্গে যে চুক্তি হ'য়েছিল তা' রদ্ করতে। যে সব কল্পনা নিয়ে Rattray সাহেব এসেছিলেন, সেগুলি র'য়ে গেল তাঁর মনের মধ্যেই। তাঁকে আবার ফিরে যেতে হয় নিজের দেশে!

মোটামুটি গল্পটি হচ্ছে এই। কিন্তু এর সঙ্গে একটি প্রণয়ের কাহিনীও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মহাযুদ্ধে যোগ দেবার আগে Rattray সাহেবের সঙ্গে Lauretta

বলে একটি মেয়ের আলাপ হয়। এই আলাপই হয়ত গভীর প্রণয়ে পরিণত হ'তে পারত যদি না Rattray যুদ্ধে যোগদান করতেন। Lauretta অনেক কাল Rattray সাহেবের জন্য অপেক্ষা করেছিল. হয়ত আরও অপেক্ষা করত। কিন্তু Rattrayর ব্যবহারে এবং অন্যান্য ঘটনা থেকে তার মনে হল, Rattray বুঝি তাকে বিশেষ ভালবাসে না। কাজেই সে বিবাহ করলে এমন একজন লোককে যার সঙ্গে শুধু যে তার বয়সেরই বিশেষ পার্থক্য ছিল তা নয়, মনেরও মিল ছিল না। ইনি হচ্ছেন, কেনেডি সাহেব, রায়ালগড়ের রেসিডেন্ট। Rattray ও লরেটা—এ দুজনেরই ভুল ভাঙ্গল যখন তাদের আবার দেখা হল। কিন্তু ভুল যখন ভাঙ্গল, তখন ভুল শোধরাবার ইচ্ছে ও উপায় থাকলেও, কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করে Lauretta তাতে রাজী হ'ল না।

উপন্যাসে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে মধ্যভারতের একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানীতে—রায়ালগড়ে। রাজধানীটি শিপ্রা নদীর কাছে। শিপ্রানদীর সঙ্গে অনেক সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত। মধ্য ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, দেশীয় রাজাদের দরবারের আড়ম্বর—এ সমস্তই উপন্যাসে আছে। চরিত্রগুলিও বেশ নিপুণ ভাবে আঁকা হয়েছে। ঘটনার ঘাত-অভিঘাতে Rattrayর মনোভাবের ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন বেশ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু যে Questioning face এর জন্য Lauretta Rattrayর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, উপন্যাসের শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা Rattrayর সেই Questioning faceই দেখতে পাই। এই বইএর পাত্র ও পাত্রীদের মধ্যে সকলকার চেয়ে আমাদের বেশী নজর পড়ে Lauretta ও Drake সাহেবের ওপর। Kennedy সাহেব নামে Resident হলেও কাজে Resident ছিলেন তাঁর পত্নী Lauretta। দুর্গেশ্বরের মহারাণী ও অন্যান্য সকলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ। প্রজাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি তাঁর Rattray সাহেবের থেকে কম ছিল না। Kennedy সাহেবের সঙ্গে মনের মিল না থাকলেও তিনি কেন বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করতে রাজী হননি, তার তিনি যে কারণ দেখান তা থেকে তাঁর চরিত্র বেশ ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,

> "Civilization is not built on great eternal truths as we try to fool ourselves into believing. It's built on conventions. You are a writer, so naturally you like to think that literature issues out of something deeper than man's arrangements. But it doesn't. It issues out of convention and arrangement; it depends on convention and arrangement'" (p 337.)

ভারতবাসীদের কাছে উপন্যাসটি আর এক দিক থেকে খুব বেশী চিত্তাকর্ষক। ভারতবাসী, ভারতীয় সমস্যা, ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ও দেশীয় রাজাদের বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ লেখকের মতামত বই থেকে অনেকটা জানা যায়। সাধারণ ভারতবাসীদের বিষয় এ বইএ বিশেষ কিছু নেই। যতটুকু আছে তা থেকে মনে হয় Forster-এর Passage to India বা Ackerleyর Hindoo Holiday-এর মধ্যে সাধারণ ভারতবাসীর যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তা এর থেকে অনেক বেশী সত্যি। Shindeকে যদি ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হ'লে এটা অবশ্য স্বীকার করতে হ'বে যে ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়কে গ্রন্থকার বিশেষ ভাল চক্ষে দেখেন না। সরকারী মহলের যে চিত্র আমাদের সামনে ধরা হয়েছে তা মোটেই প্রশংসাজনক নয়। মনে হয় যেন সেখানে যথেষ্ট নীচতা, সহানুভূতির অভাব ও অযোগ্যতা বর্ত্তমান। তা ছাড়া

তাঁরা যেন ভারতীয় সমস্যা ঠিকভাবে বোঝবার জন্য যে আয়াস ও কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করা দরকার, তা করতে মোটেই রাজী নন। দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সম্বন্ধে এই বই পড়ে যে ধারণা জন্মে তা তাঁদের খুব অনুকূল বলে বোধ হয় না। প্রজাদের সুখ ও সুবিধার জন্য তাঁরা বিশেষ লালায়িত নন। ব্রিটিশরাজের প্রতি প্রকৃত মনোভাব গোপন ক'রে তাঁরা কিরূপে থাকেন, দুর্গেশ্বরের মহারাণার চরিত্রে তা বেশ ফুটে উঠেছে। প্রজাদের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করবার মতলব তাঁর ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন প্রজারা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয়। Rattray সাহেবকে তিরস্কার ক'রে তিনি এক জায়গায় বলছেন—

"It was you who, when I was a youngman and worshipped you, because you seemed so strong, wise and kind, encouraged me in the foolish ideas I then had, of giving these people Self Government! They are my slaves and donkeys, fit only to carry burdens and to do what they are told! And now all these years we have had attack after attack by these wretched papers of your nationalists in British India, all because after I had started a Legislative Council and elections and a whole lot of mad things I saw how foolish it was and stopped doing such craziness."

ভারতীয় সমস্যা-সম্পর্কে গ্রন্থকারেরও মত অনুরূপ নয় কি ?

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

এষার কবি
রবীন্দ্রনাথ } —শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল। বাসন্তী প্রেস, ৭১নং শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

এষার কবি বইটির মলাটের ঠিক পরেই এক টুকরা কাগজে মুদ্রিত ও পৃথকভাবে সংলগ্ন এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ে :—

'Premloke'
is a
Love planet
in sight

Through the telescopic view of the spiritual world. A shade of fresh inspiration. A glow of new thoughts. A wave of original ideas. A melody of language and Decoration of phrase, characterize the romantic discovery of this "Love Planet."

ব্যাপারটি বিশেষ কিছু নয়—"প্রেমলোক" নামক একটি কবিতা পুস্তকের বিজ্ঞাপন। দুই পৃষ্ঠা পরে এই বিস্ময়কর গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা কবিবর শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মল্লিক মহাশয়ের ফটোগ্রাফও সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞাপনটির সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো হেতু নাই।

"এষার কবি" অবশ্য অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় সম্বন্ধে লিখিত। এই পুস্তকের
সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশক কর্তৃক সন্নিবেশিত একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক
মনে হইতে পারে। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই বিজ্ঞাপনটির উল্লেখ করিলাম।
কারণটি শুধু এই কথা জানানো যে পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার সম্বন্ধে গ্রন্থকার ও
প্রকাশক দুইজনেরই দায়িত্ব আছে এবং এই দায়িত্ব যথেষ্ট গুরু, কেননা জাতীয়
জীবনের উন্নতি বা অবনতিসাধনে মুদ্রিত পুস্তকের প্রভাব নিতান্ত কম নহে।
ভালো বই বা মন্দ বইর বিচার সহজ নহে এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ
আছে। কিন্তু ভালো বা মন্দ যে-কোনো প্রকারের মুদ্রিত পুস্তক—যাহা প্রকাশক
বা গ্রন্থকার গুরুতর বিবেচনায় যোগ্য বলিয়া মনে করেন—যে এইরূপ অদ্ভুত বিজ্ঞাপন
বহন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।
সামাজিক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও শালীনতার প্রয়োজন আছে
এবং এই প্রয়োজনের উপলব্ধি শুধু পুস্তক রচয়িতার নহে, পুস্তক-প্রকাশকদেরও
থাকা উচিত। যেখানে তাহার অভাব ঘটে, সেখানে সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং
প্রচুর হাসির উদ্রেকেও এই ক্ষতির প্রতিকার হয় না। "এষার কবি" যে অমর্য্যাদার
কলঙ্ক লইয়া পাঠকের হাতে পৌঁছায় তাহা এতই তীব্র যে তাহাকে উপেক্ষা করা
চলে না।

এষার কবি পরলোকগত অক্ষয়কুমার বড়াল। বড় কবি না হইলেও
বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান আছে। এমন বহু কবিতা তিনি লিখিয়া
গিয়াছেন যাহা সহজে মনকে স্পর্শ করে। অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ;
রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা
প্রভাবান্বিত হওয়া তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা
সাহিত্যে তাঁহার দান সম্পূর্ণ তাঁহার স্বকীয়—অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব এইখানেই।
অক্ষয়কুমার এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই কবিরই কবিতা যাঁহার ভালো লাগে তাঁহার পক্ষে
দুইজনের মধ্যে তুলনা করা স্বাভাবিক, প্রিয়লাল দাস মহাশয় বারবার তাহা করিয়াছেন।
কিন্তু এই তুলনাপ্রসঙ্গে এই দুইজনের আপেক্ষিক মূল্যের কোনো আভাস পাওয়া
যায় না। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অক্ষয়কুমারের স্থান বহু নিম্নে। অথচ প্রিয়লাল বাবুর
দুইখানি পুস্তক পড়িয়া এই সহজ সত্যটি সম্বন্ধে কোনোই ধারণা হয় না। ইহার জন্য
শুধু গ্রন্থকারকে দোষ দিলে চলিবে না। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এখন পর্য্যন্ত
সাহিত্য-বিচারের স্পষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ডএর অভাব আছে ; তাই ছোট বা বড় লেখক, ব্যক্তিগত
ভাবে যাহাদেরই লেখা আমাদের ভালো লাগে তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রশংসা
অসংযত আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এবং এই অসংযমের মাত্রা সকল ক্ষেত্রেই
প্রায় সমান। আলোচ্য পুস্তক দুইটিতে ইহার প্রমাণ বারবার পাওয়া যায়। সাহিত্য-
সমালোচনা হিসাবে তাই এই পুস্তক দুইটির মূল্য নাই বলিলেও চলে ; কিন্তু কি করিয়া
সাহিত্য-সমালোচনা করা উচিত নয়, তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই দুইটি পুস্তকই
বিশেষ মূল্যবান। যদি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন
আমরা স্বীকার করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় ও ছোটর তারতম্য এবং কে ছোট কে
বড় তাহার বিচারের জন্য কোনো-না-কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ড আমাদের মানিয়া লইতে হইবে।
কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ডই হয়তো চিরস্থায়ী নহে। তাহা ছাড়া ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ

অবশ্যই থাকিবে। সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি সর্ব্বোচ্চ বলিয়া স্বীকৃত তাঁহার সম্বন্ধ এক বা একাধিক সত্যকারের রসগ্রাহী ব্যক্তিও ভিন্নমত হইতে পারেন। অন্যান্য সব দেশেই তাহা হইয়া থাকে। বার্ণাড শ শেক্সপীয়রের ট্রয়লাস ও ক্রেসিডাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করিতে পারেন; এলিয়ট শেলি অপেক্ষা ড্রাইডেনকে বড় কবি মনে করেন। কিন্তু এই সকল মতামত যাঁহারা জোরগলায় প্রচার করেন তাঁহারা শেক্সপীয়রের রচনাবলীর মধ্যে ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার স্থান কত নিম্নে বা ইংরাজি কবিদের মধ্যে শেলির স্থান কত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা ভালো করিয়া জানিয়াই করেন। তাই তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রতিবাদের সুরে তীব্র হইয়া প্রকাশিত হয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে বাংলা ভাষার সমালোচকগণের এখনও ছোট বড় সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নাই; ইহার ফলে শুধু বড়দের নয় ছোটদের সম্বন্ধেও অবিচার হয়। অক্ষয়কুমারের স্থান যে ছোট কবিদের—অর্থাৎ ইংরাজীতে যাঁহাদের 'মাইনর পোয়েট্‌স্' বলে,—তাঁহাদের মধ্যে এই কথা মানিয়া লইয়া যদি "এষার কবি"র প্রণেতা তাঁহার স্তবগান করিতেন তাহা হইলে কাহারও কোনো আপত্তি হইত না এবং অক্ষয়কুমার সম্বন্ধেও সুবিচার হইত। দুঃখের বিষয়, প্রিয়লালবাবুর রচনা পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ই ধারণা হয় যে তিনি মনে করেন অক্ষয়কুমার জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া বিচারের যোগ্য। হায় রবীন্দ্রনাথ! হায় অক্ষয়কুমার!

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Komos—by Willem De-Sit ter.
Harvard University Press (Boston Lectures Nov. 1931)
Exploring the Upper Atmosphere—by Dorothey Fisk.
Faber, Faber & Co.

কৌতূহলী পাঠকের অবিদিত নেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত কি পরিমাণে মানুষের চিন্তাক্ষেত্র, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মবাদ ও শিল্পকে রঞ্জিত করেছে। এ সকলের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এক শ্রেণীর সাহিত্য বেশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই সব ব্যাখ্যার উপদ্রব-বিরহিত আবিষ্কারগুলির সরল ও শুদ্ধ বর্ণনার অভাব লক্ষ্য হয়। আলোচ্য বই দুটি এই অভাব পূরণ করার দিকে অগ্রসর হওয়ায় বড়ই আদরণীয় হয়েছে।

ডি-সিটারের বইটির বিষয় নিখিল-বিশ্বের চৌহদ্দি; বিষয়টি নূতন নয়। Pythagorus, Ptolemy প্রভৃতির সময় থেকেই এর আলোচনা সুরু হয়েছে, তারপর Copernicus, Tycho Brahe, Kepler, Galileo ও Newtonএর দ্বারা একটা পরিণতি লাভ করেছে। আধুনিক যুগে Sir William Herschel, Kapteyn, Shapely, Einstein ও গ্রন্থকার স্বয়ং এ বিষয়ে অনেক নূতন ও বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরদের মধ্যে যাঁরা এই নিখিল-তত্ত্বের বিবরণ ও ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মধ্যে Eddington ও Jeansই প্রধান।

কিন্তু এঁদের আলোচনা নিখিলতত্ত্ব ছাড়িয়ে এক একটি দর্শনবাদের রূপান্তর গ্রহণ করেছে। Eddingtonএর pointer readings ও "closed system" বহুতর্কের আমদানী করেছে। তেমনি Jeansএর realityর পশ্চাতে mathematical mind ও মানব মনের লোকোত্তর দৃষ্টি,—mind in direct contact with ultimate reality, ইত্যাদিও কূট তর্কের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। পক্ষান্তরে ডি-সিটারের রীতি ঐতিহাসিক ধারার অনুগমন করে নিখিল-তত্ত্ব কেমন করে ধাপে ধাপে মানুষের ধারণায় পরিণতি লাভ করেছে তার পথ দেখিয়ে সিদ্ধকাম হয়েছে। অন্য কোন পদ্ধতিতে উপস্থিত করলে বিষয়টি বোধ হয় এমন হৃদয়গ্রাহী হত না। এখানে পাঠককে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে আইনষ্টাইন যখন তাঁর মাধ্যাকর্ষণের নূতন তত্ত্ব প্রচার করে নিখিল বিশ্বের সীমা নির্দ্দেশ করেন তখন ডি-সিটার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আইনষ্টাইনের মতে নিখিল ছিল সসীম, ডি-সিটারের মতে নিখিল অসীম। এখনকার সর্ব্বগ্রাহ্য মতে নিখিল একেবারেই সসীম নয়, অসীমের দিকে সম্প্রসারণশীল—Expanding। স্বয়ং আইনষ্টাইনও এইমতে সায় দিয়েছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জ্যোতিষিদের পরিচয় ছিল কেবলমাত্র নাক্ষত্রিক জগতের সঙ্গে, সম্প্রতি বৃহদায়তন টেলিস্কোপ ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির গঠন ও উন্নতির প্রসাদে তাঁদের জ্ঞান নাক্ষত্রিক জগতের সীমা অতিক্রম করে গেছে। নক্ষত্রময় যে জগৎ প্রতি রাত্রে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় তা সমুদয় বিশ্ব-নিখিলের একটা পরিবার মাত্র। শরৎ বা হেমন্তের নির্ম্মল অন্ধকার রাত্রে যে ছায়া-পথ দেখা যায় তাই এই নাক্ষত্রিক জগতের প্রান্তরেখা সূচিত করে। এক্ষেত্রেও কবির সেই প্রাচীন বর্ণনা প্রয়োগ করা যেতে পারে—"দূরাদয়শ্চক্রনিভশ্চ তন্বী—"; বহুদূরে আছে বলেই প্রান্তদেশ অমন ধূম্র দেখায়। সমস্তটা মিলে নাক্ষত্রিক জগৎ কতকটা গরুর গাড়ীর চাকা বা কুমারের চাকার মত ও আবর্ত্তনশীল। এর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় বিশহাজার আলোকবর্ষ অর্থাৎ বিশহাজার বছরে আলোক যতটা দূর যেতে পারে,—এর আবর্ত্তনের গতি প্রান্তের কাছাকাছি স্থানে প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ৬০ মাইল (পৃথিবীর আবর্ত্তন সেকেণ্ডে সিকি মাইলের কিছু বেশী)।

আমার এ নাক্ষত্রিক মেলার চিত্র খুব সঠিক বা সম্পূর্ণ হল না,— কারণ এপাশে ওপাশে globular clusters আছে; পরিশোধিত মাপজোপও ঢের বেশী, তা ছাড়া নক্ষত্রের জমায়েতের অসাম্য, সূর্য্যের অবস্থান, আন্তর্নাক্ষত্রিক বিমানের (space) অস্বচ্ছতা—ইত্যাদি অনেক কথা আছে। যা হোক globular clusters সমেত এই নক্ষত্রমেলা একটা সম্পূর্ণ পরিবার বা ব্যষ্টি মনে করা যেতে পারে। তা হলে উত্তর-নাক্ষত্রিক জগৎ কি? উত্তর-নাক্ষত্রিক জগৎ নীহারিকাময়। এক একটি নীহারিকা এক একটি পরিবার। প্রত্যেকেই আবর্ত্তনশীল বলে এগুলিকে ঘূর্ণী-নীহারিকা বলা হয়। এদের মাপও আমাদের নাক্ষত্রিক জগতেরই তুল্য বলে অনুমান করবার কারণ আছে। তাছাড়া অন্য কোন নীহারিকায় গিয়ে দেখলে আমাদের নাক্ষত্রিক জগৎও নীহারিকার মতই দেখাবে। তাহলে নিখিলবিশ্ব হল সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত বিমানে (space) ভাসমান ঘূর্ণী-নীহারিকার সমষ্টি, প্রত্যেক ঘূর্ণী-নীহারিকা আবার নক্ষত্রের সমষ্টি। নীহারিকা ও নক্ষত্রের আদি সৃষ্টি যেমন

করেই সিদ্ধ হক আপাততঃ মাধ্যাকর্ষণের দরুণই নীহারিকার অন্তর্বর্ত্তী নক্ষত্রেরা ঘূর্ণাবর্ত্তে আলোড়িত হচ্ছে। / কিন্তু নীহারিকারা পরস্পর এতই দূর যে এদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বল অতি ক্ষীণ। এই নীহারিকা থেকে নীহারিকার ব্যবধানই প্রচণ্ড বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে ;—পরিমাণ,—দেড়শ কোটি বছরে ব্যবধান হয় দ্বিগুণিত। এই ব্যাপরটিরই নাম Expanding Universe। প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হতে পারে। মনে হতে পারে কেমন করে নীহারিকারা যা হোক কিছু মাধ্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হয়েও পরস্পর থেকে বিক্ষিপ্ত হয়? নিউটন পরিকল্পিত মাধ্যাকর্ষণে হতে পারে না, কিন্তু আইনষ্টাইনের পরিশোধিত মাধ্যাকর্ষণ ও সার্ব্বভৌমিক আপেক্ষিকতার (Generalised Theory of Relativity) মতে তাই হয়। শেষোক্ত মতে পদার্থ হল বিমান বা space-এর মোচোড়, এই মোচড় যেখানে যেখানে পদার্থরূপে দানা বেঁধেছে সেখানেই নিউটনীয় আকর্ষণ পরিস্ফুট হয়, যেখানে মোচড় নেই সেখানে বিমানের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রানুযায়ী এ সম্প্রসারণ সিদ্ধ, সম্প্রতি Shapelyর অনুসন্ধান ফলে এ সম্প্রসারণ যন্ত্রসাহায্যে প্রত্যক্ষ ও মাপা হয়েছে। অকাট্য প্রমাণ,—এখানে আর দ্বন্দ্ব সন্দেহের অবকাশ নেই।

বলা বাহুল্য নিখিলের এ সম্প্রসারণ মাত্র সেদিন প্রত্যক্ষ হয়েছে ; জ্যোতির্বিদরা এ বিষয়ে মোটেই শেষ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি, অনেক রকম দ্বন্দ্ব সন্দেহ স্বতঃই এ সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও রয়ে গেছে। সে সবের উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের সিংহাসন পাতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পনার মিলন-ক্ষেত্রে। গ্রন্থে ডি-সিটার এ বিষয়টির ওপর তাঁর কলমের জোর দিয়েছেন। প্রাচীন প্রসঙ্গ আলোচনায় তিনি বলেছেন Ptolemy, Copernicus প্রভৃতির খেলা ছিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে জ্যামিতির কতরকম ছকে ফেলে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে তাই দেখা। এ কারণে তিনি Ptolemyর পৃথিবী-কেন্দ্রীয় জগৎ ও Copernicus-এর সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতের মধ্যে তফাৎ দেখেন না। গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন ত প্রত্যক্ষ অভিযানের শীর্ষে পৌছেছিলেন। এঁদের কাছে পরিকল্পনার কোন অবকাশ ছিল না। অপরদিকে শুদ্ধ দার্শনিকরা যে সব পরিকল্পনার ছড়াছড়ি করে গেছেন তার সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন যোগাযোগ ছিল না। নিউটনের অব্যবহিত পর থেকে পরিকল্পনার প্রকোপ অল্পে অল্পে মাথা তুলে উঠল। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব তার পরিণতির জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত। তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রথম প্রচারের সময় সমস্তটাই ছিল পরিকল্পনার দৌড় কতদূর হতে পারে তারই নিদর্শন মাত্র। কিন্তু তার ব্যবহারিক সিদ্ধান্তগুলি যা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ব্যক্ত হয়েছিল একটি একটি করে তার প্রত্যেকটি অদ্যাবধি হুবহু মিলে গেল। বিজ্ঞানের আজ যে উৎকর্ষ-সিদ্ধি হয়েছে তার অধিকাংশই এই আগাম পরিকল্পনার প্রসাদে। Planck, Bohr, Rutherford, De-Broglie এঁদের পরিকল্পনায় ও তার সফলতায় বিজ্ঞান আজ সমৃদ্ধ। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি বিনা বিজ্ঞানের এ সম্মানলাভের উপায় ছিল না। জ্যোতির্বিদরা এখন এক ২০০ ইঞ্চি বেধ টেলিস্কোপ তৈরীর অপেক্ষা করে আছেন যা সম্পূর্ণ হলে জগতের অধিবাসী নিখিলবিশ্ব সম্পর্কে অনেক নূতন বার্ত্তা শুনতে পাবে।

বইটি সম্বন্ধে একটা কথা বাকি রয়ে গেল। নাক্ষত্রিক জগতের আবর্ত্তন, দূরত্ব, মাপজোপ তথা নীহারিকাদের গতিবিধি ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণে যে পদ্ধতির অনুগমন করা হয়েছে তা হল law of chance। এ একটা lawই নয় বলে অনেকে একে আক্রমণ করেন। এ বিষয়ে ডি-সিটারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—"—Methods are based on the laws of the theory of probability, the law of great numbers, or, as we might paradoxically say, the law of accidents. Paradoxically—since an accident is by definition a thing that obeys no law. But even because they obey no law, accidents are in the long run liable to cancel one another, and the law of great numbers is, in fact, one of the most reliable laws of nature—"

মিস্ ফিস্কের বইটি যদিও উপরোক্ত বইটির মত জগতের চূড়ান্ত ব্যাপার নিয়ে ব্যাপৃত নয় তবু এমন চিত্তাকর্ষক বই যে সচরাচর চোখে পড়ে না একথা নির্ভয়ে বলা চলে। উর্দ্ধস্তরের আবহ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যতকিছু জানা গেছে গ্রন্থকর্ত্রী তাই সংগ্রহ করে সুরম্য ভাষায় গ্রন্থন করেছেন। আমাদের সাধারণ ধারণা ২০ মাইল উর্দ্ধে পর্য্যন্ত বায়ুস্তর আছে, খানিকটা ওপরে উঠলেই অক্সিজেন অভাবে প্রাণধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, চারিদিকের পরিমণ্ডল যেমন ঠাণ্ডার রসাতলে ডুবে থাকে সূর্য্যের রশ্মি তেমনি সদ্য অগ্ন্যুত্তাপের তেজে যাতে পড়ে তাকেই দহন করে ;—এই পর্য্যন্ত ;—কিন্তু হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুনে আরোহণ করে—ও আরোহীশূন্য বেলুন উড়িয়ে পণ্ডিতরা উর্দ্ধদেশের অনেক অভিনব বার্ত্তা সংগ্রহ করেছেন। প্রফেসার পিঁকার্ড ও মস্কো বেলুনের কথা সর্ব্বজনবিদিত যা যথাক্রমে ১০ ও ১১ ১/২ মাইল উর্দ্ধে আরোহণ করেছিল। এইসব আকাশপাড়ির বিবরণ গ্রন্থকর্ত্রী যা সংগ্রহ করেছেন তা রোমাঞ্চকর। বার্ত্তাবহ আরোহীশূন্য বেলুন ২৩ ১/২ মাইল পর্য্যন্ত উঠেছে। আমরা সচরাচর যে বায়ুস্তরের সঙ্গে পরিচিত তা আছে প্রায় ১০ মাইল পর্য্যন্ত—এতদূর অবধি উর্দ্ধত্বের সঙ্গে সঙ্গে শৈত্য বাড়তে থাকে। এর উপরে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত আর একটা বিভিন্ন স্তর, প্রায় বায়ুহীন। কিন্তু বড় অদ্ভুত কথা এখানকার শৈত্যের উর্দ্ধানুপাতে কমিবেশী নাই। এ স্তর ছাড়িয়ে ওপরে ওঠা বেলুনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বেলুনে চড়ে ওপরে উঠলে একটা সুন্দর দৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, সে হল আকাশের এক অপরূপ গাঢ় বেগুনি-নীল রং যা পৃথিবী থেকে দেখা নীলের প্রায় দশগুণ গাঢ়। পৃথিবীর পৃষ্ঠসংলগ্ন ধূলিকণা ও জলকণারাশি এই গাঢ় বেগুনি-নীল রং কতকাংশে অপহরণ করে বলে ভূপৃষ্ঠ থেকে আমরা সে সৌন্দর্য্য দেখতে পাই না।

আরও উর্দ্ধদেশের বার্ত্তা আনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হত যদি না প্রকৃতি আপনা হতেই আপন দূতকে বার্ত্তাবহ কাজে বাহাল করত। এ রকম একটি দূত হচ্ছে শব্দ ; উপরের সম-শৈত্যদেশের সীমাপ্রান্ত থেকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়ে শব্দ ভূপৃষ্ঠে আবার ফিরে আসে। এই সীমাপ্রান্তে একটি অতি পাতলা Ozone-এর পর্দ্দা আছে যা সূর্য্যের Ultra-Violet-এর আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে। আর একটি দূত হল রেডিও। রেডিও উর্ম্মি উর্দ্ধে উঠে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়ে মাটিতে ফিরে এসে

একটি ৬০ মাইল উর্দ্ধে ও আর একটি ১২০ মাইল উর্দ্ধে বিলম্বিত দুটি বিদ্যুৎবাহী পর্দ্দার অস্তিত্বের বার্ত্তা এনে দিয়েছে। প্রকৃতিকে এজন্য ধন্যবাদ না দিয়ে থাকা যায় না কেননা এদুটি স্তরের অভাবে রেডিওর long ও short wave broadcasting অসম্ভব হোত,—রেডিও উর্ম্মি ওপরে উঠে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধতর বিমানে বিলীন হয়ে যেত।

গ্রন্থকর্ত্রী একটি বড় চমৎকার কথা বলেছেন যে ল্যাবরেটারিতে আমরা যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি তারই পুনরভিনয় হয় প্রকৃতির প্রাঙ্গণে, বিরাটব্যাপী রূপে। তেশিরা কাঁচে আমরা সূর্য্যালোকর বর্ণচ্ছটা দেখি, প্রকৃতি তাকেই প্রকাশ করে মহান ইন্দ্রধনুরূপে,—আকাশে বিলম্বিত জলকণারাশির সাহায্যে। এরকম দুটি বহু ব্যাপী চমকপ্রদ প্রাকৃতিক লীলা গ্রন্থকর্ত্রী বিবৃত করেছেন। তার একটি হল মেরুচ্ছটা আর একটি হল নবাবিষ্কৃত cosmic রশ্মি। যে না মেরুচ্ছটা স্বচক্ষে দেখেছে তার কাছে এর মহীয়ান বিস্তৃতি ও খেয়ালী রূপভঙ্গির বর্ণনা করা বিফল। অথচ এ দীপ্তি ঠিক সেই উপায়েই সম্পাদিত হয় যে উপায়ে গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে আজকাল Neon lamp জ্বালানো হচ্ছে। সূর্য্য থেকে শুধু আলোক কিরণ নয়; সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎকণাও (Electrons, Positive ions ইত্যাদি) ধরা পৃষ্ঠে বর্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীর উর্দ্ধে ৬০ মাইল থেকে ১০০ মাইল উর্দ্ধে বিলম্বিত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাসের অণু পরমাণু শেষোক্ত বিদ্যুৎকণা দ্বারা প্রহৃত হয়ে মেরুচ্ছটার সৃষ্টি করে।

Cosmic রশ্মির ব্যাপার সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যজনক; পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। এ রশ্মি মাপের হিসাবে X-ray রশ্মির চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম কিন্তু এর স্বচ্ছ অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করবার ক্ষমতা X-rayর তুলনায় বহুগুণ অধিক। পৃথিবী-পৃষ্ঠের উর্দ্ধাকাশ এই cosmic রশ্মিতে ভরপুর। প্রথমে অনুমিত হয় যে ভূগর্ভ নিহিত রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু থেকে এ রশ্মির উদ্ভব কিন্তু তাহলে এ রশ্মি উর্দ্ধাকাশে এত প্রচুর হত না। এখন তিনটি মত দাঁড়িয়েছে—প্রথম, নিখিল বিশ্বের সুদূর গর্ভে কোথাও না কোথাও ধ্বংসের ব্যাপার চলছে তাই থেকে এর উদ্ভব। দ্বিতীয়, ধ্বংস নয় অথবা ধ্বংস ছাড়াও সৃষ্টি ক্রিয়া চলছে তাই থেকে এর উদ্ভব। তৃতীয়, সূর্য্য থেকে যে বিদ্যুৎকণা বর্ষিত হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্রে তাই অতি প্রচণ্ড বেগবান হতে পারে—সেই বেগবান বিদ্যুৎকণারাই ভ্রম ক্রমে রশ্মিবলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে।

জ্ঞাতব্য হিসেবে এসব হয়ত খুব বেশী কিছু নয় কিন্তু এমন রমণীয় করে বইটি লেখা যে একবার পড়তে বসলে পাঠক আগাগোড়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ আবিষ্ট হবে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Peter Abelard—by Helen Waddell (Constable).

মধ্যযুগে ফরাসীদেশে যে সব মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, তার মধ্যে Abelard ছিলেন একজন অগ্রগণ্য। প্রতিভা ছিল তাঁর অসাধারণ, বুদ্ধিও অতি সূক্ষ্ম।

পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক বহু ক্যাথলিক পুরোহিতের ধর্ম্মবিষয়ক মতবাদ খণ্ডন ক'রে তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও বুদ্ধির পরিচয় দেন। এই রকম ক'রে মতবাদ খণ্ডন করবার ও নিজের অভিনব প্রগতিশীল মত প্রচার করার ফল দাঁড়ায় দুরকম। একদল যেমন তাঁর প্রবল শত্রু হ'য়ে উঠে, তেমনি তাঁর ভক্ত ও উপাসকের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যুবকসম্প্রদায় তাঁকে ঠিক একটি উপাস্য দেবতার মত ভক্তির চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করে। শেষাশেষি কিন্তু প্রগতিশীল মতবাদ প্রচার করার অপরাধে তাঁকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়।

শুধু অসাধারণ প্রতিভার জন্য নয়, অন্য এক কারণেও তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেটি হচ্ছে একটি প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার। তিনি ছিলেন একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত। রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের বিবাহ নিষিদ্ধ। তিনি কিন্তু মদনের পঞ্চশরে এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে গোপনে একটি মেয়ের পাণিগ্রহণ না করে পারেন নি। গোলাপে কাঁটা আছে, কুসুমে কীট আছে, প্রেমের রাজ্যেও আছে অনেক দুঃখ কষ্ট। প্রণয় ছিল তাঁর অতি গভীর, কিন্তু এই প্রণয়ের জন্যই তাঁর জীবনের শেষ ভাগ দুঃখময় হয়ে উঠেছিল।

এই প্রণয়-কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রেই আলোচ্য উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে।

উপন্যাসটির মধ্যে দু'টি প্রধান চরিত্র আছে—সে দুটি হচ্ছে Abelard ও Heloise। এ দুটি চরিত্রেরই ক্রমবিকাশ গ্রন্থকর্ত্রী বেশ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। যে লোক ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত কামপ্রবৃত্তি রোধ ক'রে এসেছিলেন—Abelard সম্বন্ধে তাঁর এক বাইশ বৎসর বয়স্ক ছাত্রের কাছে Gilles বলেন "For the seven years of manhood that you have behind you, and the fifteen that are before you till you reach his age, this man never looked on a woman to lust after her"—তিনি কি করে ধীরে ধীরে Heloise-এর প্রেমে আবদ্ধ হ'লেন, তাঁর প্রেমের গভীরতা ও পরিণতি—এ সকলের যে ছবি লেখিকা এঁকেছেন তার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করে পারা যায় না। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—Heloiseও ছিল Abelard-এর উপযুক্ত প্রণয়িনী। Abelard ও Heloise-এর প্রণয় প্রসঙ্গে Gilles এক জায়গায় বলছেন, "He is not the only man who would think her worth flinging the world away for and heaven after it!" Abelard-এর কাছে আত্মদান করার আগে Heloise নিজের মনের সঙ্গে বড় কম যুদ্ধ করে নি। আত্মদান করার পর থেকে সে একান্ত পতিগত-প্রাণ হয়ে উঠ্‌ল। Abelard-এর মঙ্গলের জন্য নিজের সুনাম, নিজের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েও Abelard-এর হিতার্থে সে নিজেকে তাঁর রক্ষিতা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে নি। Abelard-এর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, কিন্তু পাণ্ডিত্য যেখানে অগাধ, সেখানে প্রায়ই সাংসারিক জ্ঞানের আধিক্য দেখা যায় না। এই সাংসারিক জ্ঞান কিন্তু Heloise-এর ছিল পুরামাত্রায়। এইজন্যই বিবাহের প্রস্তাবে সে প্রথমে রাজী হয় নি। সে বলে যে Abelard-এর রক্ষিতা বলে নিজের পরিচয় দিতে পারিলেও তার গর্ব্বের সীমা থাকবে না। এই সাংসারিক জ্ঞান ছিল বলেই সে প্রথম থেকে Abelard-কে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু Abelard লোককে বিশ্বাস করতেন

বেশী, তাই যতটা সাবধান হওয়া উচিত ছিল তিনি ততটা সাবধান হন কি, আর তার ফলই তাঁদের প্রণয়-কাহিনীর শেষ হয় বিষাদে।

চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখিকার নিপুণতা যে শুধু Abelard ও Heloiseএর চরিত্র অঙ্কনে ফুটে উঠেছে তা নয়। বইখানির মধ্যে ছোট খাট যে সব চরিত্র আছে, সে গুলিও এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে ছোট দরের কোন লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব হ'ত না। তুলির দু' একটি আঁচড় দিয়ে আমাদের সামনে একটি পূর্ণ চিত্র দাঁড় করাতে পারাই শিল্পীর বাহাদুরী। এ দিক দিয়ে বিচার করলেও লেখিকাকে একজন খুব উঁচুদরের শিল্পী বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা Gilles-এর চরিত্রের উল্লেখ করতে পারি। এত অল্প চেষ্টাতে যে এত সুন্দর একটি চরিত্র আঁকা যেতে পারে, তা ধারণা করা বাস্তবিকই কঠিন। জ্ঞান, কঠোরতা, স্নেহ, মমতা ও ঔদার্য্যের এমন সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। চরিত্রটি কিন্তু কোন জায়গাতেই অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না।

Abelard ও Heloiseকে কেন্দ্র ক'রে আরও উপন্যাস লেখা হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি পড়ার পর আমাদের George Moore লিখিত উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। Waddellএর বইয়ের সঙ্গে Mooreএর বইয়ের প্রধান প্রভেদ atmosphere নিয়ে। Moore মধ্যযুগীয় ফরাসী দেশের যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে Troubadourদের প্রাধান্য বেশী, কিন্তু Waddell প্রাধান্য দিয়েছেন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের। কাজেই Mooreএর বইখানির ভিতর একটা কবিত্বপূর্ণ আবহাওয়া আছে, কিন্তু Waddellএর উপন্যাসে আমরা পাই সমাজের এমন একটি চিত্র যাতে বাধা নিষেধ ও নিষ্ঠার প্রাধান্যই বেশী।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

The Unexpected—By Frank Penn-Smith ; Foreword by Richard Hughes, Cape.

প্রকৃতির অপর্য্যাপ্ত রস-সমুদ্র হতে প্রতিনিয়তই তরঙ্গ এসে শিল্পি-মনকে আলোড়িত ক'রে তোলে কিন্তু শিল্প-সৃষ্টি প্রাণবন্ত হয় কদাচিৎ। কারণ যে সাধনা ও একাগ্রতা শিল্প-প্রতিমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারে সহায়তা করে, অন্নজগতের সুখ শান্তির উপর তা কতকটা আপেক্ষিক ভাবে নির্ভরশীল। ফ্রাঙ্ক পেন-স্মিথ যথার্থ শিল্পী এবং তাঁর সৃষ্টিশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়েছে বহু বিচিত্র ভাবে, নিত্য নিয়ত—অথচ বৃদ্ধ বয়সে রচিত আলোচ্য আত্মকাহিনীটি তাঁর একমাত্র সৃষ্টি যা সুধী সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হবার যোগ্য। ধনী-সন্তান—দুষ্টগ্রহের তাড়নায় আজীবন অশন-বাসনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে যখন কোন বৃহৎ সাহিত্য-সৃজনের অবসর পেলেন, তখন তাঁর জীবনের সায়াহ্নকাল অতীতপ্রায়—রোগ-ক্লান্ত বাতাপীড়িত দেহ মৃত্যু-সন্নিকট, বেলা-ভূমিতে বিক্ষিপ্ত। পরপারের উদাত্ত সমুদ্র-গর্জ্জন যখন শ্রুতিগোচর হয়, শুনেছি ঐহিক ইন্দ্রিয়-রাজি ক্রমশঃ বধির হয়ে আসে—স্মৃতি মসীলিপ্ত হয় দার্শনিকতার নৈরাশ্যময় আচ্ছাদনে। কিন্তু আলোচ্য রচনার অপূর্ব্ব অবদান হচ্ছে বর্ণনার সৌকুমার্য্য।

সুদূর যৌবনের প্রশস্ত অঙ্গনে যে সৌন্দর্য্য এক কালে উন্মেষিত হয়ে নীরবে ঝরেছে, অন্তর-গহনের অনির্ব্বাণ দীপ-শিখাটির আলোকে বৃদ্ধ তাই চয়ন করে আজ সাহিত্য-আসর মধুর সুরভিশ্বাসে পূর্ণ করেছেন। জীবনের তুচ্ছতম তুচ্ছ স্মৃতিগুলি অঙ্কিত হয়েছে বাতায়ন হতে দ্রষ্ট চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত উদ্যান-কুসুমের মত—যেন এক একটি লতা পাতা ফুল ও ফল আপন আপন রূপে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ভাসিত অথচ সমগ্রের কল্যাণে সমাহিত। ক্লেদ, মালিন্য, নৈরাশ্য, অবসাদ ইত্যাদি গ্লানি সেরূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে—অন্তরায় হয়নি। উপমা-বহুল সুন্দর নির্ভার ইংরাজি ভাষার স্খলমান গতির মধ্য হতে এক একটি শব্দ যেন আভ্যন্তরিক ওজস্বিতার আতিশয্যে বিপুল পুলকে পঙ্‌ক্তিমুক্ত হতে চায়। ভাবধারার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত গতি গদ্যের মধ্যে ছন্দের পরিস্পন্দ এনেছে।

জীবন-চিত্রের রেখাপাত প্রথম হতেই বিচিত্র। লাঙ্কাশায়ারের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র নগরীতে সম্ভ্রান্ত 'পেন স্মিথ' পরিবার বাণিজ্য-লক্ষীর ঐশ্বর্য্যময় অঙ্কে সমাসীন। বিদুষী মাতার উৎসাহে সমুদ্রপারের ফরাসী অভিজাত মণ্ডলীর সহিত নিবিড় আত্মীয়তা জমে উঠেছে—কত উজ্জ্বল দৃশ্য খণ্ড খণ্ড ভাবে চিত্রিত হয়েছে স্মৃতিপটে, তার ইয়ত্তা নেই। কি বৈদগ্ধ্যে, কি ললিত কলায়, স্থৈর্য্যে, ধৈর্য্যে তারা স্বজাতীয় নিকৃষ্ট-রুচি প্রতিবেশী হতে স্বকীয়তা বজায় রেখেছে, এমন কি নগরবাসীদের সহিতও ভদ্রতা-সূচক ইঙ্গিত বিনিময়ের অতিরিক্ত সৌহার্দ্দ্যপ্রকাশ বাহুল্য বিবেচিত হতো। অবকাশের আনন্দ উদ্‌যাপন হতো দেশ-ভ্রমণে—অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল নিমিত্ত মাত্র, মাতার ভগ্ন স্বাস্থ্য ছিল কারণ।

শিশু-সুলভ আহ্লাদে বিকশিত বাল্য-স্মৃতি অকস্মাৎ অদম্য কৌতূহলে পরিপূর্ণ হলো ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বাণিজ্যে পুনঃ পুনঃ ক্ষতির ফলে অর্থ-ভাণ্ডার তলে তলে নিঃশেষ হয়ে এসেছিল—এক দিন প্রত্যূষে বৃদ্ধ পিতা পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত বাস্তুভিটা সমূলে উৎপাটিত করে সপরিবারে সমুদ্র-যাত্রা করলেন।

১৮৭৯ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বহু দুঃস্থ ইংরাজ-পরিবার সর্ব্বস্ব পণ ক'রে অষ্ট্রেলিয়ার পাথেয় সংগ্রহ করে হঠাৎ ধনী হবার লোভে। খনিজদ্রব্যের আবিষ্কারের ফলে নাকি কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রভূত অর্থ লাভ করে এবং তখন হতে অর্থ-লোভ সংক্রামক হয়ে পড়ে। অনেকে পশুপালন উদ্দেশ্যে লব্ধ জমি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় ক'রে দুর্গম পর্ব্বত ও অনধিগম্য অরণ্যানী অভিমুখে যাত্রা করে। বৃদ্ধ পিতা সেই সুযোগে হোবার্টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-শিখরে অল্প মূল্যে এক খণ্ড বিশাল জমি ক্রয় করে বসেন। রাশিয়াতে প্রবাদ আছে যে চাষীর দুরবস্থা চরমে পৌছায় সে যখন শূকর ক্রয় করে। তেমনি পেন স্মিথ পরিবারের কাল হলো এই সম্পত্তি। ফল, ফুল, লতা, পাতার অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য, নিশাচর পক্ষীর কাকলি—প্রকৃতির বিবিধ ও অপরিমিত ঐশ্বর্য্য স্মিথ-পত্নীর ভাব-প্রবণ হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করলো। বনশ্রীর স্নিগ্ধ অঙ্গনে বাণিজ্যের স্থূল পাদবিক্ষেপে তিনি ঘোরতর আপত্তি তুললেন। এদিকে চুনের আধায় ইন্ধনের অভাব—অধিকন্তু অর্থাভাব ও ঋণ-ভার। ক্রমে জীবিকা-আহরণের দায়িত্ব ফ্রাঙ্ক ও তাঁর ভ্রাতার স্কন্ধে ভর করিলে। ফ্রাঙ্ক পরিবারবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভাবিত বঙ্কিম প্রবাহে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার বিরাম হলো সপ্ততিবর্ষ আয়ুষ্কালে। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল

মরীচিকা-লুব্ধ উদ্‌ভ্রান্তের মত স্বর্ণ ও টিনের অন্বেষণে অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বন-বনান্তরে, উন্মুক্ত আকাশতলে, উত্তাল পারাবারে, অবারিত প্রান্তরে, দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে ভ্রমণ করেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন নি—অথচ নিয়তির এমনই ছলনা যে ধৈর্য্য-সীমার প্রতি বাঁকে পুরস্কার বিকীর্ণ থেকেছে। মানসিক অবসাদ অপনোদনের জন্য প্রকৃতি অবিশ্রান্ত রূপ পরিবর্ত্তন করেছে। কখনও বা শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামলিমায়, কখন বা ঘোর কুহেলিকায় ভাবপ্রবণ চিত্ত আনন্দে অনুপ্রাণিত হয়েছে নদী-জল-কল্লোলে, বন-বিহগের কাকলিতে—বিষাদে, ত্রাসে অভিভূত হয়েছে দূরাগত পশুর আর্ত্তনাদে, ঝটিকার দাপটে।

সাহিত্যের সমালোচনায় রাষ্ট্রনৈতিক শ্লেষ বোধ করি অসঙ্গত হবে, কিন্তু না বলে পারছি না যে একটু অস্বস্তি মনে স্বতঃই জাগে যখন দেখি যে নৃতত্ত্ববিদ ব্যতিরেকে প্রায় সকল ইংরাজই আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদের বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা প্রণিধান-যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। পেনস্মিথ আপন বিবৃতি রোমাঞ্চকর করবার উদ্দেশে আফ্রিকার কাফ্রিদের বিচিত্র লম্ফ ঝম্ফ ও নরমাংস ভক্ষণের ভূয়সী বিবরণ দিয়েছেন অথচ ঘৃণাক্ষরেও অনুকম্পা বা দরদ প্রকাশ করেন নি। তাঁর লেখায় বরং এই গর্ব্বের আভাস পাই যে কোন কোন জমি হতে আদিমনিবাসীদের উন্মূলন করে নাকি দেশকে সুগম সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

আলোচ্য বইখানিতে হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্বগুলি প্রতিফলিত হয়েছে অনুপম ভাষার স্বচ্ছ পটে। ভাষার ঐকান্তিক বিশিষ্টতা হচ্ছে শব্দের অনপচয়তা। আজ সাহিত্য-জগৎ যেন অত্যধিক মনোবিকলনের আতিশয্যে অসুস্থ—আকাশ বাতাস যেন অকারণ নৈরাশ্যময় অবসাদে আচ্ছন্ন, যৌনচর্চ্চার উগ্রতায় অতিষ্ঠ। আলোচ্য আত্মকাহিনীটি এহেন সময় প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত স্মিত, স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে প্রবেশ করেছে। পেন-স্মিথের সাফল্য দেখে আশা হয় অচিরে 'আনন্দ' কথাশিল্পক্ষেত্রে আপন স্থান পুনরধিকার করে নেবে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)

মোপাসাঁর গল্প—অনুবাদক শ্রীননীমাধব চৌধুরী এম, এ; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম, এ; বার-এট-ল লিখিত ভূমিকা সহ। (মডার্ণ বুক এজেন্সি)।

ছিন্ন পাপড়ী—শ্রীনবগোপাল দাস, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্)।

সুরা ও শোণিত—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

মাধুকরী—পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অষ্টাদশী—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য।

আমার মত যারা দিলীপবাবুর ভক্ত তাদের কাছে এঁর প্রকাশিত যে কোন বই আশা ও আদরের বস্তু। অনামী দিলীপবাবুর কবিতার বই। ভারতীয় সঙ্গীতে দিলীপবাবুর সাধনা ও সিদ্ধি অসাধারণ তাই কাব্যের ঝঙ্কার যে তাঁর প্রাণের তন্ত্রীতে বাজার কথা এ সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি তিনি লোকোত্তর সাধনায় পণ্ডীচারি আশ্রমে

দিনযাপন করছেন। তাঁর কাব্যরচনায় এই দুই সাধনার মিলনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে বলে আমার মনে হয়।

যে কেউ অনামী পাঠ করবেন সহজেই বুঝিতে পারবেন যে আমার দ্বারা এর সমালোচনা অনভিপ্রেত ও হওয়া উচিত ছিল। তবু কয়েকটি কথা আমার বিশেষ করে বলবার আছে বলে আমি অনামীকে এখানকার সমালাচনা-পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অনামীকে সাধকের সাধনার বাণী হিসাবে না সাহিত্য হিসাবে পাঠ ও বিচার করা হবে এ সম্বন্ধে সাধারণ গ্রাহ্য মত কি সেটা আমার জিজ্ঞাস্য রইল। অনামী মোটামুটি ২ ভাগে বিভক্ত—এক, কবিতাবলী—তাতে কতক অনুবাদ আছে ও দ্বিতীয় পত্রাবলী যা দিলীপবাবুর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ও বহুতর দেশী বিদেশী মহাজন ও বন্ধুজনের আদান প্রদান হয়েছে। সাধনার সূত্র ধরে গ্রন্থকার কবিতাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন; সাহিত্যের দৃষ্টিতে আমি এ ভাগের বিশেষ সার্থকতা দেখি না। তেমনি রস-সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করতে গিয়ে আমার চোখে পড়েছে যে কবিতার রূপ ছন্দ বা কবিতা বলতে যা কিছু বোঝায় সে সম্পর্কীয় ধারণায় বা সিদ্ধিতে গ্রন্থকার বড় ঢিলে ঢালা ও অপরিণত। আমি একথা বলছি না যে তাঁর ছন্দ ও কবিতা কোথাও সুঠাম হয় নি, কিন্তু কবি সিদ্ধকাম হলে যেমন কাব্যলোকের একটা কোথাও স্থিতি লাভ হয় গ্রন্থকারের তা হয় নি। অনেকবার অনেক কবিতায় তিনি কাব্যের সেই অরূপ অবর্ণনীয় লোকে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু পরেই বা পরের কবিতাতেই তা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হয়েছেন।

"গর্জ্জিল প্রেমের সিন্ধু চূর্ণিল ধূলিকা অদ্রি ছিন্ন ভিন্ন মোহ আবরণ" (গ্রন্থি)

বা "যে-প্রেম নির্ভরে ফুটে আপনার বেগে ছুটে উদ্বেলিত নির্ঝরিণী সম" (অহৈতুকী) কার না কাণে ঝঙ্কার তুলবে? এ দুটি আমি নিতান্ত হাতের কাছে পাওয়া স্থান থেকে তুলে দিলাম, নিশ্চয়ই আরও উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু যথা তথা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয় এমন কাব্যনাশের ও ছন্দনাশের গহ্বরে,—যেমন

কোথা যেন কাড়াকাড়ির—
তরে হৃদির
তলে চুপে ছদ্মরূপে
জাগ্‌ত না পিপাসা, (জাতিস্মর)

যে সেখান থেকে অক্ষত হয়ে ফেরা অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ে।

আর একটা মুস্কিল হয়েছে এই যে ছন্দ সম্বন্ধে দিলীপবাবুর কতকগুলি মত তাঁর কবিতায় মূর্ত্তিত হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নানা পত্রিকা মারফৎ দিলীপবাবুর এই সব মত প্রবোধচন্দ্রের সপক্ষে ও অমূল্যধনের বিপক্ষে তীব্রভাষায় বর্ষিত হয়েছিল। হয়ত প্রবোধ বাবুর মতই ঠিক অথবা হয়ত অমূল্য বাবুরই ঠিক, হয়ত বা দিলীপবাবু-বর্ণিত স্বর-মাত্রিক গতিই বাংলা ছন্দের প্রাণ কিন্তু এই সব তর্কের দোসর হয়ে কবিতা যদি কোমর বেঁধে অগ্রসর হয় তবে রসিকজনে তাকে বরণ করবে না। দিলীপবাবু "লঘু গুরু" ছন্দ নামে ছন্দ রচনা করেছেন, কিন্তু কে পড়তে পারবে ঠিক মত—

"কত প্রয়াস বিফলে উদ্যমরোলে
মঙ্গল ডঙ্কে—নিন্দা বোলে,

হিংসা বোলে শান্তি নিচোলে
মত্ত মদির জয়গানে—" (বহুরূপী)

"হু হুচ্ছাসে ডমরুস্বননে
বজ্র ডঙ্কে সমুদ্রি"— (তারা)

যদি এ সব ছন্দ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হয় আপন মতের সমর্থন করা বা প্রচার করা তবে দিলীপবাবুকে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হবে।

ছন্দসম্বন্ধে দিলীপবাবু যে রকম autocrat বাক্য সম্বন্ধেও সে রকম, কাল বা জনমতের সায় পাবে কিনা তা তিনি ভেবে দেখেন না। বলতে পারি দিলিপবাবুর অনেকগুলি কবিতায় মানকুমারী, সত্যেন দত্ত, করুণানিধান, কাজী নজরুল বা রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হবে কিন্তু এ কথা বলায় তাঁর স্বকীয় কাব্য-প্রতিভার গৌরব প্রতিষ্ঠা হবে না। সব জড়িয়ে আমার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি কবিতাগুলি প্রকাশ না করে আর কিছু পরিণত রচনার জন্য অপেক্ষা করলে ভাল হত। অন্ততঃ কবিতাগুলি বাছাই করলেও বইটি সার্থকতর হত।

"—পাইনি তোমারে বলে তিতি সদা আঁখি জলে
সেই মোর ভালো
তোমা ছাড়া প্রাণ মম হোক্ মরুভূমি সম
নিভে যাক আলো।
প্রতি রক্তবিন্দু মোর তবে প্রেমে হোক ভোর
আপনা বিস্মৃত—
জানি প্রভাতিবে নিশা তুমিই মিলাবে দিশা
মরণে অমৃত।"

(অভিমান ?)

এটি অনিলবরণের রচনা, কিন্তু এই হোল দিলীপবাবুরও সাধণবাণীর রূপ। প্রকৃত সাধক বিনা এ শ্রেণীর কবিতার সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব নয়, আমি তাই এ বিষয়ে বিরত হলাম।

অনামী সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ এর পত্রাবলীকে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায়। আমি এ বিষয়ে দুর্নিবার আপত্তি জানাচ্ছি। এ সব পত্রগুলি দিলীপবাবুর সম্মান রক্ষা করে ও তাঁর প্রীতি কামনা করে নিতান্ত তাঁরই হৃদয়-মন-গোচরের জন্য লেখা। অনেক স্থলে পত্রগুলি দিলীপবাবুর ও তাঁর দুর্ব্বল, বিকল কাব্য ও ছন্দের প্রশংসায় মুখর, এমন কি ভারাক্রান্ত; এ সব পত্র কত গোপনীয়, কত অসতর্কতাপূর্ণ! এগুলিকে দিলীপবাবুর পক্ষে ব্যক্ত করা যেমন অন্যায় তেমনি এগুলির অন্তর্নিহিত প্রশংসা পাঠকের পক্ষে তাঁর কাব্যাস্বাদনের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। কাব্যসরস্বতীর মন্দিরে পূজারীর নীরব আরাধনার সন্নিকটে এরকম প্রশংসার ঢক্কানিনাদের আবরণ সৃষ্টি যে কতদূর অমার্জ্জনীয় তা বলা যায় না। নতুবা পত্রগুলি আপন আপন সম্পদে গরীয়ান্; দেশ বিদেশের চিত্তলোকের নানা সমুদ্র নানা খনি থেকে সংগৃহীত মণি মুক্তা খচিত পত্রাবলী। শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; অপরগুলির মধ্যে মিঃ সাহেদ স্বরহ্বর্দ্দির পত্র তার মাধুর্য্যমণ্ডিত আন্তরিকতার জন্য যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করবে। কিন্তু এই পত্রই যে প্রকাশের নীরব প্রতিবাদে ঝঙ্কৃত।

এমন আরও কত পত্র আছে। অনামীর মধ্যে এই সব পত্র সংগ্রহ একেবারে অশোভন অসঙ্গত। এ কথা দিলীপবাবু কেন হৃদয়ঙ্গম করলেন না ?

যে ভাষাতেই মোপাসাঁর গল্প অনূদিত হয়েছে সে ভাষাই অসামান্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। আশা করি বাংলায় মোপাসাঁর অনুবাদের জবাবদিহি নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম বাংলায় মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন, সে বহু দিনের কথা। সম্প্রতিও মাসিক পত্রিকার কোন কোন সংখ্যায় আধুনিক লেখকদের অনূদিত মোপাসাঁর গল্প মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোন অনুবাদই বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত অধিকার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

আলোচ্য গ্রন্থে আটটি গল্প অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম গল্পটি—বুলস্ত সুইফ মোপাসাঁর অতি প্রসিদ্ধ গল্প ও তাঁর প্রথম গল্প রচনা, যা লিখে তিনি এক দিনেই দেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েন। এ গল্পটি ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়কার মনোভাব চিত্রণে অদ্বিতীয়। এ শ্রেণীর গল্প রচনায় মোপাসাঁর হাত অত্যন্ত পাকা ছিল। প্রুশিয়ান সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত শহর বা প্রদেশের যে কোন অধিবাসীর ঘৃণা ও প্রতিশোধ-পরায়ণ মনোভাব ও বিজয়ী সৈনদলের বিকৃত মনুষ্যত্ব মোপাসাঁ গল্পে গুটিকতক ইঙ্গিতে যেন তুলির দু' একটি মাত্র আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতেন। আলোচ্য বইটির প্রায় সব কয়টি গল্পই এ শ্রেণীর গল্প থেকে বাছাই করা।

মোপাসাঁর গল্পের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা অল্প কথায় অসম্ভব কিন্তু সামান্য ভাবে এটুকু বলা যেতে পারে যে যে সব মনোভাব ও মনুষ্য-চরিত্র তাঁর গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা প্রকৃতই বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ; ভাষা লঘু, নিশানা অব্যর্থসন্ধানী। এ দুটি বিষয়ে আলোচ্য গল্পটির ত্রুটি রয়েছে, অনুবাদক এক শ্রেণীর গল্পই অনুবাদ না করে কিছু বৈচিত্র্য আনলেই ভাল করতেন। নতুবা তাঁর উচিত ছিল আর কিছু বেশী গল্প অনুবাদ করা। বাংলার মোপাসাঁর রস পেতে গেলেও এই কয়টি গল্পে পরিতৃপ্তি হবার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় ত্রুটি ভাষায়,—ভাষা সজীব হয়নি। গ্রন্থটির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন "কোন গল্পের মোটামুটি রূপ রক্ষা করিতে পারলেই তার অনুবাদ পাঠক সমাজকে আনন্দ দান করতে সক্ষম হয়।" এ কথা ঠিক হলেও মোপাসাঁর গল্প অনুবাদে ভাষার নির্জ্জীবতা ত্রুটি বলেই গণ্য হবে। অনুবাদগুলি বহু দিন পূর্ব্বে সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, ননী মাধব চৌধুরী মহাশয় তখন সবে কলম ধরতে শিখেছেন। এখন তাঁর লেখা ঢের পরিণতি লাভ করেছে, তাঁর আজকালকার লেখা গল্প আমার মত অনেক পাঠক অতি সমাদরে ও আগ্রহে পাঠ করে থাকেন। অনুবাদক বাঙ্গালী পাঠককে যা দিয়েছেন তার জন্য পাঠক শ্রেণী তাঁর কাছে ঋণী থাকবে কিন্তু তিনি যদি তাঁর সুপরিণত হাতে নূতন করে আরও কিছু মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন তবেই তাঁর অনুবাদ ধন্য হবে, নতুবা তাঁর এই অল্পোত্তম অপূর্ণতা ও শৈথিল্য বিজ্ঞাপিত করবে।

আর যে-কখানি বয়ের নাম উপরে করা হয়েছে, তার মধ্যে "ছিন্ন পাপড়ী" গল্প-সংগ্রহ, অন্যগুলি কবিতা-পুস্তক। এই গ্রন্থগুলির রচয়িতারা সকলেই নূতন লেখক এবং নূতন লেখক হিসেবে পাঠ্য ও উল্লেখযোগ্য। তবে বই কয়টির এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা চলতে পারে। তাহলেও "অষ্টাদশী"র ছন্দ-দক্ষতা ও কাব্যগুঞ্জন আমায় মুগ্ধ করেছে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

ওপারের ঢেউ—শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

বইখানি হাতে পড়তে ভেবেছিলুম ওর মধ্যে পারলৌকিক রহস্যের সন্ধান মিলবে; কিন্তু পাতা উল্টোতেই বোঝা গেলো সে-আশাও কুহকিনী। পুস্তকের নামকরণে গ্রন্থকার কোনো রূপকের প্রশ্রয় দেননি, ওপার-শব্দকে তার মূলার্থেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এটি একটি অনুবাদ-চয়নিকা, এবং অনূদিত কবিতাগুচ্ছের প্রত্যেকটিই সাগরপারের ইংরেজিভাষী দেশগুলি থেকে আহৃত। কমলকৃষ্ণ ইস্‌লামিয়া কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক; সুতরাং ভাষা-ব্যবহারে এই রকম অর্থশুদ্ধি তাঁর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিশুকাল থেকে "কাব্যভারতীর কিঞ্চিৎ কৃপা পাওয়ায় যৌবনের স্পর্শমণির স্পর্শে তাঁর কাব্যপ্রতিভা" ফুটে উঠেছে। তাই আসল দরকারের সময়ে এই প্রশংসনীয় মূলানুরক্তি তাঁকে ছেড়ে যায়, এবং তাঁর অনুবাদ যাতে শুধু "ভাষানুবাদ" না-হয়ে "রসানুবাদ" হয়, তারি চেষ্টায় গ্রন্থকার প্রাণপাত করেন। এই রসায়নের ফল কি দাঁড়ায় তার একটা উদাহরণ দিই। এরিএল্‌এর শেষ গানটি—

Where the bee sucks there suck I,
In a cowslip's bell I lie,
There I couch when owls do cry,
On the bat's back I do fly
After summer merrily:
Merrily, merrily, shall I live now
Under the blossom that hangs on the bough.

আলোচ্য পুস্তকে এই আকার ধরেছে—

যেথা মধু পান করে মৌমাছিরা,
আমি মধু পান করি সেই ফুলে ফুলে!
বিছাই আমার শয্যা পরম আনন্দে
পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল-কোলে!
কোকিলের পিঠে চড়ি আমি ছুটে যাই
বসন্তের পিছু, তারে পাছে রে হারাই।
হর্ষভরে, হর্ষভরে থাকিব আমি রে
আজি হতে কুসুমিত তরুতলে ওরে।

এমন মনে করলে ভুল হবে যে প্রদত্ত দৃষ্টান্তই কমলবাবুর অনুবাদপদ্ধতির অনন্য প্রকার। যেখানে মূল কবিতাকে অপরিবর্ত্তিত রেখেও, অনুবাদ "প্রাঞ্জল, সাবলীল ও মূলের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হয়", এবং ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে মূলের রসাস্বাদনে সমর্থ হন, সেখানে ঘোষ মহাশয় অকবিদের কষ্টকল্পনাকে মার্জ্জনা করতে প্রস্তুত। তাই Legende of Goode Women এর এই স্তবকটি—

Hyde, Absalon, thy gilte tresses clere;
Ester, ley thou thy mekenesse al adown;
Hyde, Jonathas, al thy frendly menere;
Penelopee, and Marcia Catoun,
Make of your wifhode no comparysoun;
Hyde ye your beautes, Ysoude and Eleyne,
My lady comith, that al this may disteyne.

অধ্যাপক মহাশয়ের কবিপ্রতিভার সংস্পর্শে এই রূপ পরিগ্রহণ করে—

সুবর্ণ কুন্তল তব লুকাও, লুকাও,
সুবর্ণকুন্তলশীর্ষ "এ্যাবসোলন্" গো;
ত্যজ হে নম্রতা তব "এস্থার" সুন্দরী;
"জোনাথাস্" ত্যজ হে মিতালি গরব;
"পেনেলোপি" আর তুমি কেটোর নন্দিনী
"মার্সিয়া" ক'রো না গর্ব্ব পাতিব্রত্য লয়ে;
"ইসোল্ট", "হেলেন্" দোঁহে নিজ নিজ রূপ
ঢাকো, ঢাকো ত্বরা ক'রে; ওই আসে ওই—
আমার রাণী যে আসে পরাজিতে সবে।

চসার ইংরেজ হলেও, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক, তাই তাঁর ভাষা, বিশেষ ক'রে বানানের গুণে, আমার মতো অশিক্ষিত লোকের কাছে অপরিচিত লাগতে পারে। সেইজন্যে কমলবাবুর মূলানুগত অনুবাদের নমুনা হিসেবে একটি আধুনিক কবিতার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ল্যাণ্ডর-প্রণীত রোজ্ এল্‌মার কবিতাটি—

Ah, what avails the sceptred race!
Ah, what the form divine!
What every virtue, every grace!
Rose Aylmer, all were thine.

Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weep, but never see,
A night of memories and sighs
I consecrate to thee.

বাংলায় "নিশ্চিত মরণ" নাম নিয়ে তার নির্ব্বিকার সত্তা প্রকাশ করেছে এই রকমে—

হা হা, রাজদণ্ডে কিবা আসে যায়,
হা হা, ত্রিদিবের রূপে কিবা আসে,
রূপগুণ সব মিলে কিবা আসে যায়,
তোমার তো সবি ছিল, সবি গেল ভেসে।

চিরজাগরিত এই আঁখি দুটি ঝরে
অশ্বরে তোমার তরে, কিন্তু কোথা তুমি?
স্মৃতির বৃশ্চিক আর দীর্ঘশ্বাসভরা
প্রতিনিশি তোমারে গো সমর্পিনু আমি।

কমলকৃষ্ণের কাব্যানুভূতির যে নিদর্শন উপরে দিয়েছি, তার সম্বন্ধে টীকাটিপ্পনী একান্ত অনাবশ্যক; এমন-কি এ-বইয়ের সমালোচনাও বোধহয় পণ্ডশ্রম। তবু এই অপ্রিয়কর কার্য্যে কালক্ষেপ করতে হলো শুধু এই জন্যে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শিরোমণি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রুগ্নদেহে যে ভূমিকা বা ধন্যবাদপত্র লিখে কমলকৃষ্ণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন—"বর্ত্তমান কালের অনেক কবিই শুধু 'দখিণা হাওয়া,' 'পাপিয়ার ডাক,' 'দাহুরীর বোল' ও 'সাঁঝের তারা'

লইয়া অতি সুলভ মূল্যের পদ রচনা করেন; এক মুহূর্ত্তকাল জানেলা হইতে নীল আকাশের পানে তাকাইয়াই তাঁহারা কবি হইয়া বসেন।......কিন্তু ভারতীর কৃপা লাভ কি এত সহজ?......কমলবাবুর কবিতা বহু পরিশ্রমের ফল। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের আদ্যন্ত ঘাঁটিয়া ভারতীয় অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন।......এই উপকরণগুলি ছাড়া বর্ত্তমান কালের গীতি-কবিতায় শব্দ ও ছন্দচাতুর্য্য প্রভৃতি বিচিত্র কাব্যকথা লইয়া অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু সেই শ্রমজনিত এক বিন্দু ঘর্ম্মও তাঁহার লেখায় আমরা দেখিতে পাই না। ১৬ বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে নিবিড়ভাবে তিনি এই বিচিত্র উপকরণ আত্মসাৎ করিয়াছেন।......কমলবাবু সুলভ মূল্যে তাঁহার দুর্ল্লভ পাণ্ডিত্য ও স্বভাবজ কাব্যশক্তির মহাদান আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন।"

এই মন্তব্যের মধ্যে শুধু যদি দীনেশবাবুর ইংরেজী সাহিত্য-সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই প্রকাশ পেতো, তিনি যদি কলেরিজ (?), বাইরন্, শেলি, স্কট্ ও ওয়ার্ড্সোয়ার্থ্ প্রভৃতির অভ্যুদয়ের জন্যে এসিয়ার অধ্যাত্ম-সম্পদে সমৃদ্ধ হ্রদ-কবিদের দায়ী ক'রেই ক্ষান্ত হতেন, তবে হয়তো আমাদের আপত্তি করার কিছু থাকতো না; কারণ দীনেশচন্দ্র বাংলারই অধ্যাপক ছিলেন; সুতরাং তাঁর কাছ থেকে ইংরেজি সাহিত্যপ্রসঙ্গে নির্ভুল কথা শুনতে চাওয়া অন্যায়। কিন্তু ভূমিকাটির প্রতি ছত্রে তিনি বংলা সাহিত্যের সঙ্গে যে অপরিচয়ের আভাস দিয়েছেন, তা বস্তুতই শোচনীয়। বাংলায় কাকে ছন্দ বলা হয়, অধ্যাপক মহাশয় কি তাও এখনো শেখেন নি? পরিশ্রমের অর্থ, তাও কি দীনেশচন্দ্রের অবিদিত? পাণ্ডিত্য, কাব্যশক্তি, মহাদান ইত্যাদি শব্দগুলোর শুদ্ধ ব্যবহারেও কি তিনি অপারগ? না, তা সত্য নয়। কিন্তু যেটা নিঃসংশয় ভাবে সত্য, সে হচ্ছে এই যে দায়িত্ব-কথার মানে তিনি আজ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেননি।

কি উপায়ে কবি হওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে অধিকাংশ আধুনিক বাঙালীই হয়তো অনভিজ্ঞ, কিন্তু বিবেককে দাবিয়ে রেখে কি ক'রে উচ্ছ্বসিত অভিজ্ঞানপত্র লিখতে হয়, সে বিদ্যায় আমরা সকলেই পারদর্শী। এই অবিমৃষ্যকারিতা, কর্ত্তব্যজ্ঞানের এই ভয়াবহ অভাব আমাদের জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত লক্ষণ কিনা, জানি না, তবে এটা নিশ্চয় যে এরি দৃষ্টিতে বাংলার জন্মপঙ্গু সমালোচনা-সাহিত্য সর্ব্বদেশের উপহাস্য হয়ে আছে। কমলবাবুর মতো আত্মশ্লাঘী ব্যক্তি সর্ব্বত্রই সুলভ, এবং আপনার দৌর্ব্বল্য-সম্পর্কে অন্ধতা আপামর সাধারণের মজ্জাগত। অতএব আলোচ্য পুস্তকের রচনা তো সহজ-বোধ্য বটেই, এমন-কি এর প্রকাশ ও প্রচারেও বোধহয় আপত্তি করা অন্যায়। বিদেশীদের মধ্যেও কাব্যলক্ষ্মীর অহংসর্ব্বস্ব প্রিয়পাত্রদের সংখ্যা অল্প নয়, এবং তাঁরাও স্বরচিত প্রহসনকে ট্র্যাজেডির পরাকাষ্ঠা বলে ভেবে থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভারতের বাইরে মুদ্রাকার্য্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য হওয়ায় তাঁদের প্রচেষ্টা সচরাচর অসূর্য্যম্পশ্যাই থেকে যায়। কাজেই "ওপারের ঢেউ"-এর মতো অপাঠ্য পুস্তকের বহুলতা আমাদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নয়, বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই ধরণের বইয়ের মুখবন্ধে দীনেশচন্দ্রের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীও সত্যভাষণের প্রবর্ত্তনা অনুভব করেন না। অবশ্য অপ্রিয় সত্য বলার অধিকার মানুষের আছে কিনা তা তর্কাধীন। কিন্তু তাই বলে অপলাপ মার্জ্জনীয় হতে পারে না। যদি সত্যের খাতিরে অন্যকে আঘাত করা আমাদের তথাকথিত সহৃদয়তায় বাধে, তবে

একেবারে চুপ থাকতে ক্ষতি কি? আমি জানি যে ইংরেজরাই মৌনিতাকে হিরণ্ময় ব'লে বর্ণনা করেছে, কিন্তু শতং বদ, মা লিখ, এই প্রবচনটার জন্ম অন্ততপক্ষে আমাদেরি দয়াশীল দেশে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বন্ধুর স্মৃতি—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ—প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী।
নারীর পূজা—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরিশ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ব্যোমকেশের ডায়ারি—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (পি, সি, সরকার)

বাংলা দেশের যৌথ পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাতদের কতক নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে এবং কতক তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীদের প্ররোচনায়, শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের প্রতি নির্ম্মম আচরণের চিত্র বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়। চরণদার মতন বিশ্বাসী ভৃত্যের চিত্রও অনেক জায়গায় দেখা গিয়াছে। নূতন নয় বটে কিন্তু তাহাদের চিত্রাঙ্কন যে এ পুস্তকে সম্পূর্ণ উপভোগ্য হইয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। দেশের কল্যাণ-কামনায় দেশবাসীর চেষ্টা ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এবং স্বদেশী-আন্দোলনের নেতাদিগের কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ে যে অভিমত লেখক প্রথম বিশুর পিতার উক্তিতে, দ্বিতীয় অনন্ত বাবুর মারফৎ এবং তৃতীয় স্বয়ং বিশুর মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরই গাত্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি এ বিষয়ে ভোট লওয়া যায় তাহা হইলে গ্রন্থকারই বেশী ভোট পাইবেন। বিশু ও সাধু দুই বন্ধুর চিত্রও অতি মনোরম ও স্বাভাবিক, কমলার জন্য চক্ষুতে জল আসে। ভিন্ন মতাবলম্বী পল্লীগ্রামের বালক সাধু সহর হইতে কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়া যখন পূর্ব্বমত বদল করিয়া বিশুর মতে মত দিল, সেই সময়ে গ্রামের সমিতির সভ্যদিগের সহিত তাহার যে সব কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক হইয়াছিল তাহার মধ্যে ভাবুকের খোরাক বহুল পরিমাণে আছে। পুস্তকখানির নাম "বন্ধুর স্মৃতি" কেন হইল তাহা পুস্তকখানির দুই স্থান হইতে বোঝা যায়। ১৫৭ পৃষ্ঠায়, কমলা (হারাণীর সহিত গ্রাম ত্যাগের সময়) তাহার আঁচলের শেষ প্রান্ত দিয়া তাহা (বিশুপ্রদত্ত "চয়নিকা") মুছিয়া লইয়া বলিল "বন্ধুর শেষস্মৃতিটুকু নিয়ে যাই দিদি"। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রচ্ছদ-পটের ছবিখানিও সুচিত্রিত হইয়াছে। আর এক জায়গা ১৬৫ পৃষ্ঠায় "মৃত্যুশয্যায় বিশু গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সাধু, সাধু বন্ধু আমার—আমার শেষ স্মৃতিটি রেখ"। কিন্তু কি সম্পর্কে বিশু এ কথা বলিল তাহা বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। যাহা হউক গ্রন্থকারের রচনার ভঙ্গী সুন্দর, ভাষাও উত্তম, ছাপা সুন্দর ও নির্ভুল এবং বাঁধাই সুদৃশ্য। মোটের উপর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সময়ের অপব্যবহার করা হইয়াছে মনে হয় না।

নারীর পূজা—এই ক্ষুদ্র নাটিকার ভাষা সুন্দর, প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাও হৃদয়গ্রাহী। আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পুরুষের কোন চরিত্রই নাই। রাজপুতানীর "নারীর পূজার" নৈবেদ্য মোটের উপরে বেশ সুখপাঠ্য।

ব্যোমকেশের ডায়েরী—চারিটি ডিটেক্টিভ গল্প। এগুলি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা একথা গ্রন্থকার ভূমিকাতে না বলিয়া দিলে স্বাভাবিকই মনে হইত যে

Conan Doyleএর গল্পের অনুবাদ পড়িতেছি। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন "ডিটেক্‌টিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে—যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য।" সচরাচর যে সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস (বাংলা ভাষায়) বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পাঠ করিয়া ঐরূপ ধারণা করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যেখানে এত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে গল্পগুলি পরিকল্পিত ও লিখিত হয় সেখানে এ কথা বলা চলে না। "সত্যান্বেষী" সত্য সত্যই ডিটেক্‌টিব গল্পের উপর আমাদের শ্রদ্ধা আনিয়া দিয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

পাঠক-গোষ্ঠী

শিরণী ও পাবনা জেলার গ্রাম্য ভাষা

পরিচয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার পত্রিকায় মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের 'শিরণী' নামক পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করেছিলাম। সেই সমালোচনায় আমি যে সব কথা বলেছিলাম মনসুর উদ্দীন সাহব তা'র একটি প্রতিবাদ আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতিবাদ ও সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পাঠাচ্ছি, আপনার পত্রিকার পাঠকগোষ্ঠীতে সেগুলির স্থান হ'লে বাধিত হ'ব।

মনসুরউদ্দীন সাহেবের বক্তব্য

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আমার "শিরণীর" সমালোচনা সময়ে কতগুলি কথা বলেছেন যা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমার উক্তি থেকে তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছে যে আমি গল্পটি যে রকম শুনেছি সেইরূপেই লিপিবদ্ধ করি নি। এবং এই সন্দেহের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা যথাযথ হয় নি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল আমি নিজে ভাষাতত্ত্ববিদ বা নৃতত্ত্ববিদ নই। এবং এই কাজে আমার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাও নেই।

'লেখা গেল' এই শব্দ দু'টির অর্থ করেছেন তিনি রচিত হ'ল। কিন্তু এসম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে আমি গল্পটি যেমনি শুনেছি তেমনি record করেছি, নিজে কিছু রচনা করে—কী ভাষা কী ভাব, কী গল্প-বস্তু—এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিই নি। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ তিনি পাঠকের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন তা আমার উক্তি দ্বারা নিরসন হ'লেই আমি সুখী হ'ব।

আমার 'নাম করণের' লেখাটি আমার নিজের নয়। ওটা "বঙ্গবাণী" সম্পাদকের। তিনি "বঙ্গবাণীতে" প্রকাশের জন্য আমার নোটটি সংক্ষিপ্ত করে ঐভাবে লিখে নিয়েছিলেন। আমি যখন গ্রন্থ প্রকাশ করি তখন ওটা পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন অনুভব করিনি, কেননা ওতেই কাজ চলবে, আমার ধারণা ছিল। আমি যা লিখেছিলুম তা এখানে পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে তুলে দিচ্ছি। [এবং এই লেখাটি ও বঙ্গবাণী সম্পাদকের নোটটি আমার কাছে এখনও আছে।]

"এই পল্লী-গল্পটি পাবনা জিলার পোঃ খলিলপুর গ্রাম মুরারীপুর-নিবাসী মুহম্মদ আমির উদ্দীন সরদার সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে। নানাবিধ পারিবারিক অশান্তি ও সাংসারিক কর্ম্ম আধিক্যের মধ্যেও তিনি যে এই সুদীর্ঘ গল্প বলিবার জন্য অবসর করিয়া লইয়াছিলেন এবং কোন প্রকার বিরক্ত না হইয়া বরং সানন্দ চিত্তে বলিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা ও অনুসন্ধান (research) করিতে হইলে এই সুন্দর মৌখিক্ গ্রাম্য গল্প অতীব প্রয়োজনীয়। এবং ওই মূল্য ব্যতিরেকেও রস-পিপাসুগণ ইহাতে অমৃতসম অনুপম গ্রাম্য মধুর সন্ধান পাইবেন, ইহাতে তিলমাত্র ভেজাল নাই ; ইহা অনাঘ্রাত ও অনাস্বাদিত।

ছোটবেলায় রাতে মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া এই সমস্ত গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। তখন যেমন ইহা আমাকে অনাবিল আনন্দদান করিত এখনও সেই রকম—এক কথায় আমি যখন ইহা শুনি তখন "My heart leaps with joy."

সুতরাং অন্য প্রদেশের (?—কলিকাতা 'প্রদেশ' ? না রাজশাহী 'প্রদেশ' ? যেখানে আমি উচ্চ শিক্ষা পেয়েছি।)' ভাষার আওতায় উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার ফলে সেই অঞ্চলের ভাষার ছাপ পড়ার বাধ্যতা হ'তে দূরে রইলুম। ডক্টর বাগচি আমাদের অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা না জেনেও [জানা কি একেবারেই অসম্ভব ? কোন উপায়ই ছিল না ? এ সম্বন্ধে Sir George Griersonএ বোধ হয় কিছু উপকরণ পাওয়া যেত—জেলার নানা অঞ্চলের ভাষা প্রায়ই এক ধরণের, তবে স্থান-ভেদে কিছু কিছু অদল-বদল হয়।] আমাদের অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে তিনি অযৌক্তিক মত প্রকাশ করেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বল্ছিলেন ডক্টর বাগচী তাঁকে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন "শিরণীর" মধ্যে নাকি যশোহর জেলার ভাষার ঢঙ পাওয়া যায়।

এই সম্পর্কে আর একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। গ্রাম্য গানের এবং গল্পের ভাষা গ্রাম্য-প্রচলিত কথ্যভাষা হ'তে পৃথক, কেবল ভাষার গ্রামার এবং ফনেটীক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লোক সঙ্গীতগুলি, হারামণির গানগুলি এবং "ময়মনসিংহ গীতিকা" প্রভৃতির গানগুলি দেখলেই বোঝা যাবে। [Sir George Griersonএর Linguistic Survey of Indiaতেও কিছু কিছু নিদর্শনী আছে।]

এই "শিরণীর" গল্প অংশে যে অপ্রয়োজনীয় আরবী ও ফার্সী শব্দসমূহ পাওয়া যাবে তার জন্য আমাকে দায়ী করা চলে না, কেননা গল্প রচয়িতা আমি নই। এই গল্পের ভূমিকা আমি লিখেছি এবং তাতে উক্ত ধরণের শব্দসংখ্যা বিরল। আর যদি প্রচুর পরিমাণে [অপ্রয়োজনীয় রূপে নয়] আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করা যায়, তবে তা কি বাংলা-সাহিত্যের সৌকর্য্যের হানি করবে ? ইংরাজী, ফরাসী শব্দের [যা 'পরিচয়ে' অপর্য্যাপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়] দ্বারা কি বাংলা-সাহিত্যের সৌকর্য্য সাধিত হ'চ্ছে ? বাংলা-সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহারে সাহিত্যের সৌকর্য্য সাধিত হ'বে কিনা তৎসম্বন্ধে আমার আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। এই উপলক্ষ্যে ডক্টর বাগচীকে Dictionary of Mussalman Bengali Words by the Revd William Goldsack [Christian Literature and Tract Society, 41, Lower Circular Road, Calcutta, Re. 1-8-0] পড়তে অনুরোধ করি। কেননা তা হ'লে তিনি বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আরবী ফার্সী তুর্কী শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হ'তে পারবেন। তিনি আরবী ফার্সী শব্দের "আমদানী" [এই ফার্সী শব্দটার ব্যবহারের মাধ্য যে ঠাট্টা রয়েছে তা প্রয়োগ করা বাগচী

মহাশয়ের মত পণ্ডিতের পক্ষে অশোভন হ'য়েছে এবং এ থেকে আমার মনে হয় তাঁর অসহিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যভাব খুব উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।] দেখে বেজার হ'য়েছেন।

আমার শিরণী পেছন দিক থেকে আরম্ভ করার জন্য শিরণীর ।৶০ পৃষ্ঠা দেখ্তে অনুরোধ করি ["তিনিই (অবনীন্দ্রনাথ) এই গ্রন্থ দক্ষিণ দিক হইতে ছাপিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছেন পৃঃ ।৶০]। আর দক্ষিণ দিক হ'তেই যদি ছাপা যায় তবে সেটা কি এতো দোষাবহ ? রবীন্দ্রনাথকে আমি এ বই দিয়েছি। তিনি এতে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা।

আমার বক্তব্য

মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর প্রতিবাদটি আমার নিকট পাঠিয়ে আমাকে যে তাঁর প্রতিবাদের জবাব দেবার অবকাশ দিয়েছেন সে জন্য আমি তাঁর নিকট বাধিত। আমার জবাব আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই দেব, কারণ মনসুরউদ্দীন সাহেব 'শিরণী' উপহার দিয়ে বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, অনর্থক বাদপ্রতিবাদে সে উপহারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'বে বই বাড়বে না। এ ভয় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর প্রতিবাদের জবাব দিতে বসেছি কেননা তিনিই তা' চেয়েছেন।

(১) মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর পুস্তকের নাম-করণে বলেছেন—"ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রার্থিত সুবিধার জন্য খাঁটি-প্রাদেশিক ভাষায় এ উপকথাটি লেখা গেল"। তাঁর এই উক্তি থেকে আমি মনে করেছিলাম যে তিনি গল্পটি যেমন শুনেছিলেন আনুবর্ণিক-ভাবে তা' লিপিবদ্ধ করেন নি, নিজের প্রাদেশিক ভাষায় পুনরায় তা'র রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিবাদ থেকে এখন বুঝলাম যে সে সন্দেহের কোন কারণ নেই—তিনি গল্পটি যেমনি শুনেছেন "তেমনি record" করেছেন। অর্থাৎ তাঁর উক্তির "লেখা গেল" কথাটি "লিপিবদ্ধ করা গেল" অর্থে গ্রহণ করতে হ'বে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে ওরূপ 'ভাসাভাসা' উক্তি তাঁর নিজের নয়, সেটা হচ্ছে "বঙ্গবাণী" সম্পাদকের। একথা শুনে বাঙ্গালী পাঠক নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হবেন, কারণ এ সব সংগ্রহ আনুবর্ণিকরূপে লিপিবদ্ধ না হ'লে ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট তার মূল্য অনেক কমে যায়। তবে একথা আমি এখনো বলতে বাধ্য যে মনসুরউদ্দীন সাহেবের লিপিবদ্ধ করবার পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি রয়েছে—আর সে সব ত্রুটি ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে মারাত্মক। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে কাজে লাগবে মনে করে তিনি এ গল্প প্রকাশ করেছেন—অথচ শব্দের উচ্চারণ সঠিক লিপিবদ্ধ করবার জন্য তিনি কোন উপায় অবলম্বন করেন নি—তাই তাঁর প্রকাশিত গল্প থেকে 'বল্লাম', 'পারেন', 'জানিনা', 'রাগারাগি', 'জিলাপি', 'একটা', 'বাঁচাও', 'স্বীকার', 'আপনার', 'আ'সো' প্রভৃতি শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ আমরা সহজে ধরতে পারি না। মনসুরউদ্দীন সাহেব নিশ্চয়ই বলবেন না যে, এ শব্দগুলির উচ্চারণে কোন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য নেই। পাবনার গ্রাম্যভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও এ কথা আমি নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে সে ভাষায় "প্যারিনা" কথা চলে না, সে ভাষার বাক্যরচনায় 'তাহ'লি' ও 'তা' নলি' এক অর্থে

ব্যবহৃত হয় না ("যদি তুমি তিন মাসে ফিরিয়া আস্প্যার পারো তা'নলি খোদাতালা আপনার একটী সন্তান দিবে"), এবং "কি জানি ভাই আমি জানি না", "আমরা তা পারবো না", "বাবা তোমাদের বাড়ী কোথায়" প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ সাধারণতঃ চলে না।

(২) 'শিরণীর' গল্পে যে সব আরবী ফারসী শব্দ পাওয়া যায় তা'র জন্য আমি মনসুরউদ্দীন সাহেবকে দায়ী করেছি একথা তাঁর মনে করবার কোন কারণ নেই। আমি তাঁকে দায়ী করেছি তাঁর নিজের রচিত উৎসর্গ পত্রের ভাষার জন্য। তিনি তা' যে ভাষায় রচনা করেছেন, বাংলা-সাহিত্যে তা'র কোন স্থান নেই। "মায়ের অমৃতময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে ছুনিয়ার তামাম কচি ছেলে-মেয়ের হাতে দিলাম"—এই বাক্যে সত্যকার বাংলা শব্দের পরিবর্ত্তে 'ছুনিয়া' ও 'তামাম' কথা প্রয়োগের কোন স্বার্থকতা নেই। বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ চলা উচিত নয় এমন কথা আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু প্রয়োগ করলেই যে সব আরবী ও ফারসী শব্দ বাংলা সাহিত্যে চল্‌বে একথা আমি মানি না, কারণ লেখকের নিজের ইচ্ছামত শব্দের 'চলন' নির্দ্ধারিত হয় না।

(৩) আমার সমালোচনায় আমি বলেছিলাম যে ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির একটা বিশিষ্ট গতি আছে, মনসুরউদ্দীন সাহেব "শিরণী" পেছন দিক থেকে ছেপে সে গতির নিরর্থক অবহেলা করেছেন। এতে মনসুরউদ্দীন সাহেব মনে করেছেন যে "আমার অসহিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যভাব খুব উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে", ও আমি "বেজার হয়েছি"। তিনি এই উক্তির সমর্থনে বলেছেন যে স্বয়ং "অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ দক্ষিণ দিক হইতে ছাপিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছেন" এবং রবীন্দ্রনাথও নাকি তা'তে কোন "অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি।" ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে "ব্রাহ্মণ্যভাবের" কোন সম্বন্ধ নেই। আর বাংলা বই যে "দক্ষিণ দিক হইতে ছাপিলে" "ছাপার" সৌকর্য্য সাধিত হয় একথা আমি মানি না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

প্রকাশক—শ্রীস্থরেশ চক্রবর্ত্তী, ১৩/-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীস্থরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত